BANGLA SAHITYAR ETIHAS
AND
KABIA KABITHA

BA [Bengali]

Directorate of Distance Education
TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Smt. Chinmoyee Banerjee

(Calcutta University – Retired)

Author: Dr. Anirban Bhattacharya, Professor of Bengali, Mahadevananda Mahavidyalaya

Copyright © Reserved, 2015

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 576, Masjid Road, Jangpura, New Delhi 110 014
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই-ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বই ম্যাপিং
প্রথম একক ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – আদিযুগ ও মধ্যযুগ চর্যাপদ – আদিযুগ, অনুবাদ সাহিত্য, চৈতন্য জীবনী-সাহিত্য, পূর্ব আলোচনার সংক্ষিপ্তায়ন।	**একক – ১** **(পৃষ্ঠা ১-২৯)**
দ্বিতীয় একক – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্ব, নাটক উপন্যাস আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত-আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্য কবিতা, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি জীবনানন্দ দাশ, পূর্ব আলোচনার সংক্ষিপ্তায়ন।	**একক – ২** **(পৃষ্ঠা ৩১-১০৯)**
তৃতীয় একক – বৈষ্ণব পদাবলী (নির্বাচিত পদ) পূর্বকথা বৈষ্ণবপদাবলী (নির্বাচিত পদ), গৌরচন্দ্রিকা -(১), পূর্বরাগ - (১), ভূপালী - (২), অভিসার - (১), জয়জয়ন্তী - (২), কামোদ - (৩), মাথুর জয়জয়ন্তি - (১)	**একক – ৩** **(পৃষ্ঠা ১১১-১৩৬)**
চতুর্থ একক মেঘনাদবধ কাব্য – মাইকেল মধুসূদন দত্ত (চতুর্থ সর্গ) মাইকেল মধুসূদন দত্তের যুগ ও কবি-প্রতিভার বিকাশ, মেঘনাদবধ কাব্যের পরিকল্পনা ও কাব্য বৈশিষ্ট্য, চতুর্থ সর্গের বিষয়বস্তু (মূলের প্রায় আনুপূর্বিক গদ্যান্তর), চতুর্থ সর্গের সারাংশ।	**একক – ৪** **(পৃষ্ঠা ১৩৭-১৫২)**

সূচীপত্র

প্রথম একক ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – আদিযুগ ও মধ্যযুগ (পৃষ্ঠা ১–২৯)

- **প্রথম একক – ক চর্যাপদ – আদিযুগ**
  - চর্যাপদের পুথিঁ আবিষ্কার
  - চর্যারগীতির রচনাকাল
  - গ্রন্থনাম বিচার
  - চর্যার ভাষা
  - চর্যার সাধনতত্ত্ব
  - চর্যার কবি–পরিচয়
  - চর্যার কাব্যমূল্য
  - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

    – শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কার, কাব্যনাম ও কবি – পরিচয়

    – কাব্য গঠন শৈল
- **প্রথম একক – খ অনুবাদ সাহিত্য**
  - মালাধর বসু – শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদক

    গ্রন্থ–রচনাকাল

    কাব্য পরিচয়
  - কবি কৃত্তিবাস ওঝা – রামায়ণ অনুবাদক
  - কৃত্তিবাসের রচনায় বাঙালীয়ানা
  - কাশীরাম দাস – মহাভারতের অনুবাদক
- **প্রথম একক – গ চৈতন্য জীবনী–সাহিত্য**
  - চৈতন্যভাগবত ঃ বৃন্দাবন দাস
  - জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল
  - কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
- **পূর্ব আলোচনার সংক্ষিপ্তায়ন – প্রথম একক**

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- **অনুশীলনী**

দ্বিতীয় একক – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) (পৃষ্ঠা ৩১–১০৯)

- **দ্বিতীয় একক – ক বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্ব**
  - মিশনারী সম্প্রদায় ও বাংলা গদ্যভাষা চর্চা
  - শ্রীরামপুর মিশন
  - ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
  - উইলিয়াম কেরী
  - অপ্রধান লেখকবৃন্দ
  - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
  - অনুবাদমূলক রচনা
  - মৌলিক রচনাসমূহ
  - বেনামী বা ছদ্মনামে রচিত গ্রন্থসমূহ
  - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষার কয়েকটি নমুনা
- **দ্বিতীয় একক – খ নাটক**
  - বাংলা নাট্যসাহিত্য — ভূমিকা
  - রামনারায়ণ তর্ক রত্ন
  - নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত
    - শর্মিষ্ঠা
    - পদ্মাবতী
    - কৃষ্ণকুমারী
    - মায়াকানন
  - নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র
    - নীলদর্পণ
    - নবীনতপস্বিনী
  - নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য
- প্রথাধর্মী বা নিয়মানুগ নাটক
- কৌতুকনাট্য বা রঙ্গনাট্য
- রূপক - সাংকেতিক নাটক
- নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য

টিপ্পনী

- **দ্বিতীয় একক - গ উপন্যাস**
- **উপন্যাস সাহিত্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**
  - ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
  - ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস
  - দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস
  - বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাস
  - মিস্টিক ও রোম্যান্টিক উপন্যাস
  - ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

- **দ্বিতীয় একক - ঘ আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য**
- **মাইকেল মধুসূদন দত্ত-আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্য**
- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্য কবিতা**
  - শৈশব বা সূচনাপর্ব
  - উন্মেষ পর্ব
  - ঐশ্বর্য পর্ব
  - অন্তর্বর্তী পর্ব
  - গীতাঞ্জলি পর্ব
  - বলাকা পর্ব
  - অন্ত্যপর্ব
- **কবি কাজী নজরুল ইসলাম**
- **কবি জীবনানন্দ দাশ**

- পূর্ব আলোচনার সংক্ষিপ্তায়ন দ্বিতীয় একক
- অনুশীলনী

তৃতীয় একক – বৈষ্ণব পদাবলী (নির্বাচিত পদ) (পৃষ্ঠা ১১১–১৩৬)

টিপ্পনী

- পূর্বকথা
  - প্রাক্–চৈতন্য, চৈতন্য–সমসাময়িক ও চৈতন্য–পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের পার্থক্য
  - বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্ব
  - রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তি
  - প্রেমবৈচিত্ত্য
  - বাসকসজ্জিকা
- বৈষ্ণবপদাবলী (নির্বাচিত পদ)
- গৌরচন্দ্রিকা –(১)
- পূর্বরাগ – (১)
- ভূপালী – (২)
- অভিসার – (১)
- জয়জয়ন্তী – (২)
- কামোদ – (৩)
- মাথুর জয়জয়ন্তি – (১)
- অনুশীলনী

চতুর্থ একক মেঘনাদবধ কাব্য – মাইকেল মধুসূদন দত্ত (চতুর্থ সর্গ) (পৃষ্ঠা ১৩৭–১৫২)

- মাইকেল মধুসূদন দত্তের যুগ ও কবি–প্রতিভার বিকাশ
- মেঘনাদবধ কাব্যের পরিকল্পনা ও কাব্য বৈশিষ্ট্য

- চতুর্থ সর্গের বিষয়বস্তু (মূলের প্রায় আনুপূর্বিক গদ্যান্তর)
- চতুর্থ সর্গের সারাংশ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ভূমিকা

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দূর শিক্ষার পাঠক্রম অনুযায়ী ..... গ্রন্থটি প্রণীত হল। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে প্রতিটি এককের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলি যথাসম্ভব সাবলীল, বিষয়-অভিমুখী ও সহজবোধ্য করে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে। প্রতিটি এককের শেষে প্রদত্ত হয়েছে এককের সারাংশ। এছাড়া এককগুলির সঙ্গে সংযুক্ত রচনাধর্মী ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে যাতে শিক্ষার্থীগণ নিজেরাই আদর্শ উত্তর প্রস্তুত করতে পারেন সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠে শিক্ষার্থীগণ উপকৃত হলে অত্যন্ত প্রতি হব।গ্রন্থটি প্রণয়নের গুরু দায়িত্ব আমাকে দেওয়ার জন্য বিকাশ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড্ কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

টিপ্পনী

প্রথম একক –ক
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – আদিযুগ ও মধ্যযুগ

চর্যাপদ – আদিযুগ

নব ভারতীয় আর্যভাষা স্তরে মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষার উদ্ভব হয়। এই নব উদ্ভূত বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছিল বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধন-সঙ্গীত চর্যাপদ। চর্যাপদের নিগূঢ় তত্ত্বকথা সন্ধ্যাভাষার' প্রহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। এই তত্ত্বকথা সংবলিত চর্যাপদই হল বাংলা ভাষার আদিতম নির্দশন। সেই বিচারে বাংলা ভাষা, ভাষাতত্ত্ব এবং বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে চর্যাপদের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

টিপ্পনী

চর্যাপদের পুথিঁ আবিষ্কার ঃ-

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে চর্যাপদ বা চর্যাগীতিকার আবিষ্কার ও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির জগতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রাথমিক স্তরে পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণই প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে উৎসাহী বাঙালী পন্ডিত ও গবেষকগণ একাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। পন্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি পুরোনো পুথির খোঁজে নেপালে গিয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত কিছু পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'The Sanskrit Buddhist Literature' নামে সেইগুলি প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দু বার নেপালে গমন করেন এবং কয়েকটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ১৯০৭ সালে তৃতীয়বার নেপালে গমন করে শাস্ত্রী মহাশয় তিনখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন – পুঁথি তিনটি হল – চর্যাপদ, সরহপাদের দোহা এবং কৃষ্ণাচার্যের দোহা। এর পূর্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ডাকার্ণব' নামে একটি পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পূর্বোক্ত চারটি গ্রন্থকে প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত বলে দাবী করেছিলেন এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে চারটি পুঁথিকে একত্রিত করে 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রাকাশ করেন। এ – প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভাষাতাত্ত্বিকগণ প্রকাশিত চারটি গ্রন্থের ভাষাতত্ত্বগত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করেছেন একমাত্র চর্যাগীতিকা ব্যতীত আর কোন পুঁথির ভাষা বাংলা নয়।

চর্যার পদগুলি লিখিত হয়েছিল তালপাতায়। পুঁথিটি ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল – এর কতকগুলি পাতারও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। চর্যার মোট পদ সংখ্যা পঞ্চাশ, কিন্তু সাড়ে তিনটি পদ লুপ্ত হওয়ায় প্রাপ্ত পদের সংখ্যা সাড়ে ছেচল্লিশ। পরবর্তীকালে অবশ্য চর্যাগানের তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কৃত হওয়ায় লুপ্ত পদগুলির বিষয়বস্তু ও ব্যাখ্যা অবহিত হওয়া গিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, চর্যার তিব্বতী অনুবাদটির আবিষ্কারক ছিলেন ড়ঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী।

চর্যারগীতির রচনাকাল ঃ

চর্যাগীতির রচনাকাল সর্ম্পকে পন্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যার গানগুলি সপ্তম শতক থেকেই রচিত হতে শুরু করেছিল। রাহুল সাংকৃত্যায়ন মনে

করতেন চর্যাগীতি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। কিন্তু চর্যার রচনাকাল সম্পর্কে যে মতটি প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য সেই মতটি হল ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর মতে খ্রীষ্টাব্দ দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে চর্যার পদগুলি রচিত হয়েছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য, কবিদের আবির্ভাবকাল এবং পুঁথির ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ পর্যালোচনা করেই ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন।

টিপ্পনী

গ্রন্থনাম বিচার ঃ-

চর্যার গ্রন্থনাম নিয়ে পন্ডিত মহলে মত পার্থক্যের অন্ত নেই। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন চর্য্যাচর্য্য বীনশ্চয়' - নামটি কাল্পনিক। চর্যাগীতির প্রথম পৃষ্ঠায় চর্যাচর্যটিকা' কথাটির উল্লেখ ছিল - সেটিও সম্ভবতঃ পরবর্তী কালের সংযোজন। নামকরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মূলতঃ দুটি দিক থেকে নামকরণের রেওয়াজ ছিল- -এক, টিকার দিক থেকে, দুই, গীত সংকলনের দিক থেকে। কোন্ উৎস থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামকরণ করেছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না। তবে এটা লক্ষ করা গিয়েছে যে, বিনিশ্চয়-শব্দযুক্ত বৌদ্ধগ্রন্থগুলি ছিল টিকা গ্রন্থ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকৃত পুঁথিটিও ছিল টীকাগ্রন্থ। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল শাস্ত্রীমহাশয় হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা গ্রন্থটি প্রকাশকালে গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে যে 'তাঞ্জুর তালিকা' সংযুক্ত করেছিলেন তাতে মুনিদত্তের নামের পাশে চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' গ্রন্থটির নামোল্লেখ আছে - কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন।

অন্যদিকে পন্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী আশ্চর্যচর্য্যাচয়'- কে চর্যার সঠিক গ্রন্থনাম বলে নির্দেশ করেছেন। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে এর নাম হওয়া উচিত 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়'। ডঃ সুকুমার সেন শ্রীবাগচীর মত সমর্থন করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন আবার তাঁর সংকলন গ্রন্থের নাম দিয়েছেন চর্যাগীতি পদাবলী। শ্রীবাগচী কথিত 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়' - এর সঠিক উৎসটি জানা যায় নি।

বিভিন্ন পন্ডিত গবেষকের বিভিন্ন নামকরণের মধ্যে পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকৃত নামকরণটির তবুও একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। চর্য্য এবং আচর্য্য সন্ধিযুক্ত হয়ে 'চর্য্যাচর্য্য' শব্দটি গঠিত হয়েছে। চর্য্য শব্দের অর্থ আচরণীয় এবং অচর্য্য শব্দটির অর্থ হল অনাচরণীয়। সুতরাং আচরণীয় ও অনাচরণীয় বিষয়গুলি যে গ্রন্থে বিচার করা হয়েছে, সেই গ্রন্থই হল চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়। চর্যার তিব্বতী অনুবাদ গ্রন্থের নাম চর্যাগীতিকোষবৃত্তি। অন্যদিকে মুনিদত্তের নামে চর্যাগীতিকোষবৃত্তি গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে। সেই বিচারে অনেকে চর্যাগীতিকোষবৃত্তি কেই চর্যার যথার্থ নামকরণ বলতে চেয়েছেন। প্রখ্যাত সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটি গ্রহণের পক্ষপাতী।

চর্যার নামকরণ নিয়ে পন্ডিত মহলের বিতর্ক হয়তো অমীমাংসিতই থকবে - কিন্তু সাধারণ পাঠক সেই বিতর্কে অনুপ্রবেশ না করে চর্যাগীতি সংকলনকে চর্যাপদ বা চর্যাগীতিকা বলে গ্রহণ করতেই অধিকতর উৎসাহী।

চর্যার ভাষা ঃ

চর্যার ভাষার গোত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও বিতর্ক অন্তহীন। চর্যার প্রকৃত ভাষা কী, এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত।

ভাষাতাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে চর্যার ভাষার মধ্যে অল্প - স্বল্প বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া শব্দ থাকলেও এর আদিভাষা রূপ হল হিন্দি। অনুরূপভাবে ওড়িয়া, অসমীয়া ভাষাপন্ডিতেরাও চর্যাপদকে নিজ নিজ ভাষার আদি রূপ বলে দাবী জানিয়েছিলেন। আসলে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাস্তরে মাগধী অপভ্রংশের গুটি কেটে যখন বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দি,মগহী, অওধী, ভোজপুরি, ইত্যাদি ভাষা বেরিয়ে আসছিল, তখন একই ভাষা - উৎসজাত (মাগাধী অপভ্রংশ্য) ঐ ভাষাগুলি ভাষাতাত্ত্বিক, ধ্বনিতাত্ত্বিক, এবং রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ১৯২৬ সালে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'Origin Aand Development Of Bengali Language.' গ্রন্থে চর্যার ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ব্যাকরণ, ছন্দ বাগ্‌বিধি ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দৃঢ় মত ব্যক্ত করলেন যে, চর্যার ভাষা হল প্রাচিন বা আদিতম বাংলা, পক্ষান্তরে দোহাকোষ ও ডাকার্ণবের ভাষা হল শৌরসেনী অপভ্রংশ। ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহও সুনীতিকুমারের ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নেন।

চর্যার ভাষা আলোচনায় আর একটি দিকের প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য। চর্যাগীতিকায় বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের গুহ্য সাধনতত্ত্বকে বিবৃত করেছেন। এই সাধনতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে চর্যার কবিগণ গোপনীয়তা অবলম্বন করেছেন, এর উদ্দেশ্য অদীক্ষিত ব্যক্তির কাছে সাধনক্রিয়ার বিষয়টি অপ্রকাশিত রাখা। এজন্য কবিগণ তাঁদের রচনায় নানা পরিভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, ভাষাকে করে তুলেছেন সাংকেতিকতামন্ডিত ও আভিপ্রায়িক। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১ম খন্ড) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ''কোন পারিভাষিক, দুরূহ ও গুহ্য তত্ত্বকে বজ্রযান ও সহজযান লেখকেরা 'সন্ধ্যাভাষয়া বৌদ্ধব্যম্' বলিয়া একটা রহস্যময় ইঙ্গিত করিয়াছেন।'' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যাভাষা বলতে আলো - আঁধারি, অর্থাৎ রহস্যময় ভাষাকে বুঝিয়েছেন, যে ভাষার কতকটা বোধগম্য, আর কতকটা বোধগম্য নয়। এছাড়াও সন্ধ্যাভাষা সম্পর্কে নানা জনে নানা মত প্রদান করেছেন। কেউ 'সন্ধ্যা'র পরিবর্তে 'সন্ধা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ ''অভিপ্রেত, উদ্দিষ্ট, আভিপ্রায়িক বচন।'' চর্যার ভাষানাম যাই হোক না কেন, এখানকার ভাষা সরলার্থযুক্ত নয় - দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষাকে চর্যাকারগণ রূপক, সংকেত এবং নানা পরিভাষার মোড়কে রহস্যময় করে তুলেছেন। অদীক্ষিত পাঠকের কাছে সেইগুলির বহিরঙ্গ অর্থই প্রকাশিত হয়, অন্তরঙ্গ অর্থ নয়।

চর্যার সাধনতত্ত্ব ঃ-

তথাগত বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর বৌদ্ধধর্ম দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় - একটি হীনযান, অপরটি মহাযান। কালানুক্রমে সৃষ্ট হয় তান্ত্রিক বৌদ্ধস্তর। এই শেষোক্ত স্তরের একটি শাখা হল বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়।

'সহজ' এর অর্থ হল সহজাত। প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি সহজ বৃত্তি আছে। এগুলির মধ্যে প্রথম বৃত্তি হল কাম বা রতি। এই সহজ বৃত্তিটিকে অবলম্বন করে যে সাধনা, সেটাই হল

টিপ্পনী

সহজিয়া সাধনা।

কামবৃত্তির চরিতার্থতা হল সুখ, কিন্তু সেই সুখ পার্থিব সুখ। পার্থিব সুখ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা হয়, সুতরাং তা মহাসুখ নয়। আমরা যে পার্থিব সুখ উপভোগ করি তার প্রধান গ্রাহক হল মন। পার্থিব সুখের ভোক্তা মন ব্যতিরেকে যে সুখ লাভ, তাই - ই হল মহাসুখ। বৌদ্ধসহজিয়া সাধক নৈরাত্মার সাহচর্যে সহজ সুখ লাভে প্রত্যাশী। মহাসুখ হল পার্থিব সুখের কোটি কোটি গুণিতক সুখ, তা মন দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়। মনকে অ-মন করা মহাসুখ অর্জনের সাধন পদ্ধতি। সাধকের দক্ষিণ নাড়ীতে যখন আনন্দধারা বয়, তখন তা আনন্দ। বাম নাড়িতে যখন আনন্দধারা বয় তখন তা পরমানন্দ। যখন মধ্য-নাড়ী অবধূতায় আনন্দধারা বয় তখন বিরমানন্দ। এখানে পার্থিব আনন্দের বিরাম ও বিরতি ঘটে। চতুর্থ স্তরে রয়েছে সহজানন্দ। মধ্যমা নাড়ীর মধ্যদিয়ে উষ্ণীষ কমলে সাধক যে আনন্দ অনুভব করেন তখন সেই আনন্দ সহজানন্দ বা মহাসুখ। একে চতুর্থ আনন্দ বা তুরীয় আনন্দ বলে - এই আনন্দ বাক্‌পথাতীত, অনির্বচনীয়, । সুখ নেই, দুঃখ নেই, গ্রাহক - গ্রাহ্য নেই - এই বোধ হল সহজানন্দ।

টিপ্পনী

চর্যাগানে শূন্যতার কথা আছে, এই শূন্যতা পুদ্‌গল শূন্যতা। প্রাচীন বৌদ্ধদের নির্বাণ হল পুদ্‌গল শূন্যতার বোধ। এই বোধ নাম, রূপশূন্য বোধ। প্রাচীন বৌদ্ধরা ধর্মশূন্যতা স্বীকার করতেন না। মহাযানেরা কিন্তু দুয়েরি শূন্যতা স্বীকার করেন।

শূন্যবাদীদের দৃষ্টিতে জগৎ শূন্য, আমরা যে জগৎকে দেখি তা ব্যবহারিক সত্য, যা অসত্যকে সত্য করে দেখায় - রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত।

চর্যার সাধক-কবিগণ শুধু শূন্যতা নয়, করুণা ও মহাসুখের কথাও বলেছেন। মহাসুখরূপ নির্বাণ লাভের তত্ত্বই হল চর্যার প্রধান তত্ত্ব।

চর্যার তত্ত্ববেত্তাগণ সাধকদের জন্য একই সাধন - পথনির্দেশ করেননি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্পষ্টতঃই গুরুবাদের কথা বলেছেন - সদ্‌গুরু পুচ্ছিঅ জাণ, । আবার ৪০ নং চর্যাগানে সরাসরি বলা হচ্ছে -

আলে গুরু উএসই সীস।
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস।।
জেতই বোলী তেতবি টাল।
গুরু বোব সে সীসা কাল।।

এখানে গুরুর উপদেশবাক্যকে বৃথা' আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। পূজার্চনা যাগযজ্ঞ এসবকেও চর্যার সাধকগণ অর্থহীন বলে মনে করেছেন।

চর্যার সাধকগণ ছিলেন কবি। সাধনার গুহ্য তত্ত্ব কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের নানা বস্তু, বিষয়, প্রাকৃতিক ঘটনা ইত্যাদিকে রূপক - প্রতীক হিসাবে ব্যাবহার করেছেন, যার জন্য জটিল ও গূঢ় তত্ত্বকথার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে কাব্যগুণ। জগৎ মিথ্যা - এই সত্য বোঝাতে গিয়ে চর্যার কবি ভুসুকু মরু - মরুচীকা, গন্ধর্বনগরী, বন্ধ্যাপুত্র, বালুকাতৈল, আকাশ-কুসুম ইত্যাদি উপমা উপস্থিত করেছেন (৪১ নং)। অবধূতীর প্রসঙ্গে চর্যায় ব্যবহৃত হয়েছে ডোম্বী, কমলিনী, ইত্যাদি শব্দ। ১১ সংখ্যক পদে যোগশাস্ত্রসম্পর্কিত শব্দ নাড়িশক্তি রবিশশী, আলিকালি উল্লিখিত হয়েছে। ২৭ সংখ্যক পদের পারিভাষিক শব্দগুলি হল উষ্ণীষকমল

বত্রিশযোগিনী ইত্যাদি।

দীক্ষিতজনের নিকটই চর্যার রূপকার্থ ও সাংকেতিক অর্থ প্রতীয়মান হয়। এখানকার সন্ধ্যাভাষার যে আভিপ্রায়িক অর্থ তা কখনও বৌদ্ধধর্মাচারের সঙ্গে, কখনও তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে, কখনও দেহবাদী কৃত্যাদির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

চর্যার কবি-পরিচয় ঃ-

টিপ্পনী

চর্যার কবিদের প্রাথমিক পরিচয় হল তাঁরা সিদ্ধাচার্য। এঁরা সমাজের উচ্চবর্ণ থেকে শুরু একবারে অন্ত্যজ স্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এঁরা সহজিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে প্রচলিত সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও পিতৃদত্ত নাম পরত্যাগ করে ভিন্ন নাম গ্রহণ করেছিলেন। চর্যা গানের বিশিষ্ট কবিগণ হলেন -

লুইপাদ - ইনি আদি সিদ্ধাচার্য।

ভুসুকু - এঁর পুরো নাম রাউত ভুসুকু। অত্যন্ত শান্ত স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন তাই ভুসুকু। আর রাউত অর্থাৎ সেনাপতি বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন বলে রাউত।

কাহ্নপাদ - সাধক সমাজের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ছিলেন ইনি।

সরহপাদ - বৌদ্ধসহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক।

শবরীপাদ - বিশিষ্ট সাধক ও একাধিক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি লুইপাদের গুরু ছিলেন বলা হয়।

শান্তিপাদ - ইনি একজন উল্লেখযোগ্য সিদ্ধাচার্য।

ডোম্বীপাদ - চর্যার বিশিষ্ট কবি। মুনিদত্ত ডোম্বীকে 'লাড়ী' বলে উল্লেখ করেছেন।

চর্যার কাব্যমূল্য ঃ-

চর্যাগীতি হল বিষেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিগূঢ় সাধনতত্ত্ববিষয়ক গীতিকা। ধর্ম হল কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক উন্নয়নের জন্য প্রাক্ - নিদিষ্ট নীতি, উপদেশ, অনুশাসন,ও কৃত্যাদি পালনের মাধ্যম। নৈতিক শিক্ষামূলক প্রচারধর্মিতা ও শর্তহীন আনুগত্য - উভয়ই ধর্মানুগত্যের প্রধানতম শর্ত। এবং একথাও সত্য যে, ধর্মীয় নিয়মাবলী একান্তভাবেই কোন একটি ধর্মমতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধ থাকে। এছাড়া সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে প্রচারধর্মী যেমন নয়, তেমনি আরোপিত অনুশাসনের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ঘটানোও তার উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি। কিন্তু চর্যাপদ সম্প্রদায় বিশেষের সাধনভাষ্য, একে সাহিত্য বলা উচিত কিনা, কিংবা এর মধ্যে আদৌ সাহিত্যগুণ আছে আছে কিনা, সেটিও আমাদের একইসঙ্গে বিচার্য বিষয়।

আপাতদৃষ্টিতে চর্যাপদ হল বৌদ্ধতন্ত্রপ্রভাবিত দেহভাণ্ডস্থ সুপ্ত শক্তির জাগরণ ঘটানোর অধ্যাত্ম নির্দেশ। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রকুন্ডল, নৈরাত্মা চূড়ামণি, মহাসুখ, বা সহজানন্দ ইত্যাদি প্রসঙ্গ চর্যাপদের মুখ্য অবলম্বনীয় বিষয়বস্তু, কিন্তু প্রকৃত বিচারে এই সহজ সাধনতত্ত্বই চর্যার মুখ্য প্রতিপদ্য বিষয় নয়, ধর্মীয় তত্ত্বের অন্তরালে মানব জীবন ও সমাজের বহুবিধ বাস্তব সত্য,

তথ্য ও চিত্র এখানে আত্মগোপন করে আছে - চর্যার কবিতা পাঠে সেই মানব-জীবনসত্যের একটা বাহ্য অর্থ আমাদের কাছে সততই মূর্ত হয়ে ওঠে। এর প্রধানতম কারণ হল চর্যার কবিগণের মানবজীবনঅভিজ্ঞতা এবং সামাজিক জীবনের সঙ্গে পূর্বপরিচিতি। চর্যার কবিগণ একদা সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই চর্যার অধ্যাত্ম সংগীত রচনার সময় তাঁরা গূঢ় তত্ত্ব কথার প্রতীক বা রূপক হিসাবে দৈনন্দিন সামাজিক জীবনর পরিচিত অনুষঙ্গগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছেন। একারণেই ধর্মীয় সঙ্গীত হলেও চর্যাপদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সাহিত্যগুণ অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। শুধু চর্যাপদ নয়, পৃথিবীর বহুদেশেই ধর্মীয় রচনাদি কিছু না কিছু ভাবে সাহিত্য হিসাবে আলোচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই কথাগুলি মনে রেখেই আমরা চর্যার সাহিত্যগুণ নির্ণয়ে অগ্রসর হব।

টিপ্পনী

চর্যাপদে আমাদের সমাজ, লোকজীবন, বৈধ এবং অবৈধ প্রেম, দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম, দুঃখ ও দারিদ্র্য, মনুষ্যেতর প্রাণীদের প্রসঙ্গ, বিভিন্ন জীবিকাবৃত্তি ইত্যাদির কাব্যিক বর্ণনা যেমন অছে, তেমনি সেগুলির রূপকধর্মিতা এবং সার্থক চিত্রকল্প হয়ে ওঠার সৌন্দর্য আছে। চর্যার সাধক - কবিগণ যেন কবিচিত্তের অপার্থিব আনন্দে অলৌকিক সৃষ্টিকার্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেতে উঠেছেন। চর্যার ৬ সংখ্যক পদে লোলুপ শিকারীদের কবল থেকে হরিণী হরিণকে উদ্ধার করে কিভাবে অন্য বনে নিয়ে যায় তার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আছে। ২৮ সংখ্যক পদে উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী ইত্যাদি যে বর্ণনা আছে, সেই শবরীরব সঙ্গে প্রেমাভিলাষী শবরের যে প্রেমাশক্তিপূর্ণ জীবনলীলা, সেখানে চর্যাকারের কবি - মানসিকতারই সাবলীল প্রকাশনা ঘটেছে। চর্যার রচিয়তাগণ ছিলেন সমাজ-অভিজ্ঞ। দরিদ্রের জীবনযাত্রার মধ্যে যে সহস্র প্রতিকূলতা আছে, সে - সর্ম্পকে তাঁরা সু-অবহিত। চর্যার তত সংখ্যক পদে টিলার উপর বসবাসকারী এক দীন পরিবারে নিত্য অতিথি - অভ্যাগতের আগমনহেতু যে দারিদ্র্যজ্বালা তার বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় -

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।

কাহ্নপাদ ও ডোম্বীর রতি-রভসে নিশিযাপনের যে চিত্র নিসর্গ প্রকৃতির অনুষঙ্গে ২৮ সংখ্যক পদে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে নর-নারীর চিরন্তন প্রেমাকাঙ্ক্ষাই যেন জয়যুক্ত হয়েছে। তিন সংখ্যক পদে শুঁড়ীগৃহে মদ্যপায়ীর মদ্যপানের বাস্তব চিত্র যেমন অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি ৮ সংখক পদে যেখানে কবি বলেছেন 'সোণে ভরিতী করুণা নাবী / রূপা থোই নাহিক ঠাবী' - এর রূপকার্থ যাই হোক না কেন, এখানকার শব্দ চয়ন ও প্রকাশ ভঙ্গিমা নিঃসন্দেহে কবিত্বপূর্ণ।

দৈনন্দিন জীবনের বহু সজীব চিত্র যেমন ডোম রমণীর জীবন চর্যা, দরিদ্র গর্ভিনী রমণীর মানসিক দুঃখ কষ্ট, বহু সন্তানবিশিষ্ট পরিবারের দারিদ্র্য কথা, ব্যবসা বাণিজ্য - এগুলি চর্যার কবিগণের লেখনীতে কাবিক্য রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে শশক শৃঙ্গ, বালুআ তেল, আকাশফুলিলা, বলদ গরুর প্রসব কথা, দোহন করা দুধ বাঁটে ফিরে যাওয়া ইত্যাদির উল্লেখ হয়তো অতিরঞ্জিত বলে মনে হবে,কিন্তু দীক্ষিত সাধক সেগুলির মধ্যেই খুঁজে পান সাধন - পথের মণিমুক্তো। সাধনার সেই গূঢ় তত্ত্বটুকু বাদ দিলে অদীক্ষিত পাঠক কবি-কল্পনার ঐশ্বর্যে চমৎকৃত হয়ে ওঠেন।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
6

বস্তুতঃপক্ষে চর্যায় মানব জীবন - রসই শেষ পর্যন্ত মুখ্য হয়ে উঠেছে বলে চর্যাগানের

একটা সাহিত্যমূল্য অবশ্যই স্বীকৃত হতে পারে। ধর্ম জীবনেরই অঙ্গ, চর্যাগানে সেই 'ধর্মের সঙ্গে জীবন এবং জীবনের সঙ্গে ধর্ম' ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। চর্যার গানে একটা মিষ্টিক চেতনাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে - সেই হিসাবে চর্যার পদগুলিকে মিষ্টিক কবিতা হিসাবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। E.Underhill - এর ভাষায় - "All kinds of symbolic language come naturally to the articulate mystic, who is often a literary artist as well."

চর্যার গানগুলিকে অনেকে গীতিকবিতার সঙ্গে তুলনীয় বলেও মন্তব্য করেছেন, আধুনিক বাংলা ভাষায় এর কাব্য রূপও দেওয়া হয়েছে - হয়তো চর্যাপদ বিশুদ্ধ অর্থে গীতি কবিতা নয় কিন্তু প্রায়শঃই চর্যার সাধক কবিগণ তাঁদের ব্যক্তি অনুভূতিগুলি প্রকাশ করতে গিয়ে মন্ময় কবি হয়ে উঠেছেন। যে মন্ময়তা গীতিকবিতার অন্যতম লক্ষণ বিশেষ। অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন - "চর্যার বিষয় বস্তু যাহাই হউক চর্যার উদ্দেশ্য কিন্তু তাত্ত্বিক নহে, সাহিত্যিক। চর্যাকারদিগের দৃষ্টি দার্শনিকের দৃষ্টি নহে, কবি-দৃষ্টি। ..... চর্যাভাষার বিন্যাস গদ্য ধর্মী নহে, কাব্য ধর্মী ..... ।"

টিপ্পনী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ রচিত চর্যাপদের পর দীর্ঘ দুটি শতকে আর কোন উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্যের সন্ধান মেলে না। ত্রয়োদশ শতকের একবারে সূচনায় ইফতিকার - উদ্দীন - বিন - বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে এ দেশে তুর্কী আক্রমণ সংঘটিত হলে অচিরেই ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পত্তন ঘটে এখানে। বাংলাদেশে উদ্ভূত হয় চরম রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংকট। এই সংকটকালে বাঙালীর জীবন, শিল্প, সংস্কৃতি সবকিছুই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সঙ্গত কারণেই এই সময় পর্বটিকে ঐতিহাসিকগণ 'অন্ধকারযুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন।

দীর্ঘ ২০০ বছরের টালমাটাল অবস্থার যখন কিছুটা উন্নতি হল. তখন আদি মধ্যযুগে পুরাণ গ্রন্থ ও গ্রামীণ অঞ্চলে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণসম্পর্কিত লৌকিক প্রেমকাহিনী নিয়ে বড়ু চন্ডী দাস নামে একজন কবি আখ্যান বা পালাধর্মী কাব্যগ্রন্থ রচনা করলেন - গ্রন্থটির সম্পাদককৃত নামটি হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। চর্যাপদের পর আদিমধ্যযুগের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রথম প্রামাণিক সাহিত্যিক নির্দশন হল এই কাব্যগ্রন্থটি। বড়ু চন্ডীদাসের এই গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা নতুন দিকে মোড় নিয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কার, কাব্যনাম ও কবি - পরিচয় ঃ-

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কারও একটি কৌতূহলপ্রদ ঘটনার সামিল। বাংলা ১৩১৬ সন এবং ইংরেজী ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন সাহিত্য অনুরাগী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্লভ বাকুঁড়া - বিষ্ণুপুরের কাঁকিল্যা গ্রামনিবাসী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোশালার মাচা থেকে আদ্যন্ত খন্ডিত একটি পুঁথি উদ্ধার করেন। পুঁথিতে চন্ডীদাস, বড়ু চন্ডীদাস ইত্যাদি ভণিতা ব্যবহার করা হয়েছিল। পুঁথিটি লিখিত হয়েছিল তুলোট কাগজে। বসন্তরঞ্জন এবং প্রাচীন লিপি বিশারদ শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুঁথির লিপিকে অতিশয় প্রাচীন বলে মত প্রকাশ করেছেন। অতঃপর বাংলা ১৩২৩ সন, ইংরেজী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্লভের সম্পাদনায় বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষৎ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম নিয়ে পুঁথিটি প্রকাশিত হয়। যেহেতু পুঁথিটি আদ্যন্ত খন্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, এবং এর আখ্যাপত্র ও পুষ্পিকা বিনষ্ট হয়েগিয়েছিল, তাই পুঁথিটির গ্রন্থাকারকৃত নামকরণের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' – এই গ্রন্থনামটি সম্পূর্ণ রূপেই গ্রন্থকার দ্বারা প্রদত্ত।

পরবর্তীকালে পুঁথিটির মধ্যে একটি চিরকূট আবিষ্কৃত হয়। এই চিরকূটে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি উল্লিখিত ছিল। সেজন্য অনেকেই 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামটিকে পুঁথির প্রকৃত নাম বলে মনে করে থাকেন।

টিপ্পনী

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার একমাত্র নির্দশন বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং এর ভাষা রূপকে চৈতন্য পূর্ববর্তী বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ডঃ সুকুমার সেন এর ভাষাকে ১৬০০ খ্রীষ্টব্দের খুব একটা পূর্ববর্তী বলে মনে করেননি। কিন্তু চর্যার ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তী নয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটির রচিয়িতার নাম বড়ু চন্ডীদাস। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য ধারায় একাধিক চন্ডীদাসের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চন্ডীদাস পদাবলীর চন্ডীদাসদের তুলনায় স্বতন্ত্র এক কবি ব্যক্তিত্ব বলে অনেকেই মনে করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা বড়ু চন্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলীর মত কোন খন্ড কবিতা লেখেননি – তিনি আখ্যান জাতীয় গ্রন্থের রচয়িতা – যে আখ্যান ধারাটি চৈতন্য সমকাল বা পরবর্তীকালে আর অনুসৃত হয়নি। তাছাড়া বৈষ্ণব পদাবলীতে যে মধুর রসের একচ্ছত্র আধিপত্য বা রাগানুগা প্রেমের স্বীকৃতি, বড়ু চন্ডীদাসের কাব্যে তার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে বেশী। সে জন্য তাঁকে চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের কবি বলে উল্লেখ করার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। তাছাড়া এস্থলে এই পুঁথির ভাষার প্রাচীনত্বের দিকটিও উল্লেখ করার মত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কবি তাঁর ব্যবহৃত ভণিতারও সর্বথা একরূপতা বজায় রাখেননি। এটিও পন্ডিত মহলে বির্তকের সৃষ্টি করেছে। মূল পুঁথিতে কবি কোথাও অনন্ত বড়ু চন্ডীদাস, কোথাও অনন্ত বড়ু, আবার কোথাও শুধু চন্ডীদাস ভণিতা ব্যবহার করেছেন। কাব্যমধ্যে বাসুলী সেবক চন্ডীদাস হিসাবেও কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন। কাব্যটির মধ্যে কবি মোট ২৯৮ বার বড়ু চন্ডীদাস, এবং ১০৭ বার চন্ডীদাস ভণিতা ব্যবহার করেছেন। শেষ পর্যন্ত নানা জনের তর্ক – বির্তক থেকে যে নির্যাসটুকু বেরিয়ে আসে তাতে অবশ্যই ধারনা হয় যে, বড়ু চন্ডীদাস একজন সম্পূর্ন স্বতন্ত্র কবি, তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা, পদাবলী চন্ডীদাসের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।

কাব্য গঠন শৈল ঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মোট ১৩ টি খন্ড বা আখ্যানে বিভক্ত – সেগুলি হল ঃ- জন্ম খন্ড, তাম্বুল খন্ড, নৌকা খন্ড, ভার খন্ড, ছত্র খন্ড, বৃন্দাবন খন্ড, কালিয় দমন খন্ড, যমুনা খন্ড, হার খন্ড, বাণ খন্ড, বংশী খন্ড, ও রাধা বিরহ। এখান লক্ষণীয় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের শেষ আখ্যানটির সঙ্গে খন্ড শব্দটি যুক্ত হয়নি। এই কারণে এই অংশটিকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। কিন্তু ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ জন্ম খন্ড থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনী, চরিত্র ভাষারীতি এবং ঘটনার

ধারাবাহিকতার মধ্যে আন্তরমিল এত সুস্পষ্ট যে, 'রাধাবিরহ' অংশটিকে একই কবির রচনা বলে সিদ্ধান্ত করতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আখ্যানাংশ তিনটি চরিত্রের উক্তি – প্রত্যুক্তি দ্বারা গঠিত হয়েছে – চরিত্র তিনটি হল শ্রীকৃষ্ণ, রাধা এবং বড়ায়ি। এখানে উক্তি – প্রত্যুক্তির সংখ্যা ৪১৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যান – অংশের একটা সাঙ্গীতিক উপযোগিতা নিশ্চয় ছিল, কারণ কবি প্রতিটি কাব্যাংশের রাগ – রাগিনীর উল্লেখ করেছেন।

টিপ্পনী

গ্রন্থটির বিষয়বস্তুতে অসামান্য রূপবতী রাধাকে পাওয়ার জন্য কামনাতুর শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াস – এব্যাপারে দৌত্যকর্মটি সম্পাদন করেছে বড়ায়ি। কাব্যের সূচনা – অংশে রাধা প্রবল ভাবে কৃষ্ণবিমুখী। তার পর বংশী খন্ড থেকে রাধার ধীরে ধীরে মানসিকতা পরিবর্তনের সূত্রপাত এবং শেষপর্যন্ত কৃষ্ণমুখী রাধায় রূপান্তরিতকরণ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে সুস্থ রুচির প্রকাশ সর্বথা ঘটেনি। স্থূল দেহকামনা, ভোগাসক্তি, প্রেমনিবেদনের ভাষাগত স্থূলত্ব কাব্যটির মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন – কিন্তু এই কাব্যে বড়ু চন্ডীদাস কোথাও শ্রীকৃষ্ণের ঐশীরূপ অঙ্কন করেননি। ভূভার হরণের জন্য তাঁর মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ – এই শাস্ত্রীয় সত্য কৃষ্ণমুখে প্রচারিত হলেও কাব্যাংশে শ্রীকৃষ্ণ স্থূলরুচিসম্পন্ন; 'এগার বরিষের' রূপরবতী রাধার প্রতি তার আসক্তি ন্যায়, নীতি ও মানবিকতাশূন্য। কোন অধ্যাত্ম মহিমাধর হিসাবে নয়, একজন গ্রাম্য 'গমার যুবক' হিসেবেই শ্রীকৃষ্ণের কাব্যাংশে উপস্থিতি। তাই বলা হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে 'কৃষ্ণ ও নাই, কীর্তন ও নাই।'

চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা চরিত্রের একটা বিবর্তন আছে, কিন্তু একাব্যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের কোন বিকাশ, কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। তাঁর হৃদয় আদ্যন্ত প্রেমহীন – রাধার মনোব্যথার শরিক হয়ে এখানকার কৃষ্ণ চরিত্র কখনোই রাধার প্রতি সমব্যথী হয়ে ওঠেননি কিংবা চরম বিচ্ছেদ মুহূর্তেও কৃষ্ণের হৃদয়ে লেশমাত্র দুখঃবোধ সৃষ্টি হয়নি। উপরন্তু রাধাকে হত্যা করার মত নির্মম উক্তি পর্যন্ত কৃষ্ণ করেছেন –

'অতিরুষ্ট হআঁ রহিলা কাহ্নাঞি
রাধা মারিবার আশে।'

আর রাধা বিরহ অংশে নিদ্রিত রাধাকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ মথুরায় গমন করলে কৃষ্ণ বিরহে কাতরা রাধার দুখঃ দূর করার জন্য বড়ায়ি মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তনের কথা বললে, প্রেমহীন অহংকারী শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –

'যত দুঃখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে।।'

তবে মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণে কবির প্রয়াস প্রশংসনীয়। কৃষ্ণ চরিত্রের বিবর্তনহীনতার কথা বাদ দিলে বড়ায়ি চরিত্রাঙ্কনে কবি অনেকটাই সফল। বড়ায়ি কাব্যের প্রথমাংশে শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য দোসর হয়ে উঠলেও পরবর্তীকালে চরিত্রটির মধ্যে মানবিকতার সঞ্চার হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গোত্রবিচারে কোন্ শ্রেণীর, এ নিয়ে মত পার্থক্য আছে। আপাতদৃষ্টিতে

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে আখ্যানজাতীয় কাব্য বলা চলে। কিন্তু কাব্যটি আদ্যন্ত চরিত্রের উক্তি - প্রত্যুক্তিমূলক রীতিতে রচিত বলে একে অনেকে নাট্য জাতীয় রচনা বলেন। বিশুদ্ধ নাট্যশিল্পের উদাহরণ না হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে নাট্য-উপাদান আছে। সংস্কৃতে তিনটি চরিত্রের দ্বারা অভিনীত নাটককে বীথী বলে। সেই বিচারে শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি - এই তিনটি চরিত্রের সংলাপনির্ভর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটিকে বীথীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এছাড়াও কাব্যটির মধ্যে কেউ ধামালি, কেউ জাগের গান, কেউ ঝুমুর গানের বৈশিষ্ট্য আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

টিপ্পনী

মোটের উপর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি গীতিরসাত্মক আখ্যানধর্মী নাট্য - লক্ষণাক্রান্ত একটি রচনা হিসেবেই মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য বলে আমাদের মনে হয়।

কাব্যমূল্য বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ- ব্যবহার সম্পর্কেও দু একটি কথা বলতে হয়। এই কাব্যের ছন্দোনির্মাণে গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের প্রভাব অনেক স্থানেই লক্ষ্য করা যাবে। পয়ার ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে বড়ু চন্ডীদাসের কৃতিত্ব অসাধারণ। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রথম খন্ডে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ব্যবহৃত পয়ারের সাতটি প্রকরণের কথা উল্লেখ করেছেন।

বড়ু চন্ডীদাস কোন আধ্যাত্মিক মহিমা প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর কাব্যে লোকায়ত জীবনে প্রচলিত যে রাধাকৃষ্ণলীলাসংক্রান্ত কাহিনী প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে বিভিন্ন পুরাণ - উপপুরাণ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে তিনি লোক জীবনের চাহিদা ও বিনোদনের অনুকূল এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। সুতরাং গ্রাম্যতা ও স্থূলরুচির পরিবেশনজনিত যে রুচি-বিকৃতির অভিযোগ কাব্যটির বিরুদ্ধে আনা হয় ,তার জন্য বড়ু চন্ডীদাসকে ষোলোআনা দায়ী করা যায় না।

প্রথম একক - খ

অনুবাদ সাহিত্য

মালাধর বসু - শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদক

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মূলতঃ তিনটি ধারায় অনুবাদ সাহিত্য রচিত হয়েছিল - শ্রীমদ্‌ভাগবত, রামায়ণ, এবং মহাভারত। সেগুলির মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ সাধারণ পাঠকমহলে যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, সেই তুলনায় ভাগবতের অনুবাদ সেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। এর কারণ ভাগবতগ্রন্থ হল তত্ত্ব প্রধান, এখানে কাহিনী অংশ গৌণ। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত প্রধানতঃ কাহিনীমূলক। গল্পরসের প্রতিই সাধারণ পাঠকের আকর্ষণ যেহেতু বেশী, সেইহেতু ভাগবত - অনুবাদ গ্রন্থ রামায়ণ মহাভারতের সমকক্ষ হতে পারেনি। দ্বিতীয়ত চৈতন্য আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শনে যে মধুররসের একচ্ছত্র আধিপত্য, ভাগবত গ্রন্থে কিন্তু তার স্ফুরন ঘটেনি - সেখানে রয়েছে ঐশ্বর্য ভাবের প্রাধান্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সে জন্য শ্রীকৃষ্ণের মুখে আমরা শুনি - 'ঐশ্বর্যমন্ডিত প্রেমে নাহি আমি প্রীত।' সুতরাং সাধারণ মানুষ, বিশেষত বৈষ্ণব ভক্ত সমাজ ভাগবত গ্রন্থের প্রতি ততখানি আগ্রহী হয়ে ওঠেনি। তৃতীয়ত ঃ- মধ্যযুগের ভাগবত গ্রন্থের সম্পুর্ণ অনুবাদ-দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। ভাগবতের দু

একটি স্কন্ধের অনুবাদই কবিগণ করেছিলেন - ফলে গ্রন্থটির সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণালাভের সুযোগ সেখানে নেই। চতুর্থত ঃ- চৈতন্যসমকালীন ও চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের হলদিনী শক্তি শ্রীরাধার যে গুরুত্বপুর্ণ অবস্থান, ভাগবতগ্রন্থে সেই শ্রীরাধার নামটাই অনুল্লিখিত থেকে গিয়েছে। এই অনুল্লেখ বৈষ্ণব ভক্তের নিকট গ্রহণাযোগ্য বলে মনে হয়নি।

তবে জনপ্রিয়তার মাত্রা কম হলেও মধ্যযুগের বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকজন কবি শ্রীমদ্ভাগবতের নির্বাচিত কিছু স্কন্ধ অনুবাদে আত্মনিযোগ করেছিলেন। এই অনুবাদকদের মধ্যে মালাধর বসু কবি প্রতিভায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। মালাধর বসু প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি। বর্ধমানের কুলীন গ্রাম তাঁর জন্ম স্থান। গুণরাজ খান ছিল তাঁর উপাধি। মালাধর বসুর অনূদিত গ্রন্থটির নাম হল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। 'গোবিন্দমঙ্গল' বা 'গোবিন্দবিজয়' নামেও এর পরিচিতি আছে। কথিত আছে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং মালাধর বসুর কাব্যপাঠ করে অপার্থিব আনন্দরসে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। শুধু কবি নয়, কবির গ্রাম সম্পর্কেও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। এই শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে মহাপ্রভু বলেছিলেন -

প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুকুর ।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জনে বহুদুর।।

টিপ্পনী

গ্রন্থ-রচনাকাল ঃ

মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের কাছে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু এই গৌড়েশ্বর প্রকৃত পক্ষে কে, সে বিষয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। এ প্রসঙ্গে কাব্যমধ্যে কবি তাঁর কাব্য রচনার কালজ্ঞাপক যে শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন সেটি এখানে উদ্ধৃতি যোগ্য -

''তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন।''

শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া যায়। সেই হিসাবে মালাধরের গ্রন্থ রচনার সূচনাকাল হল ১৪৭৩ খ্রীঃ এবং সমাপ্তিকাল হল ১৪৮০ খ্রীঃ। ইতিহাসের নানা ঘটনাসূত্র বিচার করে কবির উপাধিদাতা গৌড়েশ্বরের একটি নাম সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ সাব্যস্ত করেছেন - সেই গৌড়েশ্বর হলেন রুকনুদ্দীন বরবকশাহ।

কাব্য পরিচয় ঃ

মালাধর বসু সুবিশাল ভাগবতগ্রন্থের সম্পুর্ণ অনুবাদ করেনেনি। তিনি ভাগবতের দশম ও একাদশ এই দুটি স্কন্ধ অনুবাদ করেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণজন্ম, বৃন্দাবন লীলা, মথুরা লীলা, এবং কুরুক্ষেত্র কাহিনী এবং একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগের কাহিনী। মালাধর বসু তাঁর গ্রন্থ রচনার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন -

'ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে কহি পাঁচালি রচিয়া।।'

একটু ভিন্নভাবে প্রায় একই কথা অন্যত্র বলেছেন এই ভাষায় -

'ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে।।'

টিপ্পনী

ভাগবত কাহিনীকে লৌকিক মানুষের কাছে লৌকিক মতে প্রচার করতে চেয়েছিলেন মালাধর বসু - এর পেছনে একটি আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যও তাঁর ছিল। কবি ভাগবতের সমগ্র ঘটনার অনুবাদ না করলেও অনুবাদের জন্য তাঁর নির্বাচিত অংশটি প্রশংসালাভের যোগ্য। কারণ এই অংশে কবি কাহিনীর একটা ক্ষীণ সূত্র লক্ষ্য করেছিলেন - যা মূল গ্রন্থের অন্যত্র পাওয়া দুর্লভ।

ভাগবত অনুবাদে মালাধর বসু মূল গ্রন্থনিষ্ঠা ও কাব্যনিষ্ঠা কোনটির প্রতিই অবহেলা প্রদর্শন করেননি। কাব্য মধ্যে কৃষ্ণের আদিরসাত্মক লীলাকাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত ও সংহত আকারে কবি পরিবেশন করেছেন। মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যশক্তির মহিমা অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। এই শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' -কবির এই উক্তি চৈতন্যদেবকে ভক্তিরসে আপ্লুত করেছিল। ভাগবতগ্রন্থের প্রতি মহাপ্রভুর এই জাতীয় ভক্তিমার্গীয় দুর্বলতার প্রকাশ তাঁর সমকালের বৈষ্ণব ভক্তসমাজকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

কবি প্রতিভার বিচারে মালাধর বসু খুব বড় কবি নয়। তবে ভাগবতের মত তত্ত্ব, দর্শন, জ্ঞানগর্ভ জটিল গ্রন্থ অনুবাদের যে সৎ প্রয়াস তাঁর মধ্যে লক্ষিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মালাধর বসু মধ্যযুগীয় পরিবেশে আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির কাছে বিস্মৃত প্রায় একটি মূল্যবান গ্রন্থের পুনরুজ্জীবন লাভের সদর্থক ব্যবস্থা করেছিলেন, সেজন্য অবশ্যই তিনি বাঙালীর সাধুবাদ পাবেন।

কবি কৃত্তিবাস ওঝা - রামায়ণ অনুবাদক।

আদি কবি বাল্মীকির সপ্তকান্ডে বিন্যস্ত রামায়ণ মহাকাব্যের সুবিপুল প্রভাব ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছে। মহাভারতের রাজকীয় ঐশ্বর্য, আভিজাত্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ-ক্ষমতালাভ, সাম্রাজ্যের-উত্থান-পতন-ধর্মতত্ত্ব, দার্শনিকতা, রাজনীতি-কূটনীতি-পারিবারিক আদর্শ সবকিছুর মধ্যে একটা বিরাটত্ব অছে, হয়তো মহাকাব্যিক মহিমা রামায়ণ অপেক্ষাও তার বেশী, 'কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের যদি কোন চিরকালীন বাণী থাকে, তবে তাহা হইতেছে, গৃহজীবনের শান্ত শুচিস্নিগ্ধ চারিত্র নীতি। ভারতবর্ষ যাহা হইতে চাহিয়াছে, রামায়ণে তাহা সে পাইয়াছে।'' (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খন্ড)। এই অর্থে রামায়ণের মহাকাব্যিক মহিমা অন্যত্র। বাল্মীকি-রামায়ণকে বাদ দিলে আরও কয়েকটি রামায়ণ গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই, সেগুলি হল- অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং অধ্যাত্মরামায়ণ।

আদি আর্য কবি বাল্মীকির অলোকসামান্য সৃষ্টি রামায়ণগ্রন্থের গুরুত্ব ও মহিমা উপলব্ধি করে নদীয়া জেলার ফুলিয়ার অধিবাসী কবি কৃত্তিবাস ঐ ঐতিহ্যমন্ডিত মহাকাব্যের বাংলা অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন - অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে এটা একটা অন্যতম দুরূহ কর্মবিশেষ। কবি কৃত্তিবাস সেই কাজে অভূতপুর্ব সাফল্য অর্জনও করেছিলেন। মধ্য যুগের প্রায় ৫০০ বছরের সময়কাল পেরিয়ে কৃত্তিবাসের গ্রন্থটি বাংলার ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত- অল্পশিক্ষিত এমনকি অশিক্ষিত সমাজেও ব্যাপকতর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে - ভারতীয় অন্য কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে এমনটি প্রায় দৃষ্ট হয় না বললেই চলে।

কবি পরিচয় ঃ

মুরারী ওঝার পৌত্র এবং বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস ওঝা নদীয়া জেলার ফুলিয়া অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এই রকম প্রতিভাবান কবি খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেননি। জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে –

'রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি।।'

অন্যদিকে কৃত্তিবাসের নামে প্রাপ্ত একটি পুঁথিতে স্বয়ং কৃত্তিবাস উল্লেখ করেছেন –

'সাতকান্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পন্ডিত।।'

গ্রন্থমধ্যে 'আত্মবিবরণ' অংশে কবি কৃত্তিবাস যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, কৃত্তিবাসের নামে প্রাপ্ত অসংখ্য পুঁথির আত্মবিবরণ অংশের পাঠের সঙ্গে তার অসঙ্গিত আছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, বনমালী ওঝার ছয় পুত্রের মধ্যে কৃত্তিবাস অন্যতম। তাঁর জন্ম সন বিষয়ে কবির মত নিম্নরূপ ঃ

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য (পূর্ণ) মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।

কোন এক পুণ্য অথবা পূর্ণ মাঘ মাসে পঞ্চমী তিথি, রবিবার কবির জন্ম হয়। বিভিন্ন জ্যোতিষী গণনা ও অঙ্কের মাধ্যমে 'পুণ্য মাঘ মাস' কথাগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি কৃত্তিবাস ওঝার একটা সর্বজনগ্রাহ্য জন্মকাল নির্ণয় করেন। তিনি বলেন কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে যে গৌড়েশ্বরের উল্লেখ করেছেন,তিনি সম্ভবত হিন্দু ছিলেন। রাজাগণেশ ১৪১৮ সালে খুব অল্প সময়ের জন্য রাজা হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস তাঁর ২০ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৪১৮ সালে গৌড়েশ্বর গণেশের রাজসভায় উপনীত হয়েছিলেন। তবে এই সিদ্ধান্তও বির্তকের ঊর্ধ্বে নয়।

কৃত্তিবাস তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম দিয়েছেন – রামায়ণ পাঁচালী। পাঁচালীতে শিথিল কাহিনী – বিন্যাস লক্ষিত হয় – চরিত্র- গুলিও হয় অগভীর এবং ভাষার ওজস্বিতার পরিবর্তে থাকে সারল্য। কিন্তু কৃত্তিবাসের অনূদিত গ্রন্থে পাঁচালী–সুলভ সেই শিল্প শৈথিল্য নেই বললেই চলে।

কবি কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি – কোথাও তিনি মূল কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছেন, কোথাও স্বকপোলকল্পিত কাহিনী যুক্ত করেছেন, আবার কোথাও বা প্রচলিত রামকথা, কিংবদন্তী বা অন্য কোন রামায়ণ গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। কৃত্তিবাসের কাহিনীগ্রন্থন শিথিল নয়, জমাটবদ্ধ। কিন্তু এও সত্য, মূল মহাকাব্যের বিশাল প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী, প্রজ্ঞা, সর্বব্যাপ্ত জীবনবোধ, দেশ – কাল – সমাজ – ইতিহাসসম্পৃক্ত গভীরতা কৃত্তিবাসে নেই – সেখানে আছে বাঙালী জীবনের অনুকূল ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্রসন্নিবেশ। অনেক স্থলে লঘু ও হাস্যকর ঘটনা উপস্থাপন তার কাব্যের গাম্ভীর্যকেও অনেকাংশে বিনিষ্ট করেছে। ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় এরকম কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি হল – তাড়কা বধ, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন, ভরতের বাঁটুলে হনুমানের আকাশ থেকে ভূমিতলে পতন, কুম্ভকর্ণের

টিপ্পনী

নিদ্রাভঙ্গ ইত্যাদি।

কৃত্তিবাস তাঁর গ্রন্থের যে সমস্ত অংশে বাল্মীকি – রামায়ণকে মোটামুটি অনুসরণ করেছেন সেখানে কবির কাব্যপ্রতিভার যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন রামের নির্বাসন কাহিনী, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের পর রামচন্দ্রের বিলাপদৃশ্য, শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পতনকাহিনী, সীতার অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি।

টিপ্পনী

চরিত্র – চিত্রণেও কৃত্তিবাসের সীমাবদ্ধতার কথা অস্বীকার করা যায় না। বাল্মীকি–অঙ্কিত চরিত্রের যে পৌরাণিক মাহাত্ম্য ও সর্বজনীনতা তা প্রায় ক্ষেত্রেই কৃত্তিবাসে অনুপস্থিত। রামায়ণের রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত এক একটি আর্দশের প্রতীক। চরিত্রের অন্তর্নিহিত সেই স্বরূপধর্মকে কৃত্তিবাস তাঁর গ্রন্থে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

কৃত্তিবাস যে সময়ের কবি, সেই সময়কাল নানান রাষ্ট্রীয় উপপ্লবে সংকটাকীর্ণ ছিল।ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আগ্রাসনে তখন দেশীয় শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি নানভাবে উৎপীড়িত হচ্ছিল। এই যুগসংকটে কৃত্তিবাস রামায়ণের মূল কাহিনীর বিশুদ্ধ মানবাদর্শকে গভীরভাবে অনুধাবন করার সুযোগ পাননি। ফলতঃ তিনি রামায়ণকাহিনীকে যথাসম্ভব বাংলার সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যের ঐতিহাসিকের মন্তব্য ঃ কৃত্তিবাসের বর্ণনায় চিত্রকূট পর্বত আমাদের ধান্যক্ষেত্রের পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কল্লোলিত সমুদ্র বাংলাদেশের খাল, বিল, জলাশয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং রাম – রাবণের যুদ্ধ দুই জমিদারের কলহ – দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হইয়াছে। বানরগণ একবারেই শাখামৃগ, রাক্ষসগণ নরমাংসভোজী বর্বর অনার্য।

রস সৃজন ঃ

রামায়ণ মহাকাব্যে মূলতঃ করুণরসপ্রধান কাব্য। কবি কৃত্তিবাসও তাঁর গ্রন্থে করুণরসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেককে স্থগিত রেখে রাম–সীতা–লক্ষ্মণের বনগমন, পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু, অযোধ্যাবাসীর হাহাকার, সীতাহরণ, রামচন্দ্রের করুণ বিলাপ, বালী বধ, লঙ্কার যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ, বীরবাহু, ইন্দ্রজিতের মৃত্যু, রাবণ নিধন, সীতা নির্বাসন, সীতার পাতাল প্রবেশ ইত্যাদি ঘটনায় করুণ রসের প্রাবল্যকে অস্বীকার করা যায় না। কৃত্তিবাস মূল রামায়ণের এই সমস্ত ঘটনা যথাসম্ভব অনুসরণ করেছেন।

আবার রামায়ণ ঘটনায় যে সমস্ত স্থানে বীররসের স্ফুরণ ঘটেছে, কৃত্তিবাস তাঁর গ্রন্থে সেই বীররসের চিত্র অঙ্কন করার প্রয়াস করলেও খুব একটা সফল হননি। এর প্রধান কারণ কৃত্তিবাস গ্রন্থে অতি মাত্রায় ভক্তিরসের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন – যা বীররসের গাম্ভীর্যকে অনেকাংশে ব্যাহত করেছে। তবে মূল রসের বিপরীতে এই গ্রন্থে হাস্যরসের ব্যবহারে কৃত্তিবাস অনেকটাই সার্থক।

<u>কৃত্তিবাসের রচনায় বাঙালীয়ানা</u> ঃ

বাল্মীকি – রামায়ণের সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি কৃত্তিবাসী রামায়ণে নেই, কৃত্তিবাসী রামায়ণে রয়েছে আঞ্চলিকতার ছাপ। এখানকার চরিত্র, কাহিনী, স্থান, পরিবেশ, নিসর্গচিত্র, আচার–আচরণ, ধর্মীয় কৃত্যাদি, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির বর্ণনায় কৃত্তিবাস যেন বাংলা ও বাঙালীর প্রাণের দোসর হয়ে উঠেছেন। পারিবারিক সম্পর্কের মিষ্টি–মধুর বর্ণনায়, আবার ঈর্ষা – ঘৃণা ও স্বার্থপরতার পরিচয়

প্রদানে কৃত্তিবাস বাঙালী পরিবারকেই তাঁর প্রধান আশ্রয়স্থল করে তুলেছেন। বিভিন্ন স্থান-নাম উল্লেখকালেও কৃত্তিবাস বাংলার ভৌগোলিক অঞ্চলকে বিস্মৃত হতে পারেননি। আহার্য দ্রব্যের তালিকায় কৃত্তিবাস বাঙালীর প্রিয় আম, কাঁঠাল, দুধ, দই, কলা, নারকেল, কই মাছ, চিতল মাছ সবই অন্তর্ভূক্ত করেছেন। পিঠে, পায়েস, সরুচাকুলি, গুড়পিঠা, পাঁপড়, কোন কিছুই সেই তালিকা থেকে বাদ যায়নি। পশু পাখির তালিকায় কৃত্তিবাস বাংলার সমগ্র পক্ষীকুলকে অর্ন্তভুক্ত করেছেন আর নিসর্গচিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন শস্যশ্যামলা বাংলাদেশকে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মর্ন্তব্য স্মর্তব্যঃ কৃত্তিবাসের রামায়ণ "মূল রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া বাঙালীর হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্যে হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলা মহাকাব্য বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙালী সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে"।

টিপ্পনী

<u>কাশীরাম দাস - মহাভারতের অনুবাদক</u> ঃ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে কয়েকজন কবি যুগোত্তীর্ণ সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, মহাভারতের বাংলা অনুবাদক কাশীরাম দাস তাঁদের অন্যতম। বস্তুতঃপক্ষে অনুবাদ সাহিত্যে 'রামায়ণ পাঁচালী' রচয়িতা কবি কৃত্তিবাসের নামের সঙ্গে তাঁর নামটি অবশ্যউচ্চার্য। মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের ত্রিধারা বলতে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদকে বোঝায়। ভাগবত অনুবাদ সাধারণ পাঠক মহলে খুব একটা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত বাংলার তাবৎ পাঠককুলকে মাতোয়ারা করে দিয়েছিল। কারণ উভয় গ্রন্থই হচ্ছে কাহিনী বা গল্পমুখ্য, আর গল্পরসের প্রতি বাঙালীর রয়েছে চিরকালীন দুর্বলতা।

মূল মহাভারত মহাকবি বেদব্যাস সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন - এটি একটি মহাকাব্য। অষ্টাদশ পর্বে বিন্যস্ত এই বিশাল মহাকাব্যে (প্রায় এক লক্ষ শ্লোক সমন্বিত) গ্রথিত হয়ছে অসংখ্য ছোট-বড় কাহিনী, হাজারো চরিত্র। ভারতীয় মহাজীবনের সামগ্রিক রূপচিত্র এই মহাকাব্যটি।

মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে মহাভারত অনুবাদের ধারাটির সূত্রপাত হয়। অধিকাংশ সাহিত্যের ঐতিহাসিকের মতে 'পরাগলী মহাভারত' - এর রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর হলেন প্রাচীনতম মহাভারত অনুবাদক। এ প্রসঙ্গে সঞ্জয় এবং শ্রীকর নন্দীর নামও উচ্চারিত হয়। এদের মধ্যে শ্রীকর নন্দী কেবল মাত্র মহাভারতের 'অশ্বমেধ' পর্বটি অনুবাদ করেছিলেন।

মহাভারতকাহিনীর সামগ্রিক অনুবাদ করেছিলেন কাশীরাম দাস। মহাভারতের মত বিশাল ও জটিল মহাকাব্যের এমন সাবলীল ও প্রাঞ্জল অনুবাদকর্ম যে কোন কবির কাছেই অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

কাশীরাম দাসের আবির্ভাব কাল, কাব্যরচনাকাল ইত্যাদি নিয়ে পন্ডিত-গবেষক মহলে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কাশীরাম দাস নিজেও তাঁর পুঁথির কোন কোন অংশে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করেছেন। যেমন -

'ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গী গ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস-পুত্র সুধাকর নাম।।
তৎপুত্র কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।।

পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ।।'

মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব কাল বা কাব্যরচনার সঠিক সময় নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। কাশীরাম দাসের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। কবির আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের রচিত 'জগৎমঙ্গল' কাব্যের একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হতে পারে -

'চতুঃষষ্ঠি শকাব্দা সহস্র পঞ্চশৎ।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত।।'

টিপ্পনী

এই শ্লোকটি থেকে 'সহস্র পঞ্চাশ' অর্থাৎ ১৫০০ এবং 'চতুঃষষ্ঠি' অর্থাৎ ৬৪ - এই ১৫৬৪ শকাব্দের কথাটি জানা হয়। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির সহস্র পঞ্চাশ সন অর্থাৎ ১০৫০ বলতে বঙ্গাব্দকেই বোঝানো হয়েছে। শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে প্রাপ্ত খ্রীষ্টাব্দ দাঁড়ায় ১৬৪২-৪৩। সুতরাং 'জগৎমঙ্গল' কাব্য যদি ১৬৪২-৪৩ সালে রচিত হয়ে থাকে, তবে কাশীরাম দাসের মহাভারতের কিছু পূর্বেই রচিত হওয়া সম্ভব। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খন্ড) গ্রন্থে প্রচলিত বিভিন্ন মত বিচার - পুনর্বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কাশীরাম দাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত হন এবং ১৬৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তাঁর অনুবাদকর্ম সমাপ্ত করেন। কাশীরাম দাস সম্ভবতঃ মহাভারতের চারটি পর্বের অনুবাদ করেন এবং কাব্যের অবশিষ্ট অংশ প্রক্ষিপ্ত বলেই অনেকের ধারণা।

কাশীরাম দাস ছিলেন বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের অনুসারী। বৈষ্ণবীয় কোমল-শান্ত-স্নিগ্ধ প্রেমের মমতাময়ী স্পর্শে মহাভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ-ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-রাজনীতি-কূটনীতি-রাষ্ট্রনীতি, আধ্যাত্মিক দর্শনের তত্ত্ব ইত্যাদি যেন কাশীরাম দাসের গ্রন্থে বাঙালীর শান্ত শীতল-স্নিগ্ধ মনোবৃত্তির সহজ-সরল প্রকাশনা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কাশীরাম দাসের সমগ্র কাব্য- পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল একটা সহজ সরল কিন্তু পুর্ণাঙ্গ শিল্প সৃষ্টির প্রত্যয়।

কাশীরাম দাস সংস্কৃত ভাষা-অনভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি পুরাণ বা কথকতা পাঠ শুনে মহাভারত গ্রন্থ রচনার উদ্যোগী হয়েছিলেন - এরূপ লোকশ্রুতিও এক সময় বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কবির কাব্য আদ্যন্ত পাঠ করলে কাশীরাম দাসের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান নিয়ে কোন বিরূপ মন্তব্য কখনই করা যাবেনা।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন - 'বেদব্যাস রচিত মূল সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করিলে কাশীরামের কৃতিত্ব বুঝা যাইবে।..... মূল সংস্কৃত মহাভারত অবলম্বন করিয়া তাহাকে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিয়াছেন। সংস্কৃত না জানিলে এরূপ করিতে পারিতেন না।'' কাশীরাম দাসকৃত অনুবাদে কোথাও কোথাও বেদব্যাস বর্ণিত মূল সংস্কৃতের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদও দৃষ্ট হবে। কাহিনী বিন্যাসে কাশীরাম দাস প্রয়োজনে অন্যান্য মহাভারতীয় আখ্যান যেমন 'জৈমিনি ভারত', পুরাণ ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাষারীতির মধ্যে তৎসম-শব্দবাহুল্য, সংস্কৃত ভাষার গুরুগাম্ভীর্য, সংহত বর্ণনা শৈলী ইত্যাদি দৃষ্ট হবে, যা তাকে অধিকাংশক্ষেত্রেই ক্লাসিক রীতির উত্তরাধিকারী বলে প্রতিপন্ন করে। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ পাঁচালীর' ভাষা-সারল্যের সঙ্গে কবি কাশীরাম দাসের এখানেই ভিন্নতা। যেমন লক্ষ্যভেদনিবিষ্ট অর্জুনের রূপচিত্র বর্ণনায় কবির ভাষারীতি -

দেব দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।।.....
মহাবীর্য যেন সূর্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশ যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত।।

কাশীরাম দাসের কাব্যে স্থানে স্থানে এরূপ ক্ল্যাসিক বর্ণনা মহাকাব্যের শিল্পমহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

টিপ্পনী

কাশীরাম দাস চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে সব সময় আর্য মহাকাব্যের সর্বভারতীয় রূপবৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস করেননি। এই কাব্যে অর্জুন-শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী-হিড়িম্বার কলহ, যুধিষ্ঠির, কুন্তী এবং অন্যান্য চরিত্র, খল-শঠ-লোভী চরিত্র সব ক্ষেত্রেই একটা বাঙালীয়ানার মেজাজ কাশীরাম দাস আনতে চেয়েছেন।

কাশীরাম দাস হয়তো মহাকবি হয়ে উঠতে পারেননি কিন্তু তিনি "পাঁচালীর ঢালা গ্রামীণ সুরের সঙ্গে দুই চারটি তৎসম শব্দবহুল ধ্রুপদী তান লাগাইয়া মধ্যযুগীয় এলায়িত পয়ার-লাচাড়ী ছন্দের মধ্যেও এক প্রকার পৌরাণিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন।"

কাব্যমধ্যে কবি কাশীরাম দাস মহাভারতগ্রন্থের মাহাত্ম্য কীর্তন করে বলেছেন -

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।'

আর অন্যদিকে রেনেশাঁস যুগের এক আধুনিক যুগন্ধর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাশীরাম দাসকে বরণ করেছেন এই ভাবে-

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।।'

প্রথম একক

(গ)

চৈতন্য জীবনী-সাহিত্য

ভূমিকা

গৌড়-বঙ্গের এক বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় যুগ-সন্ধিক্ষণে নদীয়ার নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যুগাবতার,'পতিত পাবন,' 'রাধাকৃষ্ণদ্যুতিসুবলিত নরচন্দ্রমা' ও সর্বধর্মসমন্বয়কারী শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। স্মৃতি সংহিতার প্রবল প্রতাপে দেশে ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর তখন 'অন্তঃসারশূন্য আস্ফালন,' সেই আস্ফালন ও উৎপীড়নে সমাজের নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের তীব্র নাভিশ্বাস; কুসংস্কার আর ধর্মের শুষ্ক আচার-আচরণ ও অনুশাসনের জয়জয়কার, আর

তারই মাঝে পড়ে প্রবলভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছিল সমগ্র হিন্দু সমাজ। সেই অবক্ষীয়মান পশ্চাদ্‌পদ জাতির জীবনে ত্রাণকর্তা হিসেবে নদীয়ার নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তাঁর অনাবিল ভক্তিপ্রেমের বাঁধভাঙা-স্রোতে 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।' বহুধাবিভক্ত শ্রেণীবৈষম্যের অযুত জঞ্জালে হিন্দুধর্মের ভাবাদর্শ যখন নিমজ্জিতপ্রায়, সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা যখন হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও ইসালাম ধর্মের 'অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকাতলে' সমবেত, তখন নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণপরিবারের এই 'সাম্যবাদী বিপ্লবী' মানবপ্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ করে বললেন - চন্ডালোহপি দ্বিজোশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ। অকূল সমুদ্রে নিমজ্জমান হিন্দু জাতির সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যেন মুহূর্তের মধ্যে তাদের জীবন-তরীকে ভাসমান দেখল - সেই তরীর নাবিক শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং। ঐতিহাসিক কালপর্বের বিচারে তাই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব পঞ্চাদশ শতকের শেষ পর্বে, আর চৈতন্যযুগের সূচনা ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে এবং তার ব্যাপ্তি সমগ্র ষোড়শ শতক জুড়ে। অবশ্য ষোড়শ শতকেই চৈতন্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটেনি, তাঁর অলোকসামান্য দিব্যজীবনের প্রভাব সমগ্র সপ্তদশ শতকেও বিরাজিত ছিল।

টিপ্পনী

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রেমভক্তির অসাধারণ প্রভাবে সমকালীন মুসলমান শাসকগণের প্রবল প্রতাপ, প্রভাব ও বিরোধিতাকে অতিক্রম করে বাঙালী হিন্দুর প্রাণে নবজাগরণের প্রাণশক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চৈতন্যদেবকেন্দ্রিক এই 'নজাগরণ' বা রেনেশাঁসের ফলেই বাঙালীর সাহিত্য - সংস্কৃতি সবকিছুই যেন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। পুরোনো সাহিত্যধারার প্রবহমনেতার সঙ্গে এ যুগে সৃষ্ট হল নতুন নতুন আঙ্গিকের গ্রন্থ। আঙ্গিকের নতুনত্বের দিক থেকে জীবনীসাহিত্য বা জীবনচরিতের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব একটি বিশিষ্ট নাম। সাধারণ ভক্তসমাজ তাঁকে রাধা-কৃষ্ণের যুগলতনু ভাবতেন। এই চৈতন্যদেবের লোকোত্তর জীবনের মহিমা নিয়ে রচিত হয়েছিল পুণ্যজীবনচরিত। বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটি ছিল একেবারেই অভিনব। ডঃ সুকুমার সেন এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন - "প্রাদেশিক সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিয়া বাংলা সাহিত্যে আধুনিক চিন্তাধারার সূত্রপাত করিল চৈতন্যমঙ্গল কাব্যগুলি। ইহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যের বিষয় ছিল মামুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকা, দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কাহিনী, বড় জোর রাধাকৃষ্ণ লীলা-পদাবলী। ..... চৈতন্য জীবনী রচনার পূর্বে সমসাময়িক ইতিহাসের কথা দূরে থাক, অতীত ইতিহাসের কোন পাত্রকে সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান করা হয় নাই।"

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে জীবনীসাহিত্য রচনার প্রচলন ছিল। যেমন সংস্কৃত সাহিত্যে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত',বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহ', কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনী' ইত্যাদি। তবে এগুলির কোনটিকেই আদর্শ জীবনচরিত বলা সঙ্গত হবে না। বস্তুতঃপক্ষে এই জীবনচরিতগুলি রচয়িতাগণের পৃষ্ঠপোষক রাজার অকারণস্তুতি বা প্রশংসা ও অতিরঞ্জিত ঘটনায় পরিপূর্ণ। কোন কোন সাহিত্যের ঐতিহাসিকের মতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে গোরক্ষনাথ, গোপীচাঁদ, ময়নামতী প্রভৃতি চরিত্রকেন্দ্রিক বাংলা জীবনীসাহিত্যের প্রচলন এদেশে ছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে যেমন মত-বিরোধ আছে, তেমনি তাঁদের নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলি আদৌ জীবনী-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত কিনা সে-বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

সূচনায় চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়। এর মধ্যে চৈতন্য অনুচর

মুরারি গুপ্তের শ্রীশ্রীকৃষ্ণচেতন্য- চরিতামৃত, পরমানন্দ সেনের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত জীবনীগ্রন্থগুলির বিশেষত্ব এই যে, সেগুলিতে শ্রীচৈতন্যদেবকে ঈশ্বরের অবতাররূপেই গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য বাংলায় রচিত জীবনীগ্রন্থগুলিও অনুরূপ ভাবনারই প্রকাশক। এই সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের অভিমত হল, যেহেতু বৈষ্ণব-ভক্তের কাছে শ্রীচৈতন্যের জীবনলীলা আসলে কৃষ্ণের লীলা অথবা তাঁর জীবন কেবল রাধাভাবের সাধনার দিব্য দৃষ্টান্ত, তাই একটি ধর্ম- ভাবের দৃষ্টিতেই মধ্যযুগের জীবনীকারগণ চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁদের গ্রন্থগুলি আসলে চরিতামৃত - মহাপ্রভুর অলৌকিকলীলার আস্বাদনমাত্র, - বাস্তবধর্মী জীবনচরিত নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটির আলোচনাকালে প্রসিদ্ধ সমালোচক ডঃসুশীল কুমার দে যে মন্তব্য করেছেন, তা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য - 'It should, however , remembered that it is not a carita, but a caritamrita, written more from the devotional than from historical point of view'. আসলে মধ্যযুগীয় জীবনবৃত্তে নিরবচ্ছিন্ন দৈববাদের প্রভাবে লেখক-কবিদের মধ্যে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠা,যুক্তিবাদ, বাস্তব তথ্যঘনিষ্ঠতা ইত্যাদির একান্ত অভাব ছিল। সেকারণেই ঐ জীবনীগ্রন্থগুলিতে সমকালীন ইতিহাসের পটভূমিকায় ব্যক্তি-চৈতন্যদেবের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন, সে সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ মূল্যায়নের চেষ্টা লক্ষিত হবে না।

টিপ্পনী

চৈতন্যভাগবত ঃ বৃন্দাবন দাস।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থই বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম চৈতন্যচরিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি সম্ভবতঃ ১৫৪৬-১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। 'চৈতন্যভাগবত'-এর প্রথমে নাম দেওয়া হয়েছিল 'চৈতনমঙ্গল'। সম্ভবতঃ মঙ্গল কাব্যের 'মঙ্গল' শব্দটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই গ্রন্থটির এইরূপ নামকরণ হয়েছিল। পরবর্তীকালে কবির মাতা নারয়ণীদেবী এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নির্দেশে এর নামকরণ হয় 'চৈতন্যভাগবত'।

'চৈতন্যভাগবত' তিনটি ভাগে বিভক্ত - আদি খন্ড, মধ্য খন্ড, এবং অন্ত্য খন্ড। পনেরটি অধ্যায় সমন্বিত আদিখন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে চৈতন্যের জন্ম থেকে গয়াগমন ও নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনা। সাতাশটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ রয়েছে গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নানান ঘটনা ও সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত জীবনলীলা এবং অন্ত্যখন্ডের দশটি অধ্যায় জুড়ে আছে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচল গমন এবং সেখানকার উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা। গ্রন্থটির সমাপ্তি আকস্মিক এবং অসম্পূর্ণ বলে অনেকের ধারণা।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর চৈতন্যভাগবত রচিত হয় বলে বৃন্দাবন দাস এই গ্রন্থটি রচনার তথ্য ও উপাদান প্রধানতঃ চৈতন্যসহচর নিত্যানন্দের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। মুরারি গুপ্তের 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ দ্বারাও বৃন্দাবন দাস প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ঐ গ্রন্থের প্রকরণ অনুযায়ী তাঁর গ্রন্থের ঘটনা-স্তর সজ্জিত হয়েছে। একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেননি - সমকালীন যুগের সর্বত্রসঞ্চারী অধ্যাত্মপ্রভাবে প্রভাবিত কবি অন্য ভক্ত বৈষ্ণবের মতই এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন যে, মহাপ্রভু জীব-উদ্ধারের জন্যই বিষ্ণুর অবতার রূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। সে কারনেই তিনি ভাগবতের কৃষ্ণলীলার সাদৃশ্যেই চৈতন্যলীলা বর্ণনায় উৎসাহী হয়েছেন। ফলে স্বভাবিক কারণেই মহাপ্রভুর বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তিনি নানা অবতার-ভাব লক্ষ্য করে সেগুলির অলৌকিক

বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন - অশুচি স্থানে বসিয়া কথা বলার সময় বিশ্বম্ভরের দত্তাত্রেয় ভাব, উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণভাব, সাপের উপর শয়ন করিয়া অনন্তলীলা এবং পিতৃবিয়োগের ক্রন্দনের সময় রামভাব দেখাইয়া কবি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, শ্রীচৈতন্যে সকল অবতার বর্তমান। বিশেষ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ। অধুনিক জীবনীসাহিত্যের আদর্শে 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ বিচার করতে গেলে 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটিকে বাস্তবধর্মী জীবনীসাহিত্য কখোনই বলা যাবে না। আধুনিক জীবনীসাহিত্য মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সেই জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ঘটনা-চরিত্র ইত্যাদির তথ্যমূলক উপস্থাপন। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে নররূপী চৈতন্যের ভূমিকা একান্তই গৌণ।

টিপ্পনী

তবুও এরই মধ্যে বৃন্দাবন দাস যে সীমিত ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের মানবজীবন অংশকে তুলে ধরার সুযাগ পেয়েছেন, সেই সমস্ত অংশে সাধারণ পাঠক এই গ্রন্থ থেকে মানুষ শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মের আস্বাদন অনুভব করেন। শিশু নিমাইয়ের শৈশব চিত্র, তাঁর শিশুসুলভ দৌরাত্ম্য, কৈশোরকালে নিমাইয়ের বয়সোচিত পান্ডিত্য-অহংকার, সংসার আশ্রম ত্যাগ করার প্রাক্কালে চৈতন্যদেবের মাতৃসম্ভাষণ ইত্যাদি টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্যে মানব জীবনরসের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে - মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এগুলি বিরল উদাহরণ হিসেবেই বিবেচিত হবে।

বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ হিসাবে তৎকালের রাষ্ট্র-সমাজ ও বাস্তব জীবনের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার মধ্যে ইতিহাসের তথ্য ও সত্য অসাধারণ বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। নবদ্বীপ সেই সময়ে ছিল নব্য ন্যায়চর্চার পীঠস্থান। কিন্তু সামগ্রিকভাবে জনজীবন ছিল নৈতিক আর্দশভ্রষ্ট, প্রেম-ভক্তি ধর্মে উদাসীন আর ধর্মীয় জীবন স্থূল ক্রিয়াচার ও তান্ত্রিক কৃত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত - এক কথায় সাধারণ মানুষের অধ্যাত্ম জীবন হয়ে পড়েছিল কলুষিত; বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় সমাজজীবনের সেই চিত্র -

ধর্মকর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচন্ডীর গীত করে জাগরণে।.....
বাসলী পূজয়ে কেহ নানা উপাচারে ।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।।

অনাচারের এই পঙ্ককুন্ড থেকে সমাজকে উদ্ধার করার জন্যই মর্ত্যভূমিতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব - এই বদ্ধমূল বিশ্বাস থেকেই বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

চৈতন্যমঙ্গল ঃ লোচনদাস

চৈতন্যমঙ্গল হল কবি লোচন দাস রচিত চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ। লোচনদাস ছিলেন বৃন্দাবন দাস-পরবর্তী-কবি। কবির উল্লেখেই এই তথ্য পাওয়া য়ায় -

'শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে।
জগৎ মোহিত যার ভাগবত গীতে।।'

লোচনদাসের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের বিচারে ১৫৬০-১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লোচনদাস তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে কবি উল্লেখ করেছেন

যে তাঁর গ্রন্থরচনার পেছনে রয়েছে মুরারী গুপ্তের কড়চার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা। এছাড়াও কবি তাঁর গ্রন্থের ঘটনা, কাহিনী ও চারিত্রিক উপাদানের জন্য মহাভারত, জৈমিনি ভারত, ব্রহ্মসংহিতা ও বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণের দ্বারস্থ হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের 'নদীয়া নাগর' ভাবের প্রবর্তক নরহরি দাসের শিষ্য লোচনদাস তাঁর গ্রন্থে সেই নাগরভাবেরই বর্ণনা করেছেন।

লোচনদাস তাঁর গ্রন্থে বিস্তারিতভাবেই আত্মপরিচয় প্রদান করেছেন। সেই আত্মপরিচয় অংশেই তাঁর গ্রন্থ সর্ম্পকে বলেছেন-

'চারি খন্ড কথা তায় করিল প্রকাশ।
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস।।'

টিপ্পনী

কবি উল্লিখিত 'চৈতন্যমঙ্গল' – এর চারটি খন্ড হল – সূত্রখন্ড, আদিখন্ড, মধ্যখন্ড, এবং শেষখন্ড। কাব্যটি মোট এগার হাজার ছত্রে রচিত। কাব্যটি সম্ভবতঃ গীত আকারে পরিবেশিত হত – গ্রন্থের সর্বত্র বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উল্লেখ থেকে এই অনুমান করা হয়। লোচনদাস তাঁর কাব্যের গঠন পরিকল্পনাটি মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে করেছেন। তাঁর কাব্যের সূত্রখন্ডটি মঙ্গল কাব্যের দেবখন্ডের অনুরূপ। আদিখন্ডে চৈতন্যের জন্ম থেকে বড় হয়ে ওঠা, গয়া গমন ও গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মধ্যখন্ডে শ্রীচৈতন্যের নদীয়া ও উৎকললীলা স্থান পেয়েছে। শেষ খন্ডে চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারতগমন, রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ, পুরী প্রত্যাবর্তন, গৌড়ে পুনরাগমন ও পুনরায় নীলাচল যাত্রা এবং সবশেষে মহাপ্রভুর তিরোধানের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।লোচনদাসের কাব্যে গৌরাঙ্গের নাগরভাবের উল্লেখ থাকার কারণে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবভক্তগণ কাব্যটির প্রতি ততখানি আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এখানে কাব্যগ্রন্থটির সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। লোচন দাস চৈতন্য অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে জীব উদ্ধার ও রাধা কৃষ্ণের যুগলতনু রূপে আবির্ভাবের তত্ত্ব-দুটির কথা বলেছেন। কিন্তু 'জীব-উদ্ধারণ' বিষয়টিকে তিনি গৌণ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে –

'রাধাভাবে অন্তরে রাধা বর্ণ বাহিরে
অন্তর্বাহ্য রাধময় হব।' – লোচনদাসের মতে এই উদ্দেশ্যেই কলিযুগে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব সংঘটিত হয়েছিল। লোচনদাস যথার্থ জীবনীকারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর কাব্য রচনা করেননি, তিনি নিষ্ঠাবান কবি-দৃষ্টিতেই তাঁর কাব্য পরিকল্পনা করেছিলেন। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর ভাষায় – "জীবনী কাব্যকার হিসাবে লোচন ব্যর্থ, কিন্তু ধর্মস্পর্শী গল্পরসিক হিসেবে সমুল্লেখ্য।"

<u>জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল</u> ঃ

জয়ানন্দের চৈতন্যজীবনী কাব্যের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থটি সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নগেন্দ্রনাথ বসুর সৌজন্যে। এরপর ১৩১২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদ থেকে কালিদাস নাথ মহাশয়ের সম্পাদনায় জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রকাশিত হয়। তাঁর জন্ম বর্ধমানের আমাইপুর গ্রাম, পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতা রোদনী। কবির আত্মপরিচয় থেকে এ কথাও জানা যায় যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে গৌড়ে প্রত্যাবর্তনের পথে সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর এক বৎসর বয়সের পুত্রের নামকরণ করেন জয়ানন্দ। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যটির সঠিক রচনাকাল নিয়ে যথেষ্ট মতবিভেদ আছে। তবে বিভিন্ন দিক বিচার করে অধিকাংশ সাহিত্যের

ঐতিহাসিক গ্রন্থটির রচনাকাল ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়কালকে নির্দেশ করেছেন।

নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবভক্তগণের কাছে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' সাদরে গৃহীত হয়নি – একারণেই তাঁর রচিত পুঁথির প্রাপ্তি সংখ্যা খুব অল্পই। জয়ানন্দের কাব্য ৯টি খন্ড বা পালায় বিভক্ত। এর গঠন ভঙ্গিমার মধ্যে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব আছে। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রধানতঃ গেয় কাব্য – গীত আকারে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু আসরে পরিবেশিত হত।

টিপ্পনী

জয়ানন্দ তাঁর কাব্যের প্রথম খন্ডে শিব, গণেশ, জগন্নাথ, থেকে শুরু করে ব্যাস, বাল্মীকি, নানা দেব-দেবী এবং অবতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল কবি তাঁর কাব্যে শাক্তদেবী আদ্যাশক্তিরও উল্লেখ করেছেন – যা বৈষ্ণবীয় সংস্কারের বিরোধী। বৈরাগ্য খন্ডের মূল প্রতিপদ্য বিষয় হল চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়াস। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থে কবি ধ্রুব আখ্যানটিকেও দীর্ঘাকারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বৈরাগ্যখন্ডের অভিনবত্ব হল এখানে কবি মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে 'বিষ্ণুপ্রিয়ার বারোমাস্যা' বর্ণনা করেছেন – যা অন্যান্য চৈতন্যচরিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। চরিতকাব্যটির সন্ন্যাস খন্ডের বিষয়বস্তু হল কেশবভারতীর নিকট গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ এবং কাটোয়া থেকে শান্তিপুরের আগমনের ঘটনাসংবলিত কাহিনী। উৎকল খন্ডে শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে উপস্থিত হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং প্রকাশ খন্ড, তীর্থ খন্ডে ইন্দ্রদ্যুম্নরাজার কন্যা সত্যবতীর বিবাহের আখ্যানের বিস্তৃত পরিচয় আছে। উত্তর খন্ডের কাহিনী মূলতঃ পৌরাণিক আখ্যাননির্ভর। জয়ানন্দের কাব্যের এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে যা পুরোপুরি কাল্পনিক, তথাপি কবি তৎকালীন সমাজজীবনের এমন অনেক চিত্র এঁকেছেন যেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। এছাড়া জয়ানন্দ এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের লোকান্তরের স্বাভাবিক ঘটনা বিবৃত করেছেন, অন্যান্য চরিতকারের মত অলৌকিকতার আশ্রয় নেননি – বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য কবি অবশ্যই প্রশংসা দাবী করতে পারেন।

<u>কৃষ্ণদাস কবিরাজ</u> ঃ
<u>শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত</u>

মধ্যযুগীয় কালপরিসরে রচিত সমূহ চৈতন্যজীবনচরিত গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, পন্ডিত, মনীষী, দার্শনিক, রসশাস্ত্রজ্ঞ, এবং একজন কবিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। চৈতন্যজীবনের তথ্যমূলক বা ব্যক্তিজীবনকেন্দ্রিক বস্তুধর্মী ঘটনা বর্ণনা করার অভিলাষ কৃষ্ণদাস কবিরাজের ছিলনা, "তিনি প্রচলিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি না করিয়া চৈতন্যজীবনাদর্শ, ভক্তিবাদ, দ্বৈতবাদী দার্শনিক চিন্তার গৌড়ীয় ভাষ্য এবং বৈষ্ণব মতাদর্শকে সংহত, দূরাভিসারী ও মননিষ্ঠ আকার দিয়া বাঙালী-মনীষার এক উজ্জ্বলতম স্মারক চরিত্র হইয়া আছেন।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খন্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ নৈহাটি গ্রামের সন্নিকটে ঝামটপুরে তাঁর জন্ম। আর্থিক দুরবস্থার কারণে কবিকে একদা অন্যের বাড়ীতে পূজারী ব্রাহ্মণের কার্যে নিযুক্ত হতে হয়েছিল। কবির নিজ গৃহে পূজানুষ্ঠান, নামকীর্তন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হত। কোন একটি ঘটনায় বিচলিতচিত্ত কৃষ্ণদাস এক রাত্রে স্বপ্নে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নির্দেশ

লাভ করে বৃন্দাবন গমন করেন এবং সেখানে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ মনীষীর আশীর্বাদ ও কৃপা লাভ করেন এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও দর্শন সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম ও গ্রন্থ রচনার কাল সম্পর্কে মতানৈক্যের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এ-সম্বন্ধে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার যে সমস্ত সন-তারিখের উল্লেখ করেছেন, সেগুলির নির্ভরযোগ্যতা নেই বললেই চলে।

টিপ্পনী

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণের শেষে গ্রন্থসমাপ্তিসূচক একটি শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে -

শকে সিন্ধ্যাগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠ বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেহহ্নসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ।।

'প্রেম বিলাস' গ্রন্থে পূর্বোল্লিখিত শ্লোকটির একটু ভিন্ন পাঠ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে শ্লোকটির বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে -

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন।
পনর শত তিন শকাব্দে যখন।।
জ্যৈষ্ঠ মাসের রবিবার কৃষ্ণা পঞ্চমীতে।
পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।।"

এই সমস্ত উল্লেখ ছাড়াও পন্ডিত-গবেষক ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বহু ঐতিহাসিক তথ্য, জ্যোতিষিক গণনা, গাণিতিক বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত পরস্পরবিরোধী মতামত সবকিছুকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করে বলেছেন যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থটি ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে রচিত হতে আরম্ভ করে - কোনক্রমেই গ্রন্থটি এর পূর্ববর্তী সময়ের রচনা নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন তখন বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' বৈষ্ণব ভক্ত-সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়কালে 'অতিবৃদ্ধ-জরাতুর' কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চৈতন্যজীবনকেন্দ্রিক একটি গ্রন্থ রচনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। গ্রন্থমধ্যে কবি বারবার নিজের অতিবার্ধক্য ও অশক্ত অবস্থার কথাও উল্লেখ করেছেন -

'আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।.....
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণ ধন।।'

শারীরিক অক্ষমতা, মৃত্যুভয় ইত্যাদি কারণে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থ-পরিকল্পনায় স্থির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি বৃন্দাবন দাস উল্লেখিত চৈতন্যজীবন-সংক্রান্ত কাহিনী অতিসংক্ষেপে বা সূত্রাকারে বর্ণনা করবেন এবং বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ পর্যায়ের যে তত্ত্বমূলক দিকগুলি সবিস্তারে আলোচনা করেননি সেই অন্ত্যপর্বকেই অধিকতর প্রাধান্য দেবেন।
পূর্বসূরী কবি বৃন্দাবন দাসের প্রতি কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। বৃন্দাবন দাসের মত কবি চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ রচনা করা সত্ত্বেও তিনি যে একই কাজে অগ্রসর হচ্ছেন এ নিয়ে তাঁর

সংকোচও ছিল যথেষ্ট। যাইহোক, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রন্থমধ্যে বৃন্দাবন দাসকে বৈষ্ণবীয় বিনয়সহকারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে মন্তব্য করেছেন –

'কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।।'

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি তিনটি খন্ড বা লীলায় বিভক্ত – আদি লীলা, মধ্য লীলা এবং অন্ত্য লীলা।

টিপ্পনী

এই গ্রন্থের আদি লীলায় রয়েছে সতেরটি পরিচ্ছেদ – শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রারম্ভিক তেইশ বছরের জীবনলীলা এখানে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর ব্যক্তিজীবনের বিস্তারিত ঘটনা ধারার বস্তুতান্ত্রিক বর্ণনা প্রদান না করে বৈষ্ণবীয় দর্শন, চৈতন্য অবতারের গূঢ়ার্থ, রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব, রাগানুগা বৈষ্ণবীয় দর্শনের স্বরূপ, প্রেমধর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপিত করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে জীবউদ্ধার চৈতন্য-অবতারের একটি অন্যতম কারণ হলেও রাধাকৃষ্ণযুগলতনুরূপে চৈতন্যের আত্মপ্রকাশের বিষয়টিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই আদিলীলা অংশেই কবি তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা মোট পঁচিশটি পরিচ্ছেদ নিয়ে গঠিত। এই অংশে চৈতন্যজীবনের একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা সন্ন্যাসগ্রহণের কথা বিবৃত হয়েছে। এছাড়া মহাপ্রভুর রাঢ় দেশ ভ্রমণ, নীলাচল গমন, দক্ষিন ভারত যাত্রা, রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের নিগূঢ় আলোচনা, পুনরায় নীলাচল গমন, এবং আরও কিছু ঘটনা মধ্যলীলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের সাধ্য-সাধনসম্পর্কিত আলোচনা-অংশটি কৃষ্ণদাস অপূর্ব কাব্যরসমন্ডিত করে উপস্থাপিত করেছেন। মধুর রসের মাধুর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই অংশে কবি লিখেছেন –

হলাদিনী সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।।
প্রেমের পরম রস মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধ ঠাকুরানী।।

এই গ্রন্থের অন্ত্য লীলায় রয়েছে কুড়িটি পরিচ্ছেদ। মহাপ্রভুর জীবনের শেষ বারো বছরের দিব্যোন্মাদ অবস্থার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দান করার বাপারে কৃষ্ণদাস কবিরাজ অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এই অংশে কবি প্রথম তেরোটি পরিচ্ছেদে চৈতন্য-জীবনের কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তী সাতটি পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের ভাষায় – ''চরিতামৃতের অন্ত্য লীলা রসিকজনের চিত্তহারী, কবিগণের কল্পলোক ও সাধক-ভক্তের কন্ঠহার।''

কবি বারংবার তাঁর জরাগ্রস্ত অবস্থা, 'পঞ্চরোগ পীড়ার' প্রকোপে, মন ও বুদ্ধির জড়ত্ব ইত্যাদিকে তাঁর গ্রন্থ রচনার অন্তরায় বলে বর্ণনা করলেও, কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে প্রজ্ঞা, মননশীলতা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, স্বধর্মনিষ্ঠা, জীবনরসবোধ ও কবিত্বের অফুরন্ত সত্যদৃষ্টি নিয়ে তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তা শুধু মধ্যযুগের নয়, আধুনিক যুগেরও একটি আকর-গ্রন্থ রূপে স্বীকৃতি পাবে।

মধ্যযুগে আরও দু-একজন কবি চৈতন্যদেবের পবিত্র জীবনকথা নিয়ে চরিতগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু ঘটনার যথার্থ,কবিত্বশক্তি, গ্রন্থপরিকল্পনার দুর্বলতা ইত্যাদির কারণে সেগুলি যেমন জনপ্রিয়তা পায়নি,তেমনি বৈষ্ণব সমাজেও সেরকম সমাদৃত হয়নি। তবুও এদের মধ্যে দুটি গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য - একটি হল 'গোবিন্দ দাসের কড়চা' অপরটি হল চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়।'

টিপ্পনী

পূর্ব আলোচনার সংক্ষিপ্তায়ন

প্রথম একক

(ক) চর্যাপদ

প্রাচীন বাংলা ভাষার আদিতম সাহিত্যিক নিদর্শন হল চর্যাপদ। চর্যাপদ আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা বিরাট বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। চর্যাপদাবলীর রচনাকারেরা ছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্য। তাঁরা তাঁদের গুহ্য সাধনতত্ত্ব সন্ধ্যাভাষার প্রহেলিকামন্ডিত ব্যঞ্জনায় দীক্ষিতজনের নিকট এই পদগুলির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। সাধকগণের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সাধনা দ্বারা দুর্লভ মহাসুখ লাভ। চর্যার সাধকগণ মনে করতেন দেহভান্ডেই ব্রহ্মান্ডের অবস্থান। তাঁদের ধর্মীয় ক্রিয়াচার হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল।

চর্যাপদ আবিষ্কৃত হলে হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষার পক্ষ থেকে চর্যার ভাষাকে নিজ নিজ ভাষার আদিরূপ বলে দাবী করা হয়, কিন্তু ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ODBL গ্রন্থে চর্যার ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ বিচার করে সিদ্ধান্ত করেন যে, চর্যায় ব্যবহৃত ভাষা নিশ্চিতভাবে প্রাচীন বাংলার নিদর্শন।

চর্যাপদ সম্প্রদায়বিশেষের সাধন-সঙ্গীত হলেও চর্যার রচয়িতাগণ হলেন কবিস্বভাববিশিষ্ট। ফলে সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব এগুলিতে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও চর্যার সাহিত্যিক মূল্যকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

শুধু সাহিত্য হিসেবে নয়, চর্যার গানে তৎকালীন সমাজের নানা বিষয় যেমন অর্থনীতি, সামাজিক রীতি-নীতি, ক্রিয়াচার, বৃত্তি বা পেশাপরিচয়, নরনারীর প্রেমচিত্র, পারিবারিক জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ইতিহাসের সত্যতা নিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তৎকালীন সমাজে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্গীয়দের সামাজিক অবস্থানের স্বরূপ, অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনযাত্রা কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাসন-ব্যবস্থা ইত্যাদির উল্লেখে চর্যার সমকালীন একটি ঐতিহাসিক পরিমন্ডলও এগুলিতে পরিলক্ষিত হবে।

চর্যাপদের পর প্রায় দু'শ বছরের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে আদি-মধ্যযুগে রচিত হয়েছিল বড়ুচন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি। এটি একটি নাট্যধর্মী গীতিলক্ষণযুক্ত আখ্যাননির্ভর রচনা। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত রাধাকৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ আখ্যানধর্মী কাব্য বৈষ্ণব সাহিত্যে একান্তই বিরল। সুতরাং আঙ্গিকগত বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অবশ্যই অভিনবত্ব দাবী করতে পারে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রাধাকৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত কাব্য। কাব্যটির মধ্যে বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণ ও সংস্কৃত গ্রন্থের প্রভাব আছে। তৎসত্ত্বেও কাব্যটি শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্যমূলক বা আধ্যাত্মিকতত্ত্বমন্ডিত

রচনা হয়ে ওঠেনি। বড়ু চন্ডীদাস মূলতঃ গ্রামীণ সমাজের স্বল্প শিক্ষিত মানুষদের জন্য কাব্যটি রচনা করেছিলেন এবং তা করতে গিয়ে কবি লৌকিক সমাজে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকথার যে মূল কাহিনী প্রচলিত ছিল, সেই কাহিনীকে প্রাধান্য দিয়ে একটি আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করেছেন।

এই কাব্যের প্রধান তিনটি চরিত্র হল কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়ায়ি। এই তিনটি চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নাট্যশিল্পের মতই এখানকার কাহিনী পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। কাব্যটির মধ্যে একাধারে আখ্যানকাব্য, নাট্যশিল্প ও গীতিকবিতার লক্ষণ সহাবস্থান করছে। অনেকে তিনটি চরিত্রের দ্বারা অভিনেয় সংস্কৃত নাটক বীথির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আঙ্গিকের তুলনা করেন। কেউ একে 'ঝুমুর গান' কিংবা 'জাগের গানের' নিকটবর্তী শিল্প বলেন উল্লেখ করেছেন।

টিপ্পনী

চরিত্রচিত্রণে বড়ু চন্ডীদাস মিশ্র সাফল্য অর্জন করেছেন। কৃষ্ণবিমুখী শ্রীরাধার কৃষ্ণমুখী হয়ে ওঠার বিষয়টি কবি এখানে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শন করেছেন। বড়ায়ির মত কুটনী জাতীয় Type চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়েও বড়ু চন্ডীদাস তার মধ্যে মানবিক গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। সেদিক থেকে কবির কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রচিত্রণে কবি এই পৌরাণিক চরিত্রটির প্রতি মোটেই সুবিচার করেন নি। কবির হাতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশী মহিমা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাব্যে কামরসপিপাসু, গ্রাম্য-'গমার' যুবক। সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত চরিত্রটি অপরিবর্তনীয় - শিল্পের পক্ষে এই জাতীয় চরিত্র আকাঙ্ক্ষিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত অর্থেই একটি Flat character.

(খ) মালাধর বসু

মধ্যযুগের একটি বিশেষ সাহিত্যধারা হল অনুবাদ সাহিত্য। যুগের নিজস্ব প্রয়োজনে অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্ট হয়। বাংলাদেশের এক বিশেষ রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক পরিস্থিতিতে ভারতীয় অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটানোর জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদকার্য শুরু হয়েছিল।

মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যাবে যে, রামায়ণ ও মহাভারতের তুলনায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদ কর্মে প্রথম শ্রেণীর কবিগণ উৎসাহ অনুভব করেন নি। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ ভাগবত হল মূলতঃ আধ্যাত্মিক তত্ত্বপ্রধান গ্রন্থ। তত্ত্ব কথার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বা আকর্ষণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় থাকে না। গল্প বা কাহিনী সাধারণ মানুষকে অধিকতর আকর্ষণ করে। সেজন্য কাহিনী মুখ্য রামায়ণ - মহাভারত গ্রন্থ খুব সহজেই সাধারণ মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল।

মালাধর বসু দেশের সাধারণ মানুষের মন বুঝতে পেরেছিলেন বলেই ভাগবতের যে অংশে কাহিনীর একটি ক্ষীণধারা আছে, সেই দশম ও একাদশ স্কন্ধকেই তিনি অনুবাদ করার জন্য নির্বাচন করেছিলেন।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' তাই সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ নয়, অংশবিশেষের অনুবাদমাত্র।

মালাধর বসুর গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের প্রকাশ ঘটেছে – তাঁর ঐশীশক্তির মাহাত্ম্যই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। চৈতন্যপূর্বযুগের কৃষ্ণলীলানির্ভর গ্রন্থের উদাহরণ হিসেবে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' –এর একটি পৃথক গুরুত্ব রয়েছে।

কবি কৃত্তিবাস ওঝা

কবি কৃত্তিবাস বাঙালির হৃদয়ের কবি। দরিদ্রের পর্ণকুটীর থেকে অভিজাতের অন্তঃপুর পর্যন্ত কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ পাঁচালী'র অবাধ বিচরণ। আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণগ্রন্থ অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদের দিকে ঝোঁকেননি, প্রয়োজনে কাহিনীর গ্রহণ–বর্জন করেছেন – আবার নিজেও ঘটনার স্রষ্টা হয়ে উঠেছেন।

টিপ্পনী

আর্য রামায়ণ কৃত্তিবাসের হাতে বাঙালীজীবন ও বাংলার সমাজের কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত – এঁরা বাঙালি পরিবারের এক একটি আদর্শ বা প্রতীক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয় – এই চিরন্তন সত্যটিও তাঁর গ্রন্থে বারংবার পরিস্ফুটিত হয়েছে।

মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় যত পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রাপ্ত পুঁথি সংখ্যা সর্বাধিক। অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ও অসংখ্য পুঁথি নকলের ফলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালীর ঘটনার যেমন বিকৃতি ঘটেছে, তেমনি ভাষারও পরিবর্তন ঘটেছে ব্যাপক ভাবে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে মহাকাব্যিক বিশালতা নেই, চরিত্রগুলিও সব ক্ষেত্রে আর্য রামায়ণের মত গভীরবিস্তারী নয়, ভাষার গাম্ভীর্যও কাব্যের আদ্যন্ত লক্ষিত হবে না, তথাপি এই গ্রন্থটি নানান কারণে কালজয়ী সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে।

কাশীরাম দাস

মহাভারত অনুবাদক হিসেবে কাশীরাম দাসের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তাঁর অনূদিত গ্রন্থটিও বাঙালীর চিত্তহরণ করেছিল। কাশীরাম দাসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, তিনি মহাভারতের মত অজস্র ঘটনা ও কাহিনীসংবলিত বিশাল মহাকাব্যকে নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সহজ–সরল রীতিতে সর্বজনের বোধগম্য করে অনুবাদ করেছিলেন। কাশীরাম দাস মূল কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ না করে মূলের ভাবটি বজায় রেখে স্বাধীন অনুবাদ কর্মে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

কাশীরাম দাসের মহাভারত 'কাশীদাসী মহাভারত' হিসেবেই সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করেছিল। কবির কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্র চিত্রণ, কবিত্ব, ভাষাশৈলী এবং সমকালীন যুগমানসের উপযোগী কাব্য–পরিকল্পনা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

(গ) চৈতন্যজীবনী–গ্রন্থ

মধ্যযুগীয় সমাজ–প্রেক্ষাপটে রচিত চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে আঙ্গিকগত দিক থেকে অভিনবত্বের সূচনা করেছিল। মর্ত্য–মানুষের জীবনী রচনার প্রয়াস বাংলা

সাহিত্যে এর পূর্বে আর দৃষ্ট হয় না। তবে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি আদর্শ জীবনীগ্রন্থের মত বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখিত হয়নি - ভক্তি-কবিগণ বিস্ময়বিমুগ্ধ-দৃষ্টিতে এই মর্ত্য মানুষটির উপর যুগাবতারের গৌরব আরোপ করে জীবনীগ্রন্থের নামে যেন দেব-তর্পণ করেছেন। 'ভূভারহরণ' এবং রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপে আবির্ভূত হয়ে অপার্থিব প্রেমলীলা উদ্‌যাপন — এই দ্বৈত উদ্দেশ্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন; অধিকাংশ ভক্ত-বৈষ্ণব এই তত্ত্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

টিপ্পনী

চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলি প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বৃন্দাবন দাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ ভক্ত-বৈষ্ণব স্বতোদ্যোগী হয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের অলোকসামান্য চরিত্রের পরিচয় প্রদান, তাঁর প্রেম-ভক্তি প্রচার ও অপূর্ব লীলাময় জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ রচনা করেন।

চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পান্ডিত্য, কবিত্ব, বিশ্লেষণ-গভীরতা ও বিষয়বস্তুগত ব্যাপ্তির দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে উন্নীত হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে চৈতন্যদেবের ব্যক্তি-জীবনের দিকটি যতখানি প্রসারিত, সেই তুলনায় চৈতন্যদেবের জীবনের শেষ পর্যায়ের লীলাত্মক ঘটনাবলী যথেষ্ট হ্রস্ব। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই অতিবৃদ্ধ বয়সে তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস - উল্লিখিত ঘটনাবলী যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করে মহাপ্রভুর শেষ জীবনের আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক ঘটনাসমূহকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থখানি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এছাড়া লোচনদাস ও জয়ানন্দ ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তবে একথা সত্যি যে, চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিজীবনের বস্তুধর্মী জীবনীগ্রন্থ হয়ে ওঠেনি, এগুলিকে মন্তজীবনী বা 'haiography' বলে উল্লেখ করাটাই যুক্তিযুক্ত হবে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. কে কোন্ সময়ে, কোথা থেকে চর্যাপদের পুঁথি সংগ্রহ করেন? চর্যার নামকরণ বিষয়ে আপনার মতামত দিন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। এই প্রসঙ্গে চর্যার সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে আপনার ধারণা লিপিবদ্ধ করুন।

২. চর্যাগীতিকা সাধন - সঙ্গীত হলেও এর কাব্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না - আলোচনা করুন।

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কার ও নামকরণ বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করুন এবং এই প্রসঙ্গে কাব্যটির শিল্পরূপ আলোচনা করুন।

৪. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের গুরুত্ব নিরূপণ করুন। এটি কোন্ শ্রেণীর কাব্য? কাব্যটির মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলা কথা যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তার পরিচয় দিন।

৫. মালাধর বসুর কাব্যের নাম কি? এর রচনাকাল উল্লেখ করুন। অনুবাদ কাব্য হিসেবে গ্রন্থটির মূল্যায়ন করুন।

৬. কাশীরাম দাসের মহাভারত গ্রন্থের পরিকল্পনা ও কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৭. কৃত্তিবাসের অনূদিত গ্রন্থটির নাম কি? বাঙালী সমাজে গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

৮. চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলিকে আদর্শ জীবনচরিত হিসেবে গণ্য করা যায় কিনা বলুন।

৯. চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের রচয়িতা কে? গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও শিল্পগুণ বিচার করুন।

১০. শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনচরিত কোন্‌টি? গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন।

টিপ্পনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. চর্যার রচয়িতাগণ কারা? চর্যার ভাষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২. 'রাধাবিরহ' অংশকে অনেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে মনে করেন – আপনার মতামত দিন।

৩. ভাগবত অনুবাদ গ্রন্থ কেন জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি – কারণ উল্লেখ করুন।

৪. কৃত্তিবাসের রামায়ণকাব্যে বাঙালী ও বাংলাদেশের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?

৫. কাশীরাম দাসকে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কেন বলা হয় – তিনটি কারণ উল্লেখ করুন।

৬. লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক - বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)

বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্ব

মিশনারী সম্প্রদায় ও বাংলা গদ্যভাষা চর্চা

টিপ্পনী

একথা সর্বৈবভাবে সত্য যে, বাংলা ভাষার উদ্ভব পর্ব থেকে এদেশে মিশনারীদের আগমনের পূর্বকাল পর্যন্ত যাবতীয় বাংলা গ্রন্থ পদ্যবন্ধে রচিত হয়েছিল। কাহিনী, আখ্যান, জীবনী-গ্রন্থ, দার্শনিক গ্রন্থ, বহুবিধ অনুবাদগ্রন্থ সব কিছুর ভাষা-প্রকরণ ছিল পদ্য-নির্ভর । অথচ দৈনন্দিন জীবনে কাজ-চালানো ভাষা যে গদ্য-নির্ভর ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃপক্ষে যুগের সংস্কারবশতঃ গ্রন্থলেখকগণকে পদ্যকেই তাদের প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হয়েছিল। অথবা এও মনে করা যেতে পারে যে, সে যুগে পদ্য রচনায় অক্ষম কোন রচিয়িতাকে লেখক/কবি/গ্রন্থকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হত না। ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, এদেশে মূলতঃ ইউরোপীয় ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের আগমনের সময়কাল থেকে বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক গদ্য ভাষাচর্চার সূত্রপাত হয়। বাংলাদেশেও এর অন্যথা হয়নি। মূলতঃ বাণিজ্যিক কাজকর্ম পরিচালনা, স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবসায়িক কথাবার্তা চালানো, প্রশাসকের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিসম্পাদন এবং সেইসঙ্গে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পথকে সুগম করার জন্য মিশনারীদের উদ্যোগে বাংলা গদ্যভাষাচর্চার একটা প্রয়োজন ভিত্তিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

বিদেশী বণিকদের মধ্যে এদেশে প্রথম আগমন ঘটে পোর্তুগীজ বণিক এবং সেইসঙ্গে পোর্তুগীজ ধর্মযাজকদের। এই পর্তুগীজ ধর্মযাজক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজে যুক্ত হয়ে প্রথমেই জনসংযোগের ব্যাপারে ভাষাসমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এবং সেই সমস্যা দূরীকরণের জন্যই নিজেরা বহু অধ্যবসায়ে বাংলা ভাষাশিক্ষা করেছিল। মনে করা হয়, বাংলা ভাষা-শিক্ষার ফলস্বরূপ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট পোর্তুগীজ লেখক বাংলা ভাষায় গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। অবশ্য ওই সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা, আবার কখনও অভিধানধর্মী।

পোর্তুগীজ লেখকেরা যখন বাংলা গদ্যভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন বাংলা হরফ বা মুদ্রণ যন্ত্র তৈরি হয়নি। সে জন্য তাঁদের গ্রন্থগুলি রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। এ প্রসঙ্গে পোর্তুগীজ মিশনারী মনো-এল-দ্য-অস্ সুম্পসামের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। মনো-এলের একটি গ্রন্থের নাম হল 'কৃপার শাস্ত্রের 'অর্থভেদ' (১৭৩৩)- 'কৃপার শাস্ত্র' হল খ্রীষ্টধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচারমূলক গ্রন্থ। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হল পর্তুগীজ ভাষায় বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ - 'Vocabulario in Idioma Bengale Portuguez' (১৭৪৩)। দুটি গ্রন্থই পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। মনো-এল যেহেতু ঢাকা জেলার ভাওয়ালের গীর্জার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর গ্রন্থের ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় ভাষার প্রভাব সহজেই চোখে পড়বে। এছাড়া এখানে রয়েছে আরবী, ফার্সী, শব্দের বিস্তর প্রয়োগ। মনো-এল বাংলা সাধু গদ্যরীতি অনেকটা আয়ত্ত করতে পারলেও বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর প্রকাশনায় তিনি সাবলীলতার পরিচয় দিতে পারেননি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর ভাষায় সরল গদ্যরীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

দোম আন্তোনিও দে রোজারিও নামে আর একজন পোর্তুগীজ মিশনারী 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সম্বাদ' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন (১৭৪৩)। এটিও লিস্বন থেকে রোমান

হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। দোম আন্তোনিও ছিলেন বাঙালী হিন্দু পরিবারের সন্তান। শৈশবে পোর্তুগীজ দস্যুদের দ্বারা অপহৃত হওয়ার পর তাকে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি প্রবল অনুরক্ত এই লেখক তাঁর গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্মের অপার মহিমা যেমন ব্যক্ত করেছেন, তেমনি হিন্দুধর্মের অসারত্ব প্রমাণ করার জন্য নানা হাস্যকর বক্তব্য পেশ করেছেন।

মনো-এল বা দোম আন্তোনিও তাঁদের যে বক্তব্যই প্রচার করুন না কেন, বাংলা গদ্য ভাষার উদ্ভাবনা ক্ষেত্রে তাঁদের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। বাংলা গদ্যভাষা সম্পর্কে বাঙালীরা যখন উদাসীন, অসচেতন, তখন বিদেশী মিশনারীরা বাংলা গদ্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে গদ্য ভাষার বাস্তব কার্যকারিতা ও উপযোগিতার দিকটি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

টিপ্পনী

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পোর্তুগীজ মিশনারীদের উদ্যোগে বাংলা গদ্যভাষায় গ্রন্থ রচিত হলেও এর দীর্ঘকাল পূর্বেই দলিল, দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, বিভিন্ন চুক্তিপত্র, শাসন-সংক্রান্ত নির্দেশ, বাণিজ্যিক কাজকর্ম ইত্যাদিতে অল্পবিস্তর বাংলা ভাষার প্রচলন এদেশে ছিল। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ অহোমরাজকে যে পত্র লেখেন সেটিকে একটি অন্যতম প্রাচীন বাংলা গদ্যরীতির নির্দশন হিসাবে ধরা যেতে পারে। চিঠিটির ভাষায় তৎসম শব্দের বাহুল্যের সঙ্গে তৎকালীন বাংলা কথ্য ভাষারীতির একটা সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। চিঠিটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

"লেখনং কার্যঞ্চ। হেথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।"

এছাড়াও কড়চা জাতীয় বিভিন্ন নিবন্ধে, রামাঞির শূন্যপুরাণের বিশেষ অংশ, অষ্টাদশ শতকে রচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে খন্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে বাংলা গদ্যভাষার নির্দশন পাওয়া যায়।

শ্রীরামপুর মিশন ঃ

বাংলা গদ্যভাষাচর্চায় শ্রীরামপুর মিশনের অবদানও উল্লেখ করার মতো। উইলিয়াম কেরী, জন টমাস, উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারী বাংলা গদ্যভাষার প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষতঃ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র প্রস্তুত হওয়ার পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শ্রীরামপুর মিশন-প্রেসের উদ্যোগে বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। শুধু বাংলাভাষা নয়, আরবী, ফারসী, মারাঠি, ওড়িয়া, বর্মী প্রভৃতি ভাষাতেও এখান থেকে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮০০ - ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত, নিউ টেষ্টামেন্ট ও ওল্ড টেষ্টামেন্টের প্রথম অংশ, বাইবেলের অনুবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি, চিন্তা ও জ্ঞানরাজ্যের বাহক হিসাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ। এক্ষেত্রে বাংলা গদ্যভাষারীতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের যাবতীয় কৃতিত্ব অবশ্য মিশনারীদেরই প্রাপ্য। তবে একথাও সত্য, এ পর্যন্ত রচিত কোন গ্রন্থই কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠেনি - ধর্মীয় সমাচার প্রকাশ করাই ছিল এগুলির আদি ও অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্য।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ঃ

বাংলা ভাষার উদ্ভবলগ্নে ফোর্টউইলিয়াম কলেজের অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল ব্রিটীশ উপনিবেশবাদের একটি কৌশলী উদ্দেশ্য। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর উদ্যোগে ব্রিটেন থেকে আগত নব্য সিভিলিয়ানদের এ-দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ভাষা বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল বাইবেল অনুবাদক হিসাবে খ্যাত উইলিয়াম কেরীর উপর। উইলিয়াম কেরী বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন। ভারতবর্ষের অনেক প্রাদেশিক ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল - সংস্কৃত ভাষাতেও ছিল প্রগাঢ় অধিকার।

টিপ্পনী

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর শিক্ষার্থী ইংরেজ-সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য উইলিয়াম কেরী সর্বপ্রথম উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব বোধ করলেন এবং সেই অভাব দূর করার জন্য অচিরেই তিনি বেশ কয়েক জন বাঙালী লেখক-পন্ডিত নিয়োগ করলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, চন্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ।

পদ্যবন্ধাশ্রিত দেব-নির্ভর মধ্যযুগীয় সাহিত্যের অবসান ঘটিয়ে উনিশ শতকীয় রেনেশাঁস বা নবজাগরণ পাশ্চাত্যসভ্যতা-ভিলাষী বাঙালী চিত্তে সঞ্চার করল যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, মানবতাবাদ, কুসংস্কারোবিরধী বিজ্ঞানচেতনা এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-শিল্প এবং নারী-স্বাধীনতা ও নারীশিক্ষা সম্পর্কে এক আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা। বাঙালী সমাজ অনুভব করল একটি জাতির মনন-চিন্তন-জ্ঞানগরিমা ও গভীর জীবন-সংস্কৃতির সার্থক প্রকাশ ঘটে গদ্য সাহিত্যে। কাব্য-কবিতা যেখানে ব্যক্তিমনের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও কল্পনাজগতের ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করে, গদ্য সেখানে নিয়ে আসে বাস্তব প্রতিবেশের অকপট ও নির্মুখোশ প্রতিচ্ছবি। সেজন্যই যুক্তি, তর্ক, বিচারবোধকে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সংমিশ্রিত করে গদ্য পরিচর্যায় নবজাগ্রত বাঙালী জাতির স্বতোপ্রবৃত্ত আত্মনিয়োগ। এই আত্মনিয়োগের পেছনে যে স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি তা হল স্থিত-প্রজ্ঞ মননের অত্মপ্রকাশ গদ্য-ব্যতিরেকে অসম্ভব। মননলোকের উজ্জীবন সাহিত্যের একটি মূল বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতক হলো সেই মনন ও যুক্তির উন্মেষের যুগ - পয়ার, ত্রিপদী, লাচাড়ীর বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল যে বাংলা সাহিত্য, গদ্য তার মধ্যে এনে দিল নবযৌবনের দুরন্ত গতি আর দুর্দম শক্তি। গদ্ ধাতু থেকে গদ্য শব্দের উৎপত্তি - গদ্ ধাতুর অর্থ কথা বলা। মননশীলতার বাক্ - প্রতিমা হল গদ্য সাহিত্য। গদ্য হল কাল ও কলার পরিমাপক।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ভারত-শাসনের যোগ্য প্রতিনিধিরূপে গড়ে তোলা। এর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যটি হয়তো শাসক ইংরেজের স্বার্থান্ধতার পরিচায়ক, কিন্তু পরোক্ষ ফলপ্রাপ্তি বাঙালীর পক্ষে হিতকর। হিতকর এই কারণেই, বাঙালীর মনোলোকের মুক্তি ও সারস্বতসাধনার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি এই যজ্ঞানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আয়ুক্কাল ১৮০০ - ১৮৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত হলেও এর সুবর্ণযুগ মোটামুটিভাবে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কারণ এর পর বাংলার রেনেশাঁসের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবে বাংলার সামাজিক-ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল - যার ফলস্বরূপ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের

গুরুত্ব হ্রাস পেতে শুরু করে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য যাঁরা পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন, তাঁদের পরিচয় আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে শুধু উল্লেখ করব যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দ কিন্তু সাহিত্য রচনা বা স্বাধীন শিল্পসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনায় লেখনী ধারণ করেননি, তাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন ছাত্র-পাঠ্য পুস্তক রচনার প্রত্যক্ষ নির্দেশনায়। একথা মনে রেখেই বাংলা গদ্যভাষার উন্মেষলগ্নে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অগ্রসর হব।

টিপ্পনী

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রথম প্রকাশিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সাধক চরিতমালায় উইলিয়াম কেরীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কেরী মন্তব্য করেছিলেন 'I got Ram Bosu the compose a history of one of their Kings, the first prose book ever written in the Beangali language, which we are also printing.'

সম্রাট আকবরের সমকালীন ধূমঘাটের রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থটির মধ্যে সর্বত্র ইতিহাসকে যথাযথ অনুসরণ না করা হলেও যদুনাথ সরকারের মতো ঐতিহাসিক এই গ্রন্থের সূচনা অংশের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। ফার্সী তথ্যাদি এবং কিংবদন্তীকে আশ্রয় করেই রামরাম বসু এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। রামরাম বসু নিজেও ফার্সী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। ফলে তাঁর গ্রন্থে প্রচুর আরবী - ফার্সী শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাবে। গ্রন্থের ভাষারীতি সম্পর্কেও নানা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রয়েছে। এখানকার ভাষারীতির সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হল অন্বয়গত ত্রুটি ও বাক্‌ভঙ্গীর জড়তা। ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্য পরিচয় গ্রন্থে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা রিভিউতে প্রকাশিত রামরাম বসুর ভাষা সম্পর্কিত একটি মন্তব্য উদ্ধৃতি করেছেন। উদ্ধৃত অনুসারে বলা যায় তাঁর ভাষা ছিল kind of mosaic, half Persian, half Bengali. রামরাম বসুর পরবর্তী গ্রন্থ লিপিমালায় (১৮০২) আরবী ফার্সী ভাষার অত বাহুল্য ছিল না। লিপিমালায় পত্রমাধ্যমে দেশের নানা চিত্র ও কাল্পনিক ঘটনা সংযুক্ত হয়েছে। ভাষা ও ব্যাকরণগত কিছু ত্রুটি- বিচ্যুতি থাকলেও লিপিমালার গদ্যরীতিতে সহজবোধ্যতা, সরলতা ও ভাষার পারিপাট্য অনেকটাই রক্ষিত হয়েছে। এই গ্রন্থে মোট চল্লিশটি পত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা পত্র রচনা-রীতি শিক্ষা দেওয়া। রাজা-মহারাজা, কর্মচারী এবং স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে পত্রবিনিময়ের উদাহরণ হিসাবে এই গ্রন্থের চিঠিগুলি রচিত হয়েছিল। লিপিমালায় গুরুগম্ভীর সাধু গদ্যরীতি যেমন অনুসৃত হয়েছে, তেমনি চলিত রীতির গদ্য রচনাতেও লেখকের নিজস্বতা পরিস্ফুটিত হয়েছে। যেমন -

এ অধিকারে রামগোপাল সরদার বলিয়া একজন দস্যু ছিল। তাহার বিবরণ দেশাধিপ পর্যন্ত প্রকাশিত হইলে রাজধানী হইতে তাহাকে ধরিতে আর্যাদার আসিয়াছে।

উইলিয়াম কেরী ঃ

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কেবল বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবেই নয়, বাংলা গদ্যভাষার একজন লেখক হিসাবেও উইলিয়াম কেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাদ্রীসুলভ ধর্মীয় সংকীর্ণতা অতিক্রম করে উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যথার্থই ভালোবেসেছিলেন।

বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর এতই অনুরাগ সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি রামরাম বসুর 'যাবনী মিশাল' ভাষারীতিকে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। বাংলা ভাষার উন্নয়নে তিনি যেমন সমকালীন বিশিষ্টজনদের নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি নিজেও সে কাজে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন।

উইলিয়াম কেরীর রচিত গ্রন্থতালিকায় রয়েছে –

১) 'নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ' (১৮০১)

২) A Grammar of the Beangali Language. (১৮০১)

৩) কথোপকথন (১৮০১)

৪) ইতিহাসমালা (১৮১২) ইত্যাদি।

টিপ্পনী

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই কেরী বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছিলেন। তবে এ গ্রন্থের ভাষারীতি, শব্দবয়ন, বাক্যবিন্যাস,অন্বয় সংস্থাপন কোনটাই সাবলীল বা স্বাভাবিক রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি।

'A Grammar of the Bengali Language' গ্রন্থে কেরী বিচক্ষণ ভাষাতাত্ত্বিকের মতো বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার যথার্থ সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন। সে কালে যে সমস্ত ভৌগোলিক অঞ্চলে বাংলা ভাষা প্রচলিত ছিল, কেরী তাঁর গ্রন্থে তার সীমাও নির্দেশ করেছেন।গ্রন্থটি এগারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। অধ্যায়গুলিতে রয়েছে বর্ণপরিচয়, যুক্তবর্ণ শব্দ, ও বিভিন্নরূপ (বিশেষ্য), গুণবাচক শব্দ (বিশেষণ), সর্বনাম, ক্রিয়াপদ, শব্দগঠন, সমাস, অব্যয়, উপসর্গ, সন্ধি, এবং অন্বয় (syntax)। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হ্যালহেডের A Grammar of the Beangali Language. গ্রন্থেও অনুরূপ অধ্যায়গুলি ছিল। একজন বিদেশী লেখকের প্রয়াসে এ জাতীয় বাংলা ব্যাকরণ রচনা নিঃসন্দেহে প্রভূত প্রশংসার দাবী রাখে।

উইলিয়াম কেরীর কথোপকথন (Dialogues intended the facilitate the acquiring Beangali Language') সংলাপধর্মী রচনা। এর মধ্যে গ্রাম্যতার বাহুল্য থাকলেও এখানকার ভাষারীতি মোটামুটিভাবে সাধু ভাষার কাঠামোর উপরই প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী, সমাজ, লোকজীবনের জীবন্ত চিত্র কেরী একজন প্রাজ্ঞ সমাজতত্ত্ববিদের মতই যেন এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন।কথোপকথনে কেরী জানিয়েছেন – "These will form a regular series of books in the Beangali,gradually becoming more and more difficult, till the student is introduced to the higher classical works in the language.' কেরী তাঁর আশ্চর্য প্রতিভাবলে কলকাতা ও শ্রীরামপুর অঞ্চলের কথ্য ভাষারীতি বিশেষতঃ সাধারণ নারীসমাজের 'মুখের বুলি' যে ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন তা আজও আমাদের মধ্যে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। একটি দৃষ্টান্ত ঃ

'তোমার কয় যা'
'আমি সকলের বড় আমার আর তিন যা আছে।'
'কেমন যায়ে যায়ে ভাব আছে, কি কালের মত।'
'আহা ঠাকুরানী, আমার যে জ্বালা আমি সকলের বড়..... ।'

কেরীর 'ইতিহাসমালা'– হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ, সংস্কৃত উৎস, লোককথা, আবার কখনও লেখকের স্বকীয় কল্পনা থেকে সৃষ্টি। রচনাগুলি নিছক নীতি–উপদেশ ও গালগল্পে পূর্ণ। তবে এইগুলির ভাষা পরিচ্ছন্ন, সরল ও সাধুভাষার আদর্শে পরিকল্পিত। বাংলা গদ্যভাষার সাধু প্রকরণটি যে ক্রমশঃ জমাটবদ্ধ হচ্ছে পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির দ্বারা তা বেশ অনুভূত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কেরীর উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

টিপ্পনী

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ঃ–

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণের মধ্যে গদ্য ভাষাচর্চায় যিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলী (১৮০৮), প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩), এবং বেদান্তচন্দ্রিকা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের বত্রিশ সিংহাসন সংস্কৃত দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা গ্রন্থের অনুবাদ। হিতোপদেশও সংস্কৃত থেকে অনূদিত একটি গ্রন্থ। রাজাবলী ইতিহাসধর্মী রচনা – 'কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরেজের অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ ইতিহাস।' গ্রন্থটিকে বাঙালীর দ্বারা রচিত প্রথম ইতিহাসগ্রন্থের সর্যাদা দেওয়া হয়।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাটি হল প্রবোধচন্দ্রিকা – 'ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলংকার, যতি ব্যবহার, নীতিবিদ্যা, ইত্যাদি বহু শাস্ত্রের মর্ম এবং বিবিধ রচনা রীতি সংগ্রহকর্তার অথবা লেখকের পান্ডিত্যের পরিচয়সহ প্রকটিত হইয়াছে'।

বস্তুতঃপক্ষে প্রবোধচন্দ্রিকা হল বিচিত্র বিষয়বস্তুসংবলিত, যেমন – আইন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ধ্বনিতত্ব, ব্যাকরণ, অলংকার, রাজনীতি, ইত্যাদি সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে এখানে ভাষারীতিরও বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে। এখানে যেমন 'কোকিলকুলকলাপবাচাল যে মলয়াচলানিল' জাতীয় তৎসম শব্দ পরিমন্ডিত ভাষারীতির পরিচয় আছে, তেমনি লঘু বিষয় বর্ণনার অতি সাধারণ ভাষারীতির ব্যবহার আছে। যেমন –

"ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, তবে কি আজ যাওয়া হবে না, ক্ষুধায় মরিব?"
তৎপত্নী কহিল, "মরুক ম্যানে, আজি কি পিঠা না খাইলেই না?"

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি হল –

১) আতিশয্য দোষ থেকে অনেকাংশে মুক্ত।

২) কখনও কখনও সংস্কৃতানুসারী মন্থর গুরুগম্ভীর শব্দসজ্জা থাকলেও তা সু–অন্বয়বিশিষ্ট।

৩) পরিচ্ছন্ন সাধু গদ্যরীতির অনুসারী।

৪) মাঝে মাঝে লঘু বাগ্‌ভঙ্গীর ব্যবহারে সরসতামন্ডিত।

অনেকে মনে করেন বিদ্যাসাগরের পূর্বে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পরিচ্ছন্ন সাধু গদ্যরীতির সফল উদ্ভাবক। প্রথম চৌধুরীও মন্তব্য করেছেন 'তিনি একদিকে যেমন সাধু ভাষার আদি লেখক – অপরদিকে তিনি চলতি ভাষারও আদর্শ লেখক।' মার্শম্যান প্রবোধচন্দ্রিকার

ভূমিকায় সমকালীন লেখকদের সঙ্গে তুলনা করেই সম্ভবত মৃত্যুঞ্জয়কে 'master of the language' বলে উল্লেখ করেছেন।

অপ্রধান লেখকবৃন্দ ঃ

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অপরাপর লেখকদের মধ্যে গোলোকনাথ শর্মা সংস্কৃত হিতোপদেশ গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন (১৮০২), তারিণীচরণ মিত্র রচনা করেন ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট (১৮০৩), চন্ডীচরণ মুন্সী ফার্সী 'তুতীনামা'-র বঙ্গানুবাদ করেন তোতাইতিহাস, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় লেখেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং (১৮০৫), বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষা ' গ্রন্থের অনুবাদ করেন হরপ্রসাদ রায় (১৮১৫), কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রণয়ন করেন পর্দার্থতত্ত্বকৌমুদী (১৮২১), ও আত্মতত্ত্ব কৌমুদী (১৮২২)। এঁদের কেউই বাংলা গদ্যভাষারীতির মধ্যে বিশেষ কোন নতুনত্বের সূচনা করেননি।

বাংলার উনিশ শতকীয় রেনেশাঁসের প্রাণপুরুষ ছিলেন রাজা রামনোহন রায়। আধুনিক চিন্তামনস্কতা, যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞান চেতনা, মানবতাবাদ, রাজনৈতিক ভাবনা, কুসংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল সমাজগঠনের দুর্দম ইচ্ছা এবং ভন্ড, কপট, ধর্মধ্বজী পন্ডিতদের বিরুদ্ধাচরণ - এই বহুমুখী বৈশিষ্ট্যে রামমোহনের ইস্পাত- কঠিন ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের অচলায়তনিক সমাজে আধুনিক চিন্তা-ভাবনার মুক্ত বাতাস বইয়ে দেওয়ার জন্যই তাঁর আবির্ভাব, মধ্যযুগীয় অন্ধকার গহ্বরে প্রভাত সূর্যের দীপ্তি সৃষ্টি করেই নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙানোর ব্রতে তিনি যেন ব্রতী। সে জন্য কেউ তাঁকে 'ভারত-পথিক' আখ্যা দিয়েছেন, কেউ বলেছেন - 'morning star of the reformation.'

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার যুগজীর্ণ বিষয়গুলিকে উৎসাদন করতে গিয়ে (যেমন, সতীদাহ প্রথা) রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু গভীর জ্ঞান, শাস্ত্র সম্মত বিচার- বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক চেতনা ও মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ রামমোহন হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা, পৌত্তলিকতা, যুক্তিহীন আচার-আচরণ বা কৃত্যাদি ইত্যাদিকে মেনে নিতেপারেননি, আর পারেননি বলেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সর্বসংস্কার মুক্ত একেশ্বরবাদী এক নবধর্ম—ব্রাহ্মধর্ম। এই ধর্মের মানুষেরা হয়ে উঠলেন উদার, কুসংস্কারমুক্ত, শিক্ষাব্রতী এবং প্রগতিবাদী - রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সঙ্গে এখানেই তাঁদের একটা বিরাট পার্থক্য গড়ে উঠল। এর ফলে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে রামমোহনের সংঘাতের মাত্রা ও তীব্রতা পেল। এই দ্বন্দ্ব - জটিল সামাজিক পরিস্থিতিতে নিজ মত, নিজ সত্যোপলব্ধি ও নিজ আর্দশকে প্রতিপক্ষ শক্তির উর্ধ্বে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সে প্রসঙ্গ ভিন্ন। আমরা এখানে শুধু বাংলা গদ্যভাষার উন্মেষলগ্নে রাজা রামমোহনের ভূমিকা বিষয়ে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতবর্গের হাতে বাংলা গদ্যভাষা যথার্থ মননশীল ভাব ও শিল্পকর্মের বাহক হয়ে উঠতে পারেনি। সে ভাষা ছিল বিদেশী শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষাশিক্ষার মাধ্যমমাত্র। রামমোহন রায় হলেন সেই বিরল ব্যক্তিত্ব যাঁর লেখনীতে বাংলা ভাষায় এল মননশীলতার ওজস্বিতা, গুরুগম্ভীর ভাব, জ্ঞানমূলক চিন্তার পরিসর - এক কথায় প্রবন্ধ সাহিত্যের জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তুর যুক্তিনিষ্ঠতা সর্বপ্রথম তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হল। তবে রামমোহনের স্থিতধী বাংলা গদ্য ভাষারীতির পশ্চাতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভাষারীতির প্রভাব যে একবারেই নেই, তা বলা কখনই সমীচীন হবে না। কেননা রামমোহনের যুগেও বাংলা গদ্য

টিপ্পনী

ভাষারীতির যথার্থ আদর্শটি বা সঠিক অবস্থানটি নির্ণীত হয়নি। সংস্কৃত ভাষারীতি এবং কথ্য বা চলিত ভাষারীতির এক প্রকার টানাপোড়েনে সে-যুগের লেখকগণের প্রায়শঃই বিভ্রান্ত হতে হয়েছিল। রামমোহনের গদ্য ভাষাতেও সেই দ্বন্দ্বের আভাস আছে।

রামমোহন রায় কখনোই সাহিত্যিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখনী ধারণ করেননি। তাঁর সৃষ্টির নেপথ্যে উদ্দেশ্যপ্রবণতা, প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত যুক্তির খন্ডনপ্রবণতা এবং সেইসূত্রে মননশীলতা, যুক্তিবাদ, চিন্তামনস্কতা এবং জ্ঞানবাদ প্রধান স্থান অধিকার করেছে। এর ফলে তার সৃষ্ট গদ্য বাংলা ভাষার অগভীর খাতে এনে দিল জ্ঞানরাজ্যের জোয়ার। দুরূহ, কঠিন,তত্ত্বকথাকে ভাষা শৃঙ্খলে বেঁধে সাবলীলভাবে যুক্তি-বিচার পরম্পরায় প্রকাশ করতে গেলে ভাষার যে অন্তর্নিহিত শক্তি থাকা প্রয়োজন, রামমোহনের রচনায় ভাষার সেই অনাবিষ্কৃত শক্তি অনেকখানিই আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই শক্তিপ্রভাবে তাঁর রচনায় আন্তঃভারতীয় চেতনা এবং জ্ঞানবাদনির্ভর বিষয়বস্তুর সমারোহ উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত হতে পেরেছে। যুক্তিবাদ যেহেতু আবেগ বিবর্জিত ব্যাপার, সেজন্য রামমোহনের গদ্য হয়ে উঠেছিল পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার প্রতিরূপ স্বরূপ।

টিপ্পনী

রাজা রামমোহন যেন আধুনিক 'প্রমিথিউস'- নির্ভীক মত প্রকাশ ও লক্ষ্মুখীনতায় তিনি উনিশ শতকের বাঙালী সমাজের আদর্শ স্থানীয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা- দর্শনের হেতুবাদ (Cause and Relation) দ্বারা তিনি যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি স্বদেশীয় বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ ইত্যাদির সারবত্তাও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই ভারসাম্যযুক্ত মেলবন্ধনই তাঁর অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও যুক্তিবাদী মানসিকতা গঠনের প্রধান সহায়ক। রামমোহনের চিন্তাক্রমের মধ্যে ছিল নৈয়ায়িক দৃষ্টি-ভঙ্গী এবং ধ্রুপদী (Classsic) নিষ্ঠা।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি রামমোহন ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। রেনেশাঁস বা নবজাগরণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রাচীন জ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তার যুগোপযোগী উপস্থাপন। রাজা রামমোহন সেই কার্যে অগ্রসর হয়ে প্রাচীন ভারতীয় সত্যদর্শী ঋষিগণের রচিত বেশকিছু সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন- এর প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে অপরিচিত সাধারণ মানুষের কাছে শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা, সত্য, ও বাস্তবউপযোগিতাকে তুলে ধরা। রামমোহন রায়ের উল্লেখযোগ্য অনুবাদগ্রন্থগুলি হল -

বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (১৮১৫), কেন উপনিষৎ (১৮১৬), কঠোপনিষৎ (১৮১৭), ঈশোপনিষৎ (১৮১৭), মান্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭), গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), মুন্ডকোপনিষৎ (১৮১৯), অনুষ্ঠান (১৮২৯) ইত্যাদি.

রামমোহনের সমাজচিন্তা ও বিচারমূলক রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে -

উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তকের সম্বাদ প্রথম ভাগ (১৮১৮), দ্বিতীয় ভাগ (১৮১৯), কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০), সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০), ব্রাহ্মণসেবধি ঃ ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সম্বাদ (১ম, ২য়, ও ৩য় সংখ্যা ১৮২১), চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২), পাদ্রী ও শিষ্য সম্বাদ (১৮২০), পথ্যপ্রদান (১৮২৩), ইত্যাদি।

রামমোহনের বিচার ও বির্তকমূলক রচনাগুলির বিষয়বস্তু মূলতঃ প্রচীন শাস্ত্র এবং সমাজবিষয়ক। রচনাগুলির মধ্যে রামমোহনের ধী-শক্তি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান ও

দুরূহ তত্ত্বকে সহজবোধ্য করে তোলার প্রয়াস লক্ষিত হবে। বিরুদ্ধবাদীরা যেমন রামমোহনের প্রতি কটাক্ষ, কটূক্তি, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অসৌজন্য প্রকাশ করেছিলেন, রামমোহন কিন্তু সেই অসৌজন্যের পন্থা অনুসরণ করেননি। তিনি কেবল যুক্তি ও বিচারবোধ দ্বারা প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

রাজা রামমোহন রচিত মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে -

ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮), ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮২৮), গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)। এছাড়াও রয়েছে ফার্সী গ্রন্থ তুহ্ফৎ-উল্-মুওয়াহিদ্দিন (১৮০৩-০৪)।

টিপ্পনী

রাজা রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণ বাংলা ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে নতুন পথের দিশারী। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ধ্বনি,বর্ণ, অন্বয়, অক্ষর ইত্যাদির আলোচনায় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কতকগুলি প্রত্যয়ের আলোচনায় রামমোহন রায় মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বাংলা ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ যে শুধুমাত্র সংস্কৃতানুসারী নয়, বাংলা ভাষার শব্দগঠন ও বাক্যবিন্যাসরীতির যে একটা নিজেস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, এই গ্রন্থে রাজা রামমোহন সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়াও ভাষার বিশিষ্টতাগুলিকে নিয়মবদ্ধ করা, ভাষার উচ্চারণ ও ভাষাগঠনের নিয়মরীতি ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা এ গ্রন্থে করেছেন।

সবচেয়ে বড় কথা হল, এই আলোচনা গতানুগতিক বা যান্ত্রিক নয়, রামমোহনের নিজেস্ব ভাষাবোধের উজ্জ্বলতায় তা ভাস্বর।

রামমোহন মননশীলভাবসমন্বিত বাংলা গদ্যভাষার সূচনা করেছিলেন। তাঁর রচনায় প্রবন্ধের শিল্পশৈলীও অনেকখানি পরিস্ফুটিত হয়েছে, কিন্তু রামমোহন প্রকৃত অর্থে সচেতন সাহিত্যিক বা ভাষাশিল্পী ছিলেন না। সামগ্রিকভাবে রামমোহনের গদ্যভাষার যদি মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে বলতে হবে -

১) রামমোহন রায়ের রচিত গ্রন্থ বা পুস্তিকায় ব্যবহৃত বাক্যগুলি দীর্ঘ, কখনো অতিদীর্ঘ, বাক্যগুলি বহুবাক্যাংশবিশিষ্ট। বাক্যে একটি কর্তা ও সেইসঙ্গে একাধিক সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার সহাবস্থান লক্ষণীয়।

২) বাক্যে কর্তা ও ক্রিয়ার দূরান্বয়ের জন্য ভাষার অর্থগত দুরূহতা লক্ষণীয়।

৩) বাক্যে শব্দ-বিভক্তির ব্যবহার যথাযথ কিন্তু ক্রিয়াপদের ব্যবহারে নানা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। ক্রিয়াপদের বাচ্যানুগামিতাও (Voice) সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৪) রামমোহনের ভাষা মূলতঃ সংস্কৃত গ্রন্থের ক্ল্যাসিকধর্মী ভাষাদর্শের অনুসারী।

৫) গ্রন্থের বাক্যগুলির আয়তন বা আকার সুনির্দিষ্ট নয় - এবং 'যদ্যপি', 'অর্থাৎ', 'যেহেতু', ইত্যাদি অব্যয়সমন্বিত হয়ে বাক্যগুলি অহেতুক জটিল আকার ধারণ করেছে। এছাড়া একই বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বাচ্য।

তবে একথা বলতে হবে যে, তাঁর ভাষা, বিষয়বোধ ও চিন্তার মৌলিকতা অবশ্যই নিদিষ্ট পরিকল্পনানিয়ন্ত্রিত। তিনি পন্ডিত; তাঁর আলোচনা ও বিশ্লেষণেও রয়েছে প্রগাঢ় পান্ডিত্য।

আসলে যে সাহিত্যিককল্পনা-শক্তির প্রভাবে ভাষায় প্রসাদগুণ ও সাহিত্যরস সৃষ্ট হয়, সেই সাহিত্যিক-কল্পনার অভাব রামমোহনের রচনায় বারংবার লক্ষিত হয়। সেই অর্থে রামমোহনের রচনা জ্ঞান-ঋদ্ধ নীরস তত্ত্বকথার সমবায়মাত্র, যথার্থ সাহিত্যরসের কারবারী তিনি হয়ে উঠতে পারেননি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ

টিপ্পনী

উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী কিছু মানুষ সমাজ-সংস্কার, সমাজ-পুনর্গঠন, নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো, কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মনন গঠন, পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সভ্যতার প্রগতিশীলতাকে অনুসরণ ইত্যাদি ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কিন্তু আধুনিক তরুণ প্রজন্মের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সুনজরে দেখেনি। বরং আধুনিকতার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে সমাজে বাল্য বিবাহ, নারীস্বাধীনতা হরণ, এবং নারীশিক্ষার বিরোধিতার মত মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাপনাকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় যেমন সমাজের এই সংকীর্ণ ও অমানবিক রীতি-নীতি অনুশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাস্যাগরও সমাজের মধ্যে সর্বব্যাপ্তি প্রাচীন ও সংকীর্ণ মতবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। সমাজের বুক থেকে অশিক্ষা, কু-শিক্ষা,প্রথানুগত্য, কুসংস্কার দূরীকরণ এবং বিশেষতঃ নারীজাতির সামগ্রিক উন্নয়নের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েই বিদ্যাসাগরের বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্যভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, রাজা রামমোহন রায় সেই ভাষায় নিয়েএসেছিলেন মননশীলতার দার্ঢ্য, কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দ বা রাজা রামমোহন রায় কেউই সেই গদ্যভাষায় রস প্রবর্তন করতে পারেননি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম ভাষায় সেই রস-প্রবর্তনা ও শিল্পসৌকর্য আনয়নে সক্ষম হয়েছিলেন। বাক্-স্পন্দন সৃষ্টি, ছন্দোগুণ আনয়ন, যতি ও ছেদের সমন্বয়সাধন ও ভাষাকে সাহিত্যরসসিক্ত করে তোলার দুর্লভ শৈলী - এসমস্তই বিদ্যাসাগরকে তাঁর পূর্বসূরীদের চেয়ে অনেক উচ্চ স্থানে বসিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী লেখকদের গদ্যভাষার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভাষার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন - "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই।"

আপাতভাবে বিদ্যাসাগরের রচনাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ -

১) অনুবাদমূলক রচনা।

২) মৌলিক রচনা।

এইগুলি ব্যতিরেকে তিনি কিন্তু স্কুল পাঠ্যপুস্তক ও কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশ করেছিলেন।

অনুবাদমূলক রচনা ঃ

সাহিত্যের উন্মেষলগ্ন বা ভূমিকর্ষণের কালে অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই পর্বে ঐতিহ্যের অনুসরণ যেমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তেমনি দ্রুত গ্রন্থ রচনা করাও জরুরী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থরচনার মূল লক্ষ্য ছিল উপযোগবাদ বা 'Pragmatism' — তাই বাস্তবাদী লেখকের মতই অনুবাদগ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি যুগের প্রয়োজন

পূরণ করতে স্বতোদ্যোগী হয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মূলতঃ সংস্কৃত, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় রচিত গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। তবে তাঁর অনুবাদ নিছক Translation নয়, Transcreation - ভাবানুবাদ। ফলে তাঁর অনুবাদগ্রন্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরেস্তাদার থাকা কালে ভাগবতের কৃষ্ণলীলার কিয়দংশ অবলম্বনে বিদ্যাসাগর 'বাসুদেব চরিত' নামে একটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার মনে করেন গ্রন্থটি ১৮৪২ খ্রীঃ থেকে ১৮৪৭ - এর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে রচিত হয়েছিল। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ বা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কোনটাই পাওয়া যায়নি।

টিপ্পনী

সেই অর্থে বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হল বেতাল 'পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটারি জি.টি. মার্শেলের নির্দেশে হিন্দি কবি লাল্লুজী রচিত 'বৈতাল পচ্চিশী' অবলম্বনে বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থটি রচনা করেন। হিন্দি ভাষা শিক্ষার শিক্ষার্থী বিদ্যাসাগর তাঁর হিন্দি ভাষা শিক্ষার সাফল্য পরীক্ষা করার জন্যই সংস্কৃতে রচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের পরিবর্তে হিন্দি গ্রন্থ থেকে অনুবাদকর্মে বৃত হয়েছিলেন। এই গ্রন্থের অন্তর্গত আখ্যানগুলি চমকপ্রদ ও অদ্ভুততরসমন্ডিত - ফলে সেইগলি পাঠক কুলের কাছে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। গল্পরসের প্রাথমিক যোগান দেওয়ার কৃতিত্ব সম্ভবতঃ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থরই প্রাপ্য। এই গ্রন্থের নবম সংস্করণ পর্যন্ত যতিচিহ্ন হিসেবে কেবল দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছিল। দশম সংস্করণ কালে বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থে বিন্যস্ত বাক্যগুলিকে ইংরেজী ভাষার অনুসরণে কমা, সেমিকোলন, হাইফেন ইত্যাদি দ্বারা বিভাজিত করেছেন। এখানকার ভাষারীতি ক্ল্যাসিক-গম্ভীর্য ও রোমান্টিক ভাবাবেগ - উভয় রীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এছাড়াও এখানে রয়েছে সাধুভাষানির্ভর নাটকীয়রীতির বাক্যবিন্যাস।

বিদ্যাসাগরের আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদগ্রন্থ হল শকুন্তলা (১৮৫৪)।

প্রখ্যাত সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার কালিদাস বিরচিত সপ্তাঙ্কসমন্বিত নাটক 'অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্'-এর সাহিত্যগুণান্বিত গদ্যানুবাদ হল বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'। কালিদাসের রচনার আঙ্গিক হল নাটক, আর বিদ্যাসাগরের আঙ্গিক হল গদ্যআখ্যান। সে জন্য ঘটনা বা কাহিনীর যথাসম্ভব নাটকীয়তা বজায় রেখে এবং নাট্য-আঙ্গিক ও আখ্যান-আঙ্গিকের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এই অনুবাদকর্মে অগ্রসর হতে হয়েছিল। শকুন্তলায় প্রধানতঃ সাধুরীতির গদ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে এবং সে ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রাণশক্তি সম্পন্ন।

বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ অনুবাদকর্ম হল 'সীতার বনবাস' (১৮৬০)। সংস্কৃত নাট্যকার ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটক ও আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যের উত্তরকান্ডের ঘটনা অবলম্বনে 'সীতার বনবাস' রচিত হয়। অনুবাদগ্রন্থ হলেও বিদ্যাসাগর এই রচনাটিকে মৌলিক সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। এই গ্রন্থের রাম চরিত্রের কোমলচিত্ততা ও অতিরিক্ত ভাবাবেগপ্রবণতা অনেকটাই স্বয়ং বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিচরিত্রের প্রভাবজাত। ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক এই উভয় ভাষারীতির হরগৌরী মিলনে এই গ্রন্থের শিল্প-সৌন্দর্য অসামান্য রূপ লাভ করেছে।

বিদ্যাসাগরের অনুবাদগ্রন্থগুলির মধ্যে 'ভ্রান্তিবিলাস' - এ লেখকের অনুবাদ-পরিকল্পনাটি

টিপ্পনী

অভিনব মৌলিকত্বের দাবী জানাতে পারে। গ্রন্থটি মহামতি শেক্স্পীয়রের 'The comedy of Errors' - নাটকের শিল্পগুণান্বিত অনুবাদ। এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর বিদেশী কাহিনীর স্থান- চরিত্র নাম - পরিবেশ ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন সাধন করে সম্পূর্ণ দেশীয় রূপাদান করেছেন। লঘু বা হাল্কা কৌতুক, উদ্ভট রস, প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের টানাপোড়েন, নাটকীয় উৎকণ্ঠা- এক কথায় কৌতুকপ্রিয় চিত্তাকর্ষক ঘটনার সমস্ত উপকরণ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিদ্যাসাগর এখানে ব্যবহার করেছেন। গুরু-গম্ভীর বাক্রীতি, সমাস-সন্ধি- অলংকার সমৃদ্ধ আবেগমন্ডিত ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত বিদ্যাসাগর যে লঘু রসের ভাষা ব্যবহারেও একজন কুশলী শিল্পী, 'ভ্রান্তিবিলাসের' গদ্য ভাষার সংস্পর্শে এলে তা স্পষ্টরূপে বোঝা যায়।

সাহিত্যধর্মী অনুবাদকর্ম ছাড়াও বিদ্যাসাগর কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকজাতীয় অনুবাদগ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মার্শম্যানের 'History of Beangal' অবলম্বনে রচিত বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৮)। চেম্বার্সের Biographies ও Rudiments of Knowladge অবলম্বনে যথাক্রমে রচিত 'জীবনচারিত'(১৮৪৮) এবং 'বোধোদয়'(১৮৫১)। ঈশপ্স্ ফেবল্স্ অবলম্বনে বিদ্যাসাগর 'কথামালা' গ্রন্থটি রচনা করেন।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষামূলক রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'বর্ণপরিচয়', প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৫), 'চরিতাবলী' (১৮৫৬), 'ঋজুপাঠ' ১ম,২য়,৩য়,(১৮৫১-৫৩), 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' অবলম্বনে রচিত চারখন্ডে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' (১ম-১৮৫৩,২য়-১৮৫৩, ৩য়-১৮৫৩, এবং ৪র্থ ১৮৬২)।

এই পর্বের গ্রন্থগুলি কোন সাহিত্যিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য রচিত হয়নি। সুতরাং সেইগুলির পৃথক আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

মৌলিক রচনাসমূহ ঃ

গদ্যরীতির প্রবন্ধজাতীয় আঙ্গিকে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সমাজ সংস্কারনির্ভর বির্তকমূলক পুস্তিকা-সমূহে। সমকালীন সমাজে বহুবিবাহের নানাবিধ কুফল, বৈধব্যজীবনের চরম দুঃখ-কষ্টভোগ ইত্যাদি অনুধাবন করে আধুনিক জীবনদৃষ্টি নিয়ে বিদ্যাসাগর নারীজীবনের সংস্কারসাধন করতে চেয়েছিলেন। এজন্য ইংরেজ সরকারের সহায়তায় নারী জীবনের অনুকূল আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। নারী জীবনের সংস্কারসংক্রান্ত এই রকম দুটি পুস্তিকা হল - 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১ম ভাগ-১৮৭১, ২য় ভাগ ১৮৭৩), 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম-খন্ড ১৮৭১, ২য়- খন্ড ১৮৭৩)। সমকালীন সমাজ-সত্য, সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান, পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তি এবং অকৃত্রিম নারীজাতি প্রীতি থেকে বিদ্যাসাগর ঐ পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনা 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' বিশেষ ভালে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য- শাস্ত্র বা অলংকার-শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে নয়, এই সাহিত্য সমালোচনা বিদ্যাসাগরের নিজস্ব যুক্তি, বুদ্ধি ও সাহিত্যজ্ঞান দ্বারা চালিত হয়েছে। সাহিত্য সমালোচনার ধারায় পূর্বোক্ত রচনাটি একটি দিক্দর্শী সৃষ্টি বলে বিবেচিত হয়। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অসমাপ্ত 'আত্মচরিত' ও 'প্রভাবতী

সম্ভাষণ' - এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগর তাঁর আত্মজীবনী সমাপ্ত করে যাননি। যদি সমাপ্ত করতেন তবে 'আত্মচরিত' (১৮৯১) থেকে আমরা তাঁর জীবনের আরও অনেক বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারতাম।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের বন্ধুস্থানীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের শিশুকন্যা প্রভাবতীর অকাল মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বসিত বিদ্যাসাগর এই পুস্তিকটি রচনা করেন। বাইরের বজ্র-কঠিন চারিত্র্য ধর্মের অন্তরালে তাঁর মনোলোকে যে কি বিপুল স্নেহধারা ও আবেগময়তা সঞ্চিত ছিল, বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' পাঠ করলে সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

টিপ্পনী

বেনামী বা ছদ্মনামে রচিত গ্রন্থসমূহ ঃ

সমস্ত সামাজিক বাধানিষেধকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সমাজ সংস্কারমূলক প্রগতিশীল কাজকর্মে বিদ্যাসাগর আজীবন অক্লান্ত সৈনিকের মত সংগ্রাম করে গিয়েছেন। সেজন্য রক্ষণশীল পন্ডিত-সমাজ দ্বারা তিনি সারাজীবন নানাভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। অশেষ ধৈর্য ও ক্ষমাশীল মনোভাব নিয়ে তিনি তা নীরবে সহ্য করার চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু কখনও কখনও তাঁর সেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় ছদ্মনামে তিনি কিছু বিদ্রূপাত্মক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এই জাতীয় রচনাগুলি হল ঃ-

কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪), এবং কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য ছদ্মনামে রচিত 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬)। তদ্ভব শব্দ ও বিদেশী শব্দ সংমিশ্রণে বিদ্রূপ ব্যঙ্গ ও লঘুরসিকতাধর্মী এই রচনাগুলি চলিত গদ্য ভাষারীতির উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষার কয়েকটি নমুনা ঃ

১) মহর্ষি শোকাকুলা হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত হইতেছি, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি।

(শকুন্তলা)

২) এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবগিরি। এই গিরির শিখরদেশ সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত, অর্ধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়, পাদদেশ প্রসন্নসলিনা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে। (সীতার বনবাস)

৩) লক্ষীছাড়ার আস্পর্ধা দেখ না, রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমায় গিন্নি বলিয়া সম্ভাষন করিতেছেন।

(ভ্রান্তিবিলাস)

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী। যথার্থ রসবোধ, উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক কল্পনার (Creative imagination) সমবায়ে তাঁর গদ্যভাষা সত্যকার সাহিত্যের উপকরণ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় - "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এলং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি

এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।'' রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যকে সামনে রেখে আমরা নির্দ্বিধায় বিদ্যাসাগরকে 'বাংলা গদ্যের জনক' আখ্যায় আখ্যায়িত করতে পারি।

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক - খ
নাটক
বাংলা নাট্যসাহিত্য — ভূমিকা

টিপ্পনী

প্রাচীন ভারতবর্ষে গৌরবমন্ডিত সংস্কৃত নাটকের অভাব ছিল না। সেই সুপ্রাচীন কালে ভারতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত নাটক যথার্থ অর্থে অভিনয়োপযোগী করে লিখিত হয়নি। সেগুলি ছিল মূলতঃ কাব্যধর্মী। পাঠ্যসাহিত্য হিসাবেও সেগুলির একটি পৃথক আবেদন রয়েছে।

আধুনকি যুগের নাটক পুরোপুরি মঞ্চনির্ভর শিল্প। অভিনয়োপযোগিতাই তার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। আধুনিক পরিভাষায় সে জন্য নাটককে 'ফলিত কলা' বা Performing Art বলা হয়। মনে রাখতে হবে আধুনিক নাট্যসৃষ্টি, মঞ্চায়ন, অভিনয়রীতি - এসবের পেছনে রয়েছে পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব। প্রাচীন গ্রীসেও নাটক ও নাট্যাভিনয় সর্ম্পকে একটা সমৃদ্ধ ধারণা ছিল। 'অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স্' গ্রন্থে নাটক বলতে অভিনয়োপযোগী জমাটবদ্ধ কাহিনী, বিকাশশীল চরিত্র, নাট্যোৎকণ্ঠা, সুপরিণতিযুক্ত শিল্পের কথা বলা হয়েছে। সেই অর্থে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারগণ যেমন কালিদাস, ভবভূতি শূদ্রক, কেউই নাট্যশিল্পকে "Objective art" বা বস্তুধর্মী শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেননি, তাঁদের নাটকের মধ্যে Subjectivity বা মন্ময়তার প্রাধান্য বেশী।

এদেশে পাশ্চাত্য নাট্যকলার প্রবর্তনের প্রাক্কালে যাত্রাপালা, কৃষ্ণযাত্রা, নাট্যগীতি, পাঁচালী, কথকতা, ইত্যাদি অভিনয়ধর্মী সংলাপ ও গীতিধর্মী লোকায়ত শিল্পের প্রচলন ছিল। মধ্যযুগের বিভিন্ন গ্রন্থে নাট্যাভিনয়ের কথা অবশ্য উল্লিখিত হয়েছে। তবে এদেশে নাট্যধারার ইতিহাস মূলতঃ নাট্য লক্ষণাক্রান্ত লোকায়ত শিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। ইউরোপীয় নাট্যশিল্পের প্রচলনের পূর্বে গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, গোপাল উড়ে, মধুসূদন কিন্নর প্রমুখ যাত্রাপালাকারেরা অত্যন্ত সুখ্যাতির সঙ্গে দেশজ অভিনয়রীতিটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। পুনারাবৃত্তি করে বলতে হয় যে, আধুনিক নাটকের যে সংজ্ঞা তা পাশ্চাত্যবাহিত। ইরেংজ শাসনাধীন বাংলায় মূলতঃ উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেস্ব বাংলো বা গৃহে অস্থায়ী মঞ্চে নির্বাচিত বিশিষ্ট অতিথিবর্গের সম্মুখে নাটকের দৃশ্যবিশেষের অভিনয়ের রেওয়াজ ছিল। কলকাতার বুকে ১৭৯৫ সালে ২৫ নং ডোমতলা লেনে ভারত ও বাংলাদেশ প্রেমী রুশ আগন্তুক হেরাসিম লেবেডেফের আন্তরিক উদ্যোগ ও উৎসাহে 'বেঙ্গলী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। হেরাসিম বিদেশী হলেও ভালোভাবে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। হেরাসিমের ভাষাশিক্ষক গোলকনাথ দাস ও হেরাসিমের উদ্যোগে তখন দুটি বিদেশী নাটক বাংলায় অনূদিত হয়। নাটক দুটি হল - The Disguise -বাংলা রূপান্তর 'সঙ্বদল' এবং অন্যটি হল Love is the Best Doctor. ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হেরাসিম তার প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটারে 'সঙবদলের' অভিনয়-ব্যবস্থা করেন। সম্পূর্ণ দেশীয় শিল্পভাবনায়, দেশীয় অভিনেতা ও দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সহায়তায় টিকিট বিক্রি করে এই নাট্যাভিনয়ের সূচনা করা হয়। কিন্তু সম্ভবতঃ হেরাসিমের উপর ইংরেজ নাট্যব্যবসায়ীদের আক্রোশের কারণে বেঙ্গলী থিয়েটার অচিরেই অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং সেখানকার নাট্যাভিনয়ও পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

টিপ্পনী

এরপর বেশ বেশ কিছুকাল কলকাতায় বাংলা নাট্যাভিনয়ের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু কলকাতার নাট্যামোদী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহে সমকালে বেশ কিছু সখের নাট্যশালা গঠিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালা, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়াঘাটা মঞ্চ, পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রভৃতি। এসমস্ত নাট্যশালায় আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য সংস্কৃত বা ইংরেজী নাটকের অনুবাদ মঞ্চস্থ হত। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ন্যাশানাল থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে টিকিট কেটে সাধারণ দর্শকের নাট্যাভিনয় দেখার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বা তারও কিছু পরে যে সমস্ত নাট্যকার সংস্কৃত নাটকের প্রভাবে মূলতঃ অনুবাদধর্মী নাট্যরচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের রচিত নাটকগুলি মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন', জি.সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস', শেকসপীয়রের 'দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস', অবলম্বনে রচিত হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী', 'চিত্তবিলাস'(১৮৫০), চারুমুখা চিত্তহারা, কালীপ্রসন্ন সিংহের বিক্রমোর্বশী (১৮৫৮), 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটক', উমেশ চন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটক (১৮৫৬), যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলা চিত্ত-চাপল্য' (১৮৫৭), ইত্যাদি। এই নাটকগুলি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে কেবল ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষা করার জন্যই উল্লেখযোগ্য, এদের শিল্পগত মূল্য সামান্যই।

রামনারায়ণ তর্ক রত্ন ঃ

তবুও এই সময়কালে রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) নামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ অথচ উদারচিত্ত নাট্যকার পাশ্চাত্য নাট্য আঙ্গিক সম্পর্কে অসচেতন থেকেই বেশ কিছু মঞ্চ-সফল নাটক রচনা করেছিলেন। শিল্পধর্মের বিচারে তাঁর নাটকগুলি উল্লেখযোগ্য না হলেও বাঙালীর নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করার ব্যাপারে রামনারায়ণের একটা ইতিবাচক ভূমিকা অবশ্যই ছিল।

তাঁর সামাজিক নাটক কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), নবনাটক (১৮৬৫), পৌরাণিক নাটক রুক্মিণী হরণ (১৮৭২), কংসবধ(১৮৭৫), অনুবাদ নাটক বেণী সংহার, মালতী মাধব (১৮৫৭), রত্নাবলী (১৮৫৮), অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ (১৮৬০), প্রহসন - যেমন কর্ম তেমনি ফল, পরীস্থান, চক্ষুদান, উভয় সংকট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ

'নাটুকে' রামনারায়ণের 'রত্নাবলীর' অভিনয়-ব্যবস্থা হয়েছিল বেলগাছিয়া নাট্যশালায়। উদ্যোক্তা ছিলেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ। এই নাটকের অভিনয় দেখার জন্য কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বেশকিছু ইউরোপীয়ান ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ইউরোপীয়দের কাছে বাংলা ভাষা বোধগম্য হবে না - এই কারনে ইউরোপীয় দর্শকদের সুবিধার জন্য ইংরেজী ভাষায় সুপন্ডিত মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অনুবাদক বা দোভাষীর কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মধুসূদন রত্নাবলীর অভিনয় দেখে বাংলা নাটকের দুর্দশা অনুধাবন করে সখেদে উচ্চারণ করেছিলেন -

'অলীক কু- নাট্য রঙ্গে
মজে লোক রাঢ়ে-বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।'

বাংলা নাটকের বালখিল্যতা ও 'অলীক' নাট্যশিল্প চর্চার বিড়ম্বনা থেকে বাঙালীকে মুক্তিদানের জন্য তিনি অচিরেই পাশ্চাত্য নাট্য-আঙ্গিকের আদর্শে বাংলা নাটক রচনার অঙ্গীকার করেছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে দেশীয় নাটকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে তিনি লিখলেন -

> "In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiments. With us it is all softness, all romances. We forget the world of reality and dream of Fairy lands. Ours are dramatic poems....."

টিপ্পনী

সেই দিক থেকে বলা যায় — যে মধুসূদন মিল্টন-বায়রনদের মত মহাকবি হতে চেয়েছিলেন, ইংরেজীতে কাব্য-কবিতা রচনা করার স্বপ্নে যিনি ছিলেন বিভোর, যিনি লিখেছেন 'I sigh for the distant Albian's shore' -সেই মধুসূদনের বাংলা নাট্য-আঙিনায় আগমন একটি আকস্মিক ঘটনা - এই আকস্মিক ঘটনাই বাংলা নাটকের রাহুমুক্তির সুবর্ণ ক্ষণটি প্রস্তুত করেছিল। বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩) এক যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব। মহাকবির কাব্যৈশ্বর্য তাঁর চৈতন্য-লোকে বিরাজিত। নাট্যকার হিসাবেও তিনি আধুনিকতার সুযোগ্য পুরোহিত - সেখানেও তিনি যুগন্ধর।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাট্য প্রতিভা বৈচিত্র্যসন্ধানী। তাঁর নাট্য-বৈচিত্র্যের শ্রেণী বিভাগঃ-

১) পৌরাণিক নাটক ঃ শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), পদ্মাবতী (১৮৬০)।
২) ঐতিহাসিক নাটক ঃ কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)
৩) প্রহসন ঃ একেই কি বলে সভ্যতা বুড়োশালিকের ঘাঁড়ে রোঁ এছাড়া রয়েছে ইতিহাস পুরাণের কাল্পনিক ও অতিনাটকীয় ঘটনা-পরিবেশে লেখা নাটক 'মায়াকানন' (১৮৭৪), এবং অসমাপ্ত নাটক 'বিষ না ধনুর্গুণ'।

শর্মিষ্ঠা ঃ

পাশ্চাত্য আঙ্গিকের প্রথম যথার্থ নাটকটি হল 'শর্মিষ্ঠা'। এর কাহিনী-অংশ মহাভারত থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি এখানকার মুখ্য চরিত্র। এই নাটকে মধুসূদন শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর মধ্যে আধুনিক নারীর ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাশ্চাত্যরীতির নাটক হলেও শর্মিষ্ঠায় মধুসূদন প্রাচ্য নাট্যরীতির প্রভাবকে পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বিশেষতঃ সংস্কৃত নাট্যকার কালিদাসের অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্ নাটকের প্রভাব এখানকার কাহিনীর বিভিন্ন অংশে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি হল চরিত্রগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অভাব। মধুসূদন নাটকটির শীর্ষনাম শর্মিষ্ঠার নামে রাখলেও নাট্যাংশে দেবযানী চরিত্রটিই অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। এই নাটকের সংলাপও ত্রুটিমুক্ত নয়। অতিরিক্ত তৎসম শব্দ ও সমাসবহুল পদ, অতিকবিত্ব, দীর্ঘ সংলাপ নাট্য ঘটনার গতিকে অনেকটাই মন্থর করে দিয়েছে। অতিরিক্ত অর্থালংকার ব্যবহারের কারণে নাট্য-সংলাপে বস্তুধর্মিতার পরিবর্তে এসেছে কাব্যধর্মিতা।

সচেতন মধুসূদন নিজেই এই সম্পর্কে বলেছেন - 'I often forget the real in search of the poetical.'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে গভর্ণর জেনারেল স্যার জন পিটার

গ্র্যান্ট, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বর্গ, এবং অনেক মান্যগণ্য অতিথিদের সামনে অত্যন্ত জাঁকজমকসহকারে ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি অভিনীত হয়েছিল।

পদ্মাবতী ঃ

ট্রয়যুদ্ধের মূলে ছিল জুনো, ভেনাস ও প্যালাস নামক তিন দেবীর বিবাদ - গ্রীক পুরাণের 'Apple of Discord' - এর সেই কাহিনী নিয়ে রচিত হয় মধুসূদনের পদ্মাবতী নাটক। তবে মধুসূদন তাঁর নাটকে গ্রীক পুরাণের কাহিনীকে ভারতীয় পুরাণের ছাঁচে ঢেলে দেব-দেবীর নাম, চরিত্র, ঘটনা অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। ফলে নাটকটির মধ্যে সর্বত্র বিরাজ করেছে ভারতীয় পৌরাণিক পরিমণ্ডল। এই নাটকে মধুসূদন তিনজন গ্রীক দেবীর যে ভারতীয় সংস্করণ করেছেন তাঁরা হলেন শচী, রতি, ও মুরজা। প্যারিস ও হেলেন হলেন যথাক্রমে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী। এই নাটকে মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠার' ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন - বিশেষতঃ নাট্য-সংলাপ সৃষ্টিতে মধুসূদন এখানে অনেকটাই সচেতন।

টিপ্পনী

কৃষ্ণকুমারী ঃ

কৃষ্ণকুমারী নাটকটি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। James Todd এর 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থ থেকে এর কাহিনী অংশ গৃহীত হয়েছে। কৃষ্ণকুমারী পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত একটি ঐতিহাসিক ট্রাজিডি নাটক। জি.সি.গুপ্তের কীর্তিবিলাসকে প্রথম বাংলা ট্রাজিডি নাটক বলা হলেও মধুসূদনই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য আদর্শে ঘটনা ও চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সংঘাতপুর্ণ নাট্যপরিবেশে সার্থক বাংলা ট্রাজিডি নাটক প্রণয়ন করেন। উদয়পুরের মহারাণা ভীমসিংহের স্নেহশীলা কন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থী হওয়ার জন্য জয়পুর অধিপতি জগৎ সিংহের সঙ্গে মরুদেশের রাজা মানসিংহের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলশ্রুতিরূপে উভয় রাজার উদয়পুর আক্রমণের হুমকি প্রদান এবং দুর্বলচিত্র মহারাণা ভীমসিংহের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা ও মন্ত্রীর পরামর্শে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে নিজে অপ্রকৃতিস্থ বা উন্মাদ হয়ে যাওয়া এবং পরিণামে কৃষ্ণকুমারী আত্মঘাতিনী হয়ে পিতা ও রাজ্যকে বিপন্মুক্ত করার করুণ কাহিনী নিয়ে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটি রচিত। এই নাটকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ গভীর রাত্রিতে অপ্রকৃতিস্থ ভীমসিংহের যে করুণ বিলাপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর সঙ্গে শেক্স্পীয়ারের 'কিং লিয়র' নাটকে একইরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে কর্ডেলিয়ার মৃত্যুতে কিং লিয়রের বিলাপের গভীর সাদৃশ্য আছে।

কৃষ্ণকুমারীর ট্রাজিডি বহিঃঘটনার দুর্নিবার আঘাতে—এখানে নিয়তিশক্তিই যেন তাঁর ট্রাজিক পরিণামের জন্য দায়ী। দুর্বল-চিত্ত ভীমসিংহের দায়ও কৃষ্ণকুমারীর ট্রাজিডির জন্য মোটেই কম নয়। রাণা ভীমসিংহ যদি পুরুষকার শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে প্রতিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণকে বাজি রেখে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতেন, তাহলে কৃষ্ণকুমারীর জীবনের এই শোচনীয় পরিণতি সংঘটিত হত না। কৃষ্ণকুমারীও আবেগ দ্বরা চালিত এক অভিমানিনী চরিত্র। ট্রাজিডি নাটকে চরিত্রের যে অসম সাহসিকতা, বীর্য, ধার্য্য, সংগ্রামশীলতা ও পতনের কিনারায় দাঁড়িয়েও হার-না-মানার দৃঢ় সংকল্প পরিলক্ষিত হয়, এ নাটকের কোন চরিত্রে তা লক্ষিত হয় না। এই দুর্বলতাগুলি থাকা সত্ত্বেও বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে কৃষ্ণকুমারীর একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

মায়াকানন ঃ

জীবনের প্রায় অন্তিম লগ্নে রোগ-ভোগ, অর্থাভাব ও নিরাপত্তাহীনতার বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে মধুসূদন 'মায়াকানন' নাটকটি রচনা করেন। ইতিহাস ও পুরাণের সংমিশ্রনে, অলৌকিকতা, অতিনাটকীয়তা ও দুর্জ্ঞেয় নিয়তিবাদের প্রভাবে রচিত একটি কাল্পনিক বিষয়বস্তুসংবলিত নাটক হল 'মায়াকানন'। বেঙ্গল থিয়েটারের শরৎচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে মধুসূদন দুটি নাটক লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। 'মায়াকাননে' রতির অভিশাপে প্রস্তর মূর্তিতে রূপান্তরিতা ইন্দিরার অলৌকিক ঘটনার প্রভাবে মুক্তিলাভ এবং পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের ইতিকথা বর্ণনা করতে গিয়ে মধুসূদন ছদ্ম ঐতিহাসিক ঘটনা, যুদ্ধ, একাধিক মৃত্যু এবং অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। শিল্পধর্মের বিচারে 'মায়াকানন' উচ্চাঙ্গের নাটক নয়। জীবনের এই পর্বেই মধুসূদন আর একটি নাটক লেখার সূত্রপাত করেন - নাটকটির নাম বিষ না 'ধনুর্গুণ'। মধুসূদনের অকাল মৃত্যুর কারণে নাটকটি সমাপ্ত হয়নি।

টিপ্পনী

প্রহসন - 'একেই কি বলে সভ্যতা' ঃ- উনিশ শতকের কলকাতায় সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য বিকৃত ও অশ্লীল রুচির নানা-গ্রন্থ-প্রহসন-বিদ্রূপাত্মক রচনা সৃষ্ট হয়েছিল। প্রহসন বিদ্রূপাত্মক বা কৌতুকজাতীয় নাট্যশিল্প হলেও আদর্শ প্রহসন বিশুদ্ধ শিল্পের মর্যাদা পেতে পারে। ব্যষ্টি বা সমষ্টি চরিত্র, সমাজ বা কোন প্রতিষ্ঠানের নান ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা অসঙ্গতিকে বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করে চরিত্র-সংশোধনের একটা প্রয়াস প্রহসনে করা হয়ে থাকে। সুগভীর সমাজ-সচেতনতা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানব-চরিত্র সম্পর্কে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলে প্রহসনের মধ্যেই Serious বা গুরুগম্ভীর শিল্পচাতুর্য সৃষ্টি করা যায়। প্রাক-মধুসূদন পর্বে প্রহসন বা বিদ্রূপাত্মক রচনায় সেই বিশুদ্ধ শিল্পধর্মের একান্ত অভাব ছিল।

মধুসূদন বাংলা প্রহসনের মরা গাঙে প্রাণের জোয়ার নিয়ে এসেছিলেন। একজন মহাকবির লেখনীতে তদানীন্তন কলকাতার শিক্ষিত সমাজের ভন্ডামি, লাম্পট্য ও সভ্যতার নামে বিকৃত জীবনযাপনের চিত্র যেমন ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে চিত্রায়িত হয়েছে, তেমনি একই সঙ্গে মধুসূদনের সব্যসাচী নাট্যপ্রতিভা গ্রামীণ জীবনে জমিদারশ্রেণীর বিত্তবান চরিত্রদের বিকৃত কামবাসনা, চরিত্রহীনতা ও লোভ-লালসার এক জীবন্ত আলেখ্য অঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছে। কলকাতার নাগরিক জীবনে ইংরেজী শিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী নব্য যুবকসম্প্রদায়ের নানান চারিত্রিক অসঙ্গতি, স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক মনোভাব, মদ্যাসক্তি, বিকৃত কামচরিতার্থতা ইত্যাদির পরিচয় জ্ঞাপন করে মধুসূদন রচনা করেছিলেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি আর গ্রামীণজীবনের অবক্ষয়ের চিত্র-রূপায়ন হল 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

'একেই বলে সভ্যতা' প্রহসনটির মধ্যে উনিশ শতকের কলকাতার 'ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের' মদ্যাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ইংরেজের অন্ধ অনুকরণমোহে স্বদেশদ্রোহিতার এক জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই প্রহসনের কালীনাথ, নবকুমার, শিবু, মহেশ, বারবিলাসিনী বা তৎকালীন বঙ্গললনাদের জীবন্ত সংলাপে যে আধুনিকতার ঔজ্জ্বল্য, এতদিন পরেও তা অম্লান রয়েছে। এই প্রহসনে উল্লিখিত জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার বিচিত্র ক্রিয়াকান্ড সমকালীন অবক্ষয়িত সমাজের এক বাস্তব দলিল। এখানকার ইংরেজী-বাংলার মিশ্রণে সৃষ্ট সংলাপগুলি প্রহসনের বিষয়বস্তু ও চরিত্রের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ মানানসই। বিদেশী ভাষার মিশ্রণ এখনে বাংলা প্রহসনের মধ্যে

কোন 'রসাভাস' ঘটায়নি, বরং প্রহসনটিকে আরও বাস্তব ও শিল্পগুণান্বিত করেছে। যেমন নবকুমারের 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায়' আসার দেরীর কারণ হিসাবে যখন নবকুমারের বিশেষ কাজকর্ম থাকার অজুহাত দেওয়া হয় এবং শিবু সেই কাজকর্মের অজুহাত সম্পর্কে বলে - 'দ্যাট্স্ এ লাই', তখন ক্রোধোন্মত্ত নবকুমারের হাস্যকর অথচ জীবন্ত সংলাপ — হোয়াট, তুমি আমাকে লাইয়র বল? তুমি জাননা আমি তোমাকে এখনই শুট করব। এর পরেই নবকুমারের আর এক হাস্যকর উক্তি-ও আমাকে বাংলা করে বল্লেনা কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্লেনা কেন? তাতে কোন্ শালা রাগত? কিন্তু লাইয়র - একি বরদাস্ত হয়।

টিপ্পনী

একেই বলে সভ্যতার চরিত্র কারা? যারা বলে -

জেন্টেলম্যান, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারস্টিশনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি ....." এই ফ্রী হওয়ার অর্থ মাতলামি করা, বারবণিতাসঙ্গ করা, গুরুজনদের অমান্য করা, আর শিক্ষার নামে সীমাহীন বেহায়াপনায় লিপ্ত হওয়া। এরা বলে, এখানে যার যে খুশী তাই কর, ইন দি নেম অব ফ্রিডম, লেট আস এঞ্জয় আওয়ারসেল্ভ্স্।

মধুসূদন হরকামিনী চরিত্রের মুখ দিয়ে এই প্রহসনের ব্যঞ্জনার্থটি প্রকাশ করেছেন এই ভাবে — 'বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মত সভ্য হয়েছি।..... মদ মাংস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?'

মাইকেল মধুসূদন নিজেও একসময় ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মতই জীবনাচরণে মত্ত হয়েছিলেন। তিনি বাংলা ভাষাকে মনে করতেন 'Fishermen's Language'-এ ভাষা ভদ্র আলাপেরও অযোগ্য। অনেকে মনে করেন, 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে মধুসূদন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেকেই বিদ্রূপাত্মক বাক্যব্যাণে জর্জরিত করেছেন।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ ঃ

এই প্রহসনে মধুসূদন বাংলার গ্রামীণ জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করে সেখানকার এক শ্রেণীর মানুষের নগ্নরূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। লোকচরিত্র সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান এবং লোকভাষার নিখুঁত প্রয়োগ এই প্রহসনটির সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। ভন্ড বৃদ্ধ বৈষ্ণব জমিদার ভক্তপ্রসাদের অসংযত কামাতুরতা, মুসলমান প্রজা হানিফের স্ত্রী ফতেমার আসঙ্গলাভের চেষ্টা এবং পরিশেষে বামাল ধরা পরার পর বাচস্পতি ও হানিফের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা, প্রহার ও অর্থদন্ড ভোগ করে চরিত্রশুদ্ধির অঙ্গীকার রেহাই পাওয়া - এটাই প্রহসনটির বিষয়বস্তু। আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ প্রহসনটির প্রাণশক্তি বা 'Life- blood.' ভক্তপ্রসাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার পর হানিফের একটি আঞ্চলিক ভাষার ব্যঙ্গোক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ

> "ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোনার চাঁদ আপনারা আন্যে দিতি পাত্তাম,
> তা এর জন্যি আপনি এত তজ্দি নেলেন কেন? তোবা! তোবা!"

প্রহসনের মধ্যে চরিত্রশুদ্ধির একটা প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য প্রহসনকারের থাকে- 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের শেষে এসে মধুসূদন তাঁর সেই উদ্দেশ্যকে মোটেই গোপন করেননি-ব্যঙ্গাত্মক কাব্যভাষায় বলেছেন -

> বাইরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধর্মধোয়া।
> পুণ্যখাতায় জমা শূন্য, ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া।

শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম, ফললো ধর্ম, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।

মধুসূদন বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম যুগের নাট্যকার। নাটক, কাব্য-কবিতা সব ক্ষেত্রেই তিনি সর্বপ্রথম আধুনিকতার নান্দীপাঠ করেছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে সাহিত্য-শিল্প এবং সৃজনশীল যা কিছু , তা যদি গতানুগতিকতাকে কাটিয়ে উঠে নব নব সৃষ্টির দিকে চালিত না হয়, তাহলে শিল্পের সৌন্দর্যও ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসে। বাংলা নাট্যক্ষেত্রে মধুসূদন হলেন সেই নাট্যশিল্পী যিনি বাংলা নাটককে নতুন যুগের শিল্প-তীর্থে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

টিপ্পনী

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমকালে বাংলা নাটক রচনা করে যিনি বাংলা নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চজগতে বিপুল সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন, তিনি হলেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং ডাকবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী দীনবন্ধু মিত্র ব্যাপক জীবন-অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। ডাকবিভাগের কর্মচরী হওয়ার সুবাদে তাঁকে বাংলা- বিহার-উড়িষ্যা-আসাম ইত্যাদি প্রদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরতে হয়েছিল। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ -সংস্কৃতি, লোকজীবনের সমস্যা, সাধারণ মানুষের জীবনে ইংরেজ শাসকের শাসনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা রচনা করতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নাট্যরচনাতেই তাঁর শিল্পী-মনের মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যপ্রতিভার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

নাটক ও প্রহসন মিলিয়ে দীনবন্ধুর রচনার সংখ্যা সাত। সেগুলি হল -

নাটক ঃ ১) নীলদর্পণ (১৮৬০), ২) নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), ৩) কমলে কামিনী (১৮৭৩)।

প্রহসন ঃ ১) সধবার একাদশী (১৮৬৬), ২) বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), ৩) লীলাবতী (১৮৬৭), এবং ৪) জামাই বারিক (১৮৭৮)।

নীলদর্পণ ঃ

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'নীলদর্পণ' একটি ঐতিহাসিক নাম - গণজীবনের প্রথম সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল দীনবন্ধুর এই নাটকে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিকের মুদ্রন যন্ত্রে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। প্রথমে এই গ্রন্থমধ্যে নাট্যকারের কোন নাম উল্লিখিত হয়নি, শুধু উল্লিখিত ছিল নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রনীতং। নীলদর্পণ প্রকাশিত হওয়ার এক বছর পরে এর ইংরেজী অনুবাদ 'Nildarpan or the Indigo Planting Mirror' নামে প্রকাশিত হয়। অনূদিত গ্রন্থটির মধ্যে অনুবাদকের নাম ছিলনা, শুধু প্রকাশক হিসাবে জেম্‌স্ লঙের নাম উল্লিখিত হয়েছিল।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে সম্ভবতঃ বাংলাদেশে নীলচাষের সূত্রপাত হয়। এরপর ক্রমে ক্রমে ইংরেজ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে নীলকরসাহেবরা এদেশে এই লাভজনক ব্যবসার ব্যাপক সূত্রপাত করে। নদীয়া, যশোহর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা, হুগলী ইত্যাদি অঞ্চল

টিপ্পনী

নীলচাষের জন্য অত্যন্ত পরিচিতি লাভ করে। রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত না হওয়ায় প্রাকৃতিক নীলের তখন ছিল ভীষণ রমরমা। এই নীলচাষের জন্য নীলকরসাহেবরা কৃষকদের দাদন (অগ্রিম টাকা) দিয়ে উর্বর জমিগুলি চিহ্নিত করত এবং কৃষকদের সেই জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করত। নীলচাষের জন্য জমি প্রস্তুত করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ছিল এবং নীলের পরিচর্যা ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কৃষকেরা নীলচাষে আপত্তি জানালে নীলকুঠিতে নীলকরসাহেবদের দ্বারা নিযুক্ত পেয়াদা ও লাঠিয়ালেরা তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত- গৃহদাহ ছেকে সম্পত্তি লুঠপাঠ, বিনাবিচারে কয়েদ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, এমন কি মেয়েদের উপর চরম অত্যাচার করতে তাঁরা পিছুপা হত না। নীলকুঠির নির্জন কুঠুরিতে শত শত অত্যাচারের ঘটনা সকলের অলক্ষ্যে তখন ঘটে যেত। নীলকর সাহেবদের এই অত্যাচারের বাস্তব বিবরণ দিয়ে উনিশ শতকের বহু পত্র-পত্রিকায় নানান লেখা, সম্পাদকীয় ইত্যাদি প্রকাশিতও হয়েছিল। সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী, সোম-প্রকাশ, হরকরা, হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রভৃতি পত্রিকা এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কোন কোন জায়গায় কৃষকশ্রেণী নীলকরসাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত ঘোষণা করেছিল। যেমন (১৮৫৯ সালে যশোহর ও নদীয়ার গুয়াতেলিতে লক্ষ লক্ষ কৃষকের বিদ্রোহ ঘোষণা), কোথাও পালিত হয়েছিল ধর্মঘট - কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নীলচাষীদের উপর সাহেবদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই চলেছিল। বৃহত্তর বাংলার রাইয়ত সমাজের উপর বর্বর নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিবাদ তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও চোখে-দেখা-ঘটনার (নদীয়ার দিগম্বর বিশ্বাসের পরিবারের ঘটনা, নদীয়ার হরমণি নামে এক কৃষক কন্যার করুণ পরিণাম ইত্যাদি)। নিরিখে নীলদর্পণ নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে এই গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে দীনবন্ধু ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন নীলকর সাহেবদের চরিত্র শুদ্ধি এবং পরোপকার নামক শ্বেত চন্দন - ধারণ করার মানসিকতা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নীলদর্পণের অভিনয় ইংরেজ সরকারের রোষানলকে বহুগুণ বর্ধিত করেছিল এবং এর নাট্যাভিনয় বন্ধ করার যাবতীয় প্রয়াস চালানো হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় নাট্যশালার উদ্বোধন ঘটে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। নবগোপাল মিত্র সেই অভিনয়কে একটি 'historical event' বলে বর্ণনা করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন ঃ দীনবন্ধুর নাটকে সর্বপ্রথম দেশের শাসক-শাসিতের নিগূঢ় সম্পর্ক, দেশের অর্থনৈতিক শোষণের কুৎসিত রূপ, সভ্য নামিক মানুষের বর্বর অন্তর উদ্‌ঘাটিত হইল। 'নীলদর্পণে' সমগ্র দেশের মর্মবেদনার প্রকাশ হওয়ায় দেশে যে সাড়া পড়িল তাহা ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই। দাস প্রথার নিরসনে মার্কিন উপন্যাস -লেখিকা মিসেস হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বীচার স্টোর আংকল্ টম্‌স্ কেবিন যে ভূমিকা পালন করেছিল, নীলচাষ উচ্ছেদে নীলদর্পণের ভূমিকা ততটাই জোরালো ছিল। স্বরপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গোলক বসুর পরিবারের মর্মান্তিক ট্রাজিডি নীলদর্পণ নাটকের বিষয়বস্তু হলেও এই পরিবারটির সঙ্গে অসংখ্য নীলচাষীর দুর্ভাগ্যের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। গোলক বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র 'স্বরপুর বৃকোদর' নবীনমাধবের কৃষকপ্রীতি, পরোপকারী স্বভাব এবং অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কারণে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে বসু পরিবারের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। গোলক বসুর পরিবারকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করার হীন অভিপ্রায় থেকেই বিনা অপরাধে গোলক বসুর কয়েদ সংঘটিত হল এবং আত্মমর্যাদা-সচেতন গোলক বসু এই ঘটনায় তীব্র অপমানের জ্বালায় কারাগারেই উদ্বন্ধনে আত্মঘাতী হলেন। বসু পরিবারের উপর এই প্রথম অভিঘাতের অব্যবহিত পরেই

গোলক বসুর 'পুকুর পাড়ের জমি' নীলচাষের জন্য চিহ্নিত করার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন হল। প্রতিবাদী নবীনমাধব অশৌচ অবস্থাতেই নীলকুঠির লাঠিয়ালদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংর্ঘষে লিপ্ত হলেন। এক অসম সংঘর্ষে নবীনমাধবের প্রাণ অকালে ঝরে পড়ল। নবীনমাধবের মৃত্যু ঐ পরিবারে আরও দুটি মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করল। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সাধুচরণ গোলক বসুকে এই বলে সর্তক করে ছিল যে গতবার তাঁর (গোলক বসুর) ধান গিয়েছে, এবার তাঁর মান যাবে। সাধুচরণের আশংকা মিথ্যা হয়নি।

শুধু বসুপরিবার নয়, এ নাটকে সাধুচরণের সন্তানসম্ভবা কন্যা ক্ষেত্রমণিকেও অকাল মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছে। নীলকর সাহেব রোগ ক্ষেত্রমণির উপর পাশবিক অত্যাচার চালাতে গেলে ক্ষেত্রমণির প্রতিরোধে ক্রুদ্ধ সাহেব ক্ষেত্রমণির পেটে সজোরে পদাঘাত করেছে। নীলকুঠি থেকে আহত ক্ষেত্রমণিকে নবীনমাধব ও তোরাপ শেষপর্যন্ত উদ্ধার করলেও ক্ষেত্রমণির মৃত্যুকে রোধ করা যায় নি।

'নীলদর্পণ' বহুমৃত্যু-সংবলিত বাস্তব জীবনের এক করুণ কাহিনী। নাটকটির পরিকল্পনা ও চিত্রায়নে বাস্তব ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। সে দিক থেকে নাটকটি ঐতিহাসিক প্রতিমও বটে। নাটকটিতে রয়েছে দুটি শ্রেণীর চরিত্র-ভদ্র চরিত্র ও ভদ্রেতর চরিত্র। ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত চরিত্রাংকনে দীনবন্ধু এই নাটকে প্রায় ব্যর্থ - এই ব্যর্থতা মূলতঃ চরিত্রগুলির মুখে সংযোজিত সংস্কৃতনির্ভর সাধুগদ্যরীতির কৃত্রিম সংলাপের জন্য। কিন্তু ভদ্রেতর শ্রেণীর ভাষা-নির্মাণে দীনবন্ধুর সাফল্য অবিসংবাদিত। ভদ্রেতর চরিত্রগুলির ভাষা বিশেষতঃ তোরাপের মুখের ভাষা সবসময় শালীনতা বজায় রাখেনি, সে ভাষা আপাতবিচারে অশ্লীলও বটে, কিন্তু চরিত্রের স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে হলে চরিত্রের মুখের ভাষাও অবিকল অনুসরণ করতে হবে - বাস্তবতার এই নীতিতেই দীনবন্ধু বিশ্বাসী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও দীনবন্ধুর এই স্বভাববৈশিষ্ট্যের কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। ভাষার শ্লীলতা-অশ্লীলতাকে যদি দীনবন্ধু অযথা প্রাধান্য দিতেন তাহলে আমরা ''ছেঁরা তোরাপ,কাটা আদুরী ও ভাঙা নিমচাঁদ পাইতাম''। (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

নীলদর্পণকে ট্রাজিডি নাটক বলা হয়-কিন্তু ট্রাজিডি নাটকের শিল্প-সমন্নতি 'নীলদর্পণে' নেই। এখানকার কাহিনী জমাটবদ্ধ নয়, চরিত্রের বিকাশশীলতা, সক্রিয়তা, পুরুষকার শক্তি ইত্যাদি 'Somthing higher than the common level' হয়ে ওঠেনি সর্বত্র। সবচেয়ে বড় কথা, এই নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব দুই অসম শক্তির মধ্যে—ফলে এখানকার কারুণ্য, বিষাদ ও দুঃখ বিপর্যয়কে দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার বলেই মনে হয়। 'নীলদর্পণ' মৃত্যুর মহামিছিল আছে, দুঃখ ও কারুণ্যও আছে কিন্তু সেই দুঃখ বা বিষাদ ট্র্যাজিডিসুলভ নয়। তাই বলা যেতে পারে নীলদর্পণ নিঃসন্দেহে Pathetic কিন্তু Tragic নয়।

নবীনতপস্বিনী ঃ

দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীনতপস্বিনী' খুব একটা উল্লেখযোগ্য নাটক নয়। নাটকটি অনেকটা রূপকধর্মী। এখানকার চরিত্রচিত্রণ গতানুগতিক, নাট্যসংলাপও জীবন্ত নয়। নাটকটিতে একটি সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের মহীষীর জীবনের আকস্মিক বিপর্যয়, সংসারত্যাগ ও ভবিষ্যতে জ্যেষ্ঠা মহীষীর সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতা হওয়ার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। নাটকটির ঘটনা-সংস্থাপনে শেক্স্পীয়রের 'Merry Wives of Windsor'- এর অল্পবিস্তর প্রভাব আছে।

প্রথাগত নাটকের মধ্যে দীনবন্ধুর সর্বশেষ নাটক হল কমলেকামিনী (১৮৭৩)। এই নাটকটি

টিপ্পনী

রচনাকালে দীনবন্ধুর নাট্য প্রতিভা প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ইতিহাসের একটা ক্ষীণছায়া নাটকটির মধ্যে লক্ষিত হবে। নাট্যকাহিনীর মূল বৈশিষ্ট্য হল রোম্যান্টিক প্রেম-ভাবনা।

সমাজ-সমস্যার আধারে কৌলীন্য প্রথা ও পারিবারিক বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে লিখিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের একদা জনপ্রিয় কমেডি নাটক 'লীলাবতী' দীনবন্ধু মিত্র ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই নাটকে তিনি ইংরেজী রোমান্স ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্যধর্মী নাটকের নায়ক-নায়িকা চরিত্রের ক্রিয়াকলাপের ভাবটি গ্রহণ করেছেন। নাটকটির মধ্যে যথেষ্ট নাট্যগুন ও ঘটনার গতিবেগ আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনের কাহিনী ব্যতীত দীনবন্ধু যেখানেই রোম্যান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়েছেন, সেখানেই তিনি চরিত্র,ঘটনা বা সংলাপ সৃষ্টিতে স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পারেননি।

টিপ্পনী

দীনবন্ধুর 'বিয়েপাগলা বুড়ো' প্রহসনটির কাহিনীর সঙ্গে মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির অনেক সাদৃশ্য আছে। এই প্রহসনের বৃদ্ধ, কামাতুর, ও তরুণীভার্যা-লোভী কৃপণ রাজীবলোচনের সঙ্গে মধুসূদনের প্রহসনের ভক্তপ্রসাদের মিলটি লক্ষণীয়। দীনবন্ধুর প্রহসনেও রাজীবলোচন তাঁর বিবাহকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়েছেন এবং পর্যাপ্ত শাস্তিভোগ করেছেন। এখানে রাজীবলোচনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ধরণটি কৌতুককর। প্রহসন হিসাবে দীনবন্ধুর বিয়ে পাগলা বুড়ো একটি সার্থক সৃষ্টি। ডঃ অজিতকুমার ঘোষের মতে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নিখুঁত হাস্যরসপ্রধান প্রহসন হিসাবে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। ..... হাস্যরসের অনর্গল ধারায় প্রহসনখানা আগাগোড়া স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া রাখা হইয়াছে। দীনবন্ধু মিত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রহসনধর্মী নাটক হল 'সধবার একাদশী'। প্রহসনটির নামকরণের মধ্যেই একটি তির্যক অর্থব্যঞ্জনা আছে। প্রহসনটি তিন অঙ্কবিশিষ্ট। প্রহসনের নায়ক-চরিত্র অটল হলেও নিমচাঁদ এর মধ্যমণি। নিমচাঁদ এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব—সে শিক্ষিত, অভিজাত-স্বভাব, প্রখর সংস্কৃতিবোধসম্পন্ন। ধী-শক্তি তাঁর তীক্ষ্ণ, বাগ্মিতা, পান্ডিত্য তাঁর স্বভাবগত- কিন্তু সে মদ্যাসক্ত, স্বভাব আচরণে তার উচ্ছৃঙ্খলতা। পাশ্চাত্য জীবনচর্যা ও সভ্যতার এক দুরপনেয় মায়াজাল তখন বঙ্গীয় যুবসম্প্রদায়কে সম্মোহিত করে রেখেছিল- নিমচাঁদেরা সেই প্রজন্মের 'মূঢ় সন্তান'। নিমচাঁদ মাতাল, সে মদ খায়, 'সেই মদ পাশ্চাত্য-সভ্যতার মদ'। অনেকে মনে করেন ইংরেজী সভ্যতাভিমানী মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সামনে রেখে দীনবন্ধু নিমচাঁদ চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন। পরিহাসপ্রিয় দীনবন্ধু নাকি এ-সর্ম্পকে মন্তব্য করেছিলেন- 'নিম কি কখনো মধু হয়?' নিমচাঁদকে বাদ দিলে এই প্রহসনের রাম-মাণিক্য, ভোলা কাঞ্চন, ঘটিরাম ডেপুটি প্রভৃতি চরিত্র স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তবে প্রহসনটির বিরুদ্ধে অনেকে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দির সমাজে ধনী-ব্যক্তিদের বাড়িতে ঘর-জামাই রাখার একটা প্রথা ছিল। জামাই বারিক সেই অর্থে হল জামাই-ব্যারাক। এই ঘর জামাইয়েরা অলস, অকর্মণ্য, নেশাখোর এবং বিকৃতরুচি ও অশ্লীল গ্রন্থের পাঠক। স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে তাদের শাশুড়ির অনুমতি নিতে হয়। এই জামাইদের মধ্যে অভয়কুমার কিছুটা আত্মমর্যাদাসচেতন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সব ঘর-জামাই কোন-না-কোন কারণে বিরক্ত হয়ে উঠেছে, গৃহত্যাগ করেছে এবং প্রহসনের শেষে একটা মিলনাত্মক পরিবেশে সৃষ্টি করেছে। 'জামাই বারিক' প্রহসনের দুটি কাহিনী পদ্মলোচন ও অভয় কুমারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবং প্রহসনের চতুর্থ অঙ্কে এসে দুটি কাহিনী পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। প্রহসন হিসাবে জামাই বারিক' সফলতার দাবী রাখে। এখানকার চরিত্র ও সংলাপ প্রহসনোপযোগী।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের অবদান উল্লেখ করার মত। মাইকেল মধুসূদন দত্তের

পরে দীনবন্ধু মিত্র যথার্থ অর্থেই একজন বাস্তবধর্মী নাট্যশিল্পী। পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকার ফলে তিনি বাংলা নাটক ও প্রহসনকে একটি সম্মানজনক আসনে উন্নীত করতে পেরেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা পরবর্তীকালের নাট্যসাহিত্যের পথ-চলায় তিনি একটি স্থায়ী অবদান রাখতেও সমর্থ হয়েছেন।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুধাবিভক্ত সাহিত্যপ্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর কবিসত্তাকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন। তাঁর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, চিঠিপত্র সর্বত্রই রয়েছে কবিত্বের ব্যঞ্জনা। ফলতঃ অনেকক্ষেত্রে কবিত্বের সঙ্গে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যন্ত নামতে হয়েছে। 'রাজা ও রাণী' নাটক লিখে তাই তাঁকে বলতে হয় 'লিরিকের জলাভূমি'- পুনর্নির্মাণ করতে হয় 'রাজা ও রাণী'কে। রবীন্দ্র-অনুরাগী সমালোচক Thomson রবীন্দ্রনাথের নাট্য-আলোচনাপ্রসঙ্গে একদা বলেছিলেন 'Tagore's dramas are the vehicles of ideas rather than the expression of action.' কবিসত্তা নিয়ন্ত্রণী শক্তি হয়ে ওঠায় রবীন্দ্র-নাটকে বাহ্যসংঘাত, চরিত্রের ক্রিয়ামুখ্যতা, সক্রিয়তা, বস্তুধর্মিতা ইত্যাদি অপেক্ষা একটা অন্তর্লীন ভাবের অতিমাত্রিক প্রবাহ, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার একথাও সত্য, নাটক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গভীর ভাবনাচিন্তা, বিষয়ব্যাপ্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচিত্র ধরণের নাট্য-আঙ্গিক নিয়ে অনুশীলন করা; এমন কি নাট্যাভিনয়, মঞ্চচিন্তা বিষয়েও তাঁর গভীর প্রজ্ঞা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর সংস্কৃতিমনস্ক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। অতিশৈশব থেকেই তিনি এখানে সংস্কৃতির বহুমুখী ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। দেশ-বিদেশের সঙ্গীত, নাটক-চিত্রকলা থেকে শুরু করে দেশীয় পুরাতনী ঐতিহ্য, যাত্রাপালা, নাট্যাভিনয় ইত্যাদির প্রতি তাঁর অমোঘ আকর্ষণ জন্মেছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত নাট্যসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক এবং নাট্যশিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগবশতঃ।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের বৈচিত্র্য বহুবিধ—সেই বৈচিত্র্য বিষয়বস্তুগত, আঙ্গিকগত, এবং ভাষাগত। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ঃ

১) নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য

২) নিয়মানুগ নাটক

৩) রঙ্গনাট্য

৪) রূপক ও সাংকেতিক নাটক

কিন্তু রবীন্দ্রনাটকের আরও দুটি শ্রেণী বিভাজন প্রয়োজন-

একটি গীতি নাট্য
দ্বিতীয়টি নৃত্যনাট্য।

টিপ্পনী

কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য ঃ

কাব্যনাট্য হল কাব্যাকারে নাটক অর্থাৎ এখানে কাব্যগুণ বেশী। আর নাট্যকাব্য হল নাটকাকারে কাব্য অর্থাৎ এই শ্রেণীর রচনায় নাট্যগুণের আধিক্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য গুলি হল ঃ

ভগ্নহৃদয় (১৮৮১), রুদ্রচন্ড (১৮৮১), প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), বিদায় অভিশাপ (১৩০১ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৪খ্রীঃ), গান্ধারীর আবেদন (১৩০৫ বঙ্গাব্দ,১৮৯৮ খ্রীঃ), সতী (১৩০৪ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৭ খ্রীঃ), নরকবাস (১৮৯৭), কর্ণকুন্তীসংবাদ (১৮৯৯), লক্ষ্মীর পরীক্ষা (১৮৯৭)। ভগ্নহৃদয় ঃ রবীন্দ্রনাথ ভগ্নহৃদয়কে নাটক না বলে নাটকাকারে কাব্য বলে অভিহিত করেছেন। ত্রিপুরাধিপতি রবীন্দ্র মানিক্যের স্ত্রী ভানুমতীর আত্মহত্যা এবং তজ্জনিত কারণে রাজার হৃদয়ের শোক-কারুণ্য ও শেষতঃ শান্তিলাভের ঘটনা মোট চৌত্রিশটি সঙ্গে বিন্যস্ত হয়েছে।

রুদ্রচণ্ড ঃ সংগীত এবং সংলাপের মিশ্ররীতিতে 'রুদ্রচণ্ড' রচিত হয়েছে। রচনাটি কারও কারও মতে গীতিনাট্য পদবাচ্য।

প্রকৃতির প্রতিশোধ ঃ রচনাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ঃ 'এই আমার হাতে প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়, এই বইটি কাব্যে ও নাট্যে মিলিত। প্রকৃতিবিমুখতা, অনাসক্তি বা বৈরাগ্য মানবমুক্তির পথ নয়, প্রেমের মধ্যেই মানবপ্রাণের সার্থকতা- এই মর্মবাণীই রচনাটির মধ্যে বিবৃত হয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা ঃ 'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্রনাথের এক অনন্য সৃষ্টি। মহাভারত থেকে এর কাহিনী সংগৃহীত হলেও সৃষ্টির মৌলিকতায় রচনাটির অভিনবত্ব অসাধারণ। কুরূপা মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার প্রণয় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তৃতীয় পান্ডব অর্জুন। প্রেমের দেবতা মদনের বরে বৎসরকালের জন্য অনিন্দ্যসুন্দর রূপ ও যৌবনলাবণ্য নিয়ে চিত্রাঙ্গদা যখন অর্জুন-সান্নিধ্যে এলেন, অর্জুন তখন তাঁর কাছে ধরা দিলেন। বৎসরকালের প্রেম-রভস যখন অতিক্রান্তপ্রায়, চিত্রাঙ্গদার মনে হল প্রকৃত চিত্রাঙ্গদা লাবণ্যময়ী চিত্রাঙ্গদার কাছে হার মেনেছে। আত্মগ্লানি জন্মাল তাঁর মনে। সত্যপরিচয় উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সময় আসন্ন জেনে চিত্রাঙ্গদার মনপ্রাণ তখন দ্বন্দ্ব-বিক্ষত। সেই দ্বন্দ্ব- উত্তীর্ণ হয়ে শেষ পযর্ন্ত তাঁর প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন - কিন্তু অর্জুন তখন চিত্রাঙ্গদার প্রেমে অভিভূত, সানন্দে তিনি বরণ করে নিলেন চিত্রাঙ্গদাকে। চিত্রাঙ্গদা তখন সন্তান- সম্ভবা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, বসন্তের মহিমা তার ফোটা-ফুলের সৌন্দর্যে নয়, সেই সৌন্দর্য তার ফলসম্ভারে। আসন্নমাতৃত্ব চিত্রাঙ্গদার সৌন্দর্য সেই অর্থেরই দ্যোতক।

বিদায় অভিশাপ ঃ এর কাহিনী অংশও মহাভারত থেকে আহৃত। বৃহস্পতির পুত্র কচ স্বর্গ থেকে মর্ত্যে দৈত্যগুরু শুক্রচার্যের কাছে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করতে এসেছিলেন। শুক্রচার্যের কন্যা দেবযানী কচের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে প্রেমবন্ধনে বাঁধতে চাইলেন। কিন্তু কচ নিজ কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে দেবযানীর আহ্বানে সাড়া দিলেন না। স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের দিনে প্রেম-প্রত্যাখ্যাতা দেবযানী কচকে অভিশাপ দিলেন কচ তাঁর অধীত বিদ্যা অন্যকে শেখাতে পারবেন কিন্তু নিজে প্রয়োগ করতে পারবেন না। উদার ও শুদ্ধচিত্ত কচ হাসিমুখে দেবযানীর অভিশাপ শিরোধার্য করলেন, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বললেন -

গান্ধারীর আবেদন ঃ চরিত্র ও বহির্ঘটনা মহাভারত থেকে গৃহীত, কিন্তু কাব্যনাট্যটির ছত্রে ছত্রে রবীন্দ্রনাথের অভিনব ভাষ্য পরিস্ফুটিত হয়েছে। পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণের বিপরীতে দুর্যোধনজননী গান্ধারীর প্রবল ধর্মবোধ যে মানবিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে, আলোচ্য নাট্যকাব্যের সৌন্দর্য সেখানেই নিহিত। গান্ধারী পুত্রস্নেহশূন্য নন, কিন্তু স্নেহের অতিশয্যে অন্যায় ও অধর্মকে অন্তরাল করতেও একান্ত অনিচ্ছুক। গান্ধারী রূঢ় চরিত্রবিশিষ্টা নন - ন্যায়শক্তির অপার্থিব তেজে উদ্ভাসিতা।

'সতী' এবং 'নরকবাস' নাট্যকাব্যের ক্যহিনী যথাক্রমে মারাঠী গাথা ও পুরাণ থেকে গৃহীত হয়েছে। প্রথমটিতে বিভিন্ন চরিত্রে সংস্কার ও সমাজধর্মের দ্বন্দ্ব এবং দ্বিতীয়টিতে সত্যধর্মের মর্যাদা রক্ষার স্বভাবনিষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা একটি অভিনয়যোগ্য নাট্যকাব্য। নারীচরিত্রনির্ভর এই নাট্যকাব্যটি হাস্যরসাত্মক। এখানকার ঘটনা একান্তই স্বপ্ননির্ভর।

শিল্পোৎকর্ষের বিচারে রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তী সংবাদ একটি অপূর্ব রচনা। মহাভারত থেকে এর বিষয়বস্তু গৃহীত হলেও রবীন্দ্রনাথ রচনাটির মধ্যে নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার জন্য স্থান-কাল ও বিষয়বস্তুর সুবিধামতন পরিবর্তন করে নিয়েছেন। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে কর্ণার্জুনের ভয়াবহ সংগ্রামের পূর্বদিন সন্ধ্যাসবিতার বন্দনায় রত কর্ণের কাছে 'অর্জুন জননী' কুন্তী কর্ণের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন। কিন্তু পরিচয় উদ্‌ঘাটনের পরিস্থিতি রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে নাটকীয়তা, নাট্যোৎকণ্ঠা ও অপূর্ব শিল্পকৌশল অবলম্বন করেছেন, তা মহাভারতীয় ঘটনার শিল্পোৎকণ্ঠাকে বহুদূর অতিক্রম করে গিয়েছে। ভাগ্যহত কর্ণ, রাধাগর্ভজাত সুতপুত্ররূপে পরিচিত কর্ণ, অভিশপ্ত জীবনের অধিকারী কর্ণ এবং জন্মমুহূর্তে মাতৃ-পরিত্যক্ত কর্ণ এক দুরপনের আত্মাভিমান, মনোকষ্ট ও আশাভঙ্গের বেদনায় মাতৃসকাশে উন্মোচিত করে দিয়েছে তার জীবনের অনেক অকথিত বাণী। মাতা কুন্তীকে চোখের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখেও, জ্যেষ্ঠ পান্ডবের গৌরবপ্রাপ্তির আশ্বাসে আশ্বাসিত হয়েও শেষ পর্যন্ত, ধর্ম, কর্তব্য, ন্যায়পরায়ণতা ও বন্ধু দুর্যোধনের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ না করতে পারার সুগঠিত যুক্তিতে কুন্তীর আহ্বানকে উপেক্ষা করেছে - কিন্তু সেই উপেক্ষার মধ্যে সৌজন্যবোধের অভাব নেই, রূঢ়তা বা কার্কশ্য নেই, আছে 'ধর্ম' ও 'পৌরুষ' ব্যতীত আর সবকিছুই কুন্তীর চরণপ্রান্তে নিবেদন করার সর্বৈব আশ্বাস। ভাগ্যহত ও দৈবপীড়িত কুন্তীর কানীনপুত্র কর্ণ শেষ পর্যন্ত কুন্তীকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছে এই ভাষায় -

'যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যক্রিতে মোরে করো না আহ্বান।'

আর নিজের জীবনাদর্শগত অবস্থানকে স্পষ্ট করে দিয়ে অন্তিম সংলাপে মাতৃ-আশীর্বাদ ভিক্ষা করে উচ্চারণ করেছে -

'জয়লোভে, যশোলোভে, রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।'

শুধু কর্ণ নয়, এই নাট্যকাব্যে মহাভারতের কুন্তীকে শতযোজন পিছনে ফেলে রবীন্দ্রনাথের কুন্তী এক চরম অপরাধবোধ, আত্মানুশোচনা ও মর্ম-নিঙরানো রক্তাক্ত বেদনাবোধে প্রতি মুহূর্তে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছেন, পুত্রের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে চিরন্তন মাতৃধর্মকে

টিপ্পনী

কলঙ্কিত করার পাপবোধে জর্জরিত হয়েছেন। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের এই দুর্লভ শিল্পবৈশিষ্ট্যে 'কর্ণকুন্তী' সংবাদ অনন্য সৃষ্টির মর্যাদা পেতে পারে।

প্রথাধর্মী বা নিয়মানুগ নাটক ঃ

টিপ্পনী

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে থেকে বাংলায় গ্রীক ও শেক্স্পীয়রীয় আদর্শে নাটক রচনা করার সূত্রপাত হয়। এই নাটকগুলি সাধারণত ঃ পঞ্চাঙ্ক সমন্বিত। কাহিনীর আদি মধ্য ও অন্ত—মূলত এই ত্রিস্তরীয় বিভাজন এই শ্রেণীর নাটকগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি শ্রেণীর নাটক দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত নাট্যরীতিকে মেনে রচিত হয়েছে। ঐতিহ্যানুসারী বলে এইগুলিকে Traditional Drama ও বলা হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথমাধর্মী নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), মালিনী (১৮৯৬), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), মুকুট (১৯০৮), বাঁশরী (১৯৩৩)।

রাজা ও রাণী পঞ্চাঙ্ক সমন্বিত প্রথাধর্মী ট্রাজিডি নাটক। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই নাটকটিকে লিরিকরসপ্রধান রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে নাটকটর দোষ-ত্রুটিগুলি নির্ণয় করে তিনি 'তপতী' নামে একটি নুতন নাটক রচনা করেন। জলন্ধরের রাজা বিক্রমদেবের রাজকর্তব্যবিমুখ ভোগসর্বস্ব জীবনাদর্শের সঙ্গে শুদ্ধ প্রেম-চেতনায় উদ্বোধিত ও কর্তব্য সচেতন রাণী সুমিত্রার প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে রাজার অহংসর্বস্ব আত্মধ্বংসী ক্রিয়াকলাপে নাট্যকাহিনীতে সৃষ্ট হয়েছে বীভৎস ও করুণরসের প্রাবল্য। এই নাটকে মূল কাহিনীর পাশাপাশি কুমারসেন ও ইলার একটি উপকাহিনীও যুক্ত হয়েছে - যে উপকাহিনীটি রাজা বিক্রমের তীব্র অহংবোধ, ভোগবাদী প্রেম, মোহগ্রস্ততা ও আগ্রাসনী মনোভাবের মূলে কঠোর কুঠারাঘাত করে আত্মচৈতন্যের উদ্বোধনে সহায়তা করেছে। এই আত্মচৈতন্যের উদ্বোধনে চুকিয়ে দিতে হয়েছে চরম মূল্য - কুমারসেন ও রাণীসুমিত্রার মৃত্যুর তিনি অসহায় দর্শক। ট্রাজিডি হিসাবে 'রাজা ও রাণী' খুব একটা উচ্চ মানকে স্পর্শ করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথও এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য - "অনেকদিন ধরে রাজা ও রাণীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। ..... তখনই স্থির করে ছিলাম এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর স্দগতি হতে পারে না।" এই নতুন নাটক হল গদ্যে-লেখা 'তপতী'। 'তপতী' নাটকে কুমারসেন ও ইলার কাহিনীটিকে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন।

ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সেই 'রাজর্ষি' উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয় 'বিসর্জন' নাটকটি। পশুবলির মত যুগজীর্ণ একটি নিষ্ঠুর প্রথার সঙ্গে প্রাণধর্ম ও জীবনবাদের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় প্রাণের বিনিময়ে বিবেকবোধের জগরণের মাধ্যমে প্রাণধর্মের প্রতিষ্ঠাই এই নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। এই নাটকে রাজা গোবিন্দমাণিক্য হলেন প্রাণধর্মের পৃষ্ঠপোষক আর রাজপুরোহিত রঘুপতি হলেন প্রাচীন শাস্ত্র-সংস্কার ও প্রথার দৃঢ় সমর্থক। দেবীর মন্দিরে একটি ছাগশিশুর বলিদানকে কেন্দ্র করে গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে যে প্রেমধর্মের উৎসার, সেই প্রেমধর্মই রাজাকে পরিচালিত করেছিল রাজ্যে বলিদান প্রথাকে নিষিদ্ধ করতে। এই ঘটনার সূত্র ধরেই রঘুপতির উন্মত্ত উত্থান, রাজার সঙ্গে বিরোধ, ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার, ঘটনার নানা ঘাত-সংঘাত এবং শেষ পযর্ন্ত রঘুপতির পালিতপুত্র প্রাণপ্রিয় জয়সিংহের আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে প্রাণবিরোধী রঘুপতির প্রাণের মূল্য

অনুধাবন এবং বালিকা অপর্ণার মধ্যে বিশ্বমাতৃত্ব উপলব্ধি ও পরিণামে গোমতীগর্ভে দেবীমূর্তি বিসর্জনের ঘটনা ঘটেছে। এই নাটকে দেবীপ্রতিমা বিসর্জিত হয়েছে সত্য, কিন্তু রঘুপতির হৃদয় থেকে ভ্রান্ত সংস্কার ও প্রাণবিবিক্ত ঈশ্বর ভক্তির যে সংকীর্ণতা, তার বিসর্জনই এই নাটকের নামকরণকে সার্থক করে তুলেছে। বিসর্জন অত্যন্ত মঞ্চসফল নাটক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় পর্যন্ত করেছিলেন। এই নাটকের পরিণামে ট্রাজিক সংবিদ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ প্রাণধর্ম উপলব্ধির মাহাত্ম্যকেই পরম প্রাপ্তি বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটি বৌদ্ধ অবদানগ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের কাহিনীবস্তু সংগৃহীত হয়েছে। এটি একটি ট্রাজিডি নাটক। নাটকের কাহিনী, সংলাপ ও পরিমিতিবোধ অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। শিল্পরূপের বিচারে এই নাটকটিকে কেউ কেউ বিসর্জন অপেক্ষাও উচ্চমানের বলে থাকেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মেরে বিরোধের পটভূমিকায় এখানে কাহিনীদ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে। 'মালিনী' এই নাটকে সংস্কারের ঊর্ধ্বে প্রেমধর্মকে বড় বলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। ক্ষেমঙ্কর হলেন এই ব্যাপারে মালিনীর বিরোধী পক্ষ।

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি তার 'বউঠাকুরণীর হাট' এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটির কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। এই নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী একটি প্রতীকী চরিত্র। পরবর্তীকালে এই নাটকটি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন পরিত্রান নাটকটি- সেখানেও ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রটি উপস্থিত আছে। দুটি নাটকে শক্তি-উন্মত্ততার বিরুদ্ধে সাধরণ মানুষের যন্ত্রণা মুক্তির একটা পথনির্দেশের চেষ্টা পরিলক্ষিত হবে যা সমকালীন দেশীয় রাজনৈতিক অবস্থার সমার্থকবাহী।

কৌতুকনাট্য বা রঙ্গনাট্য ঃ

'গোড়ায় গলদ'-(১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), হাস্যকৌতুক (১৯০৭), ব্যঙ্গ কৌতুক (১৯০৭), চিরকুমার সভা-(১৯২৬)।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে-সমস্ত নাট্যকার যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রমুখ কৌতুকনাট্য রচনা করেছেন তাঁদের রচনায় সামাজিক সমস্যা বা ব্যক্তি চরিত্রের যে সমস্ত রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে ব্যঙ্গ-প্রবণতাই মুখ্য। তবে সেইগুলির কোন কোনটিতে যে wit বা humour-এর উদ্ভাসন লক্ষ্য করা যায় সেটিও সত্য ঘটনা। রবীন্দ্রনাথই প্রথম কৌতুকনাট্য প্রণেতা যাঁর রচনায় বিশুদ্ধ বা অনাবিল হাস্যরসের পরিস্ফুটন ঘটেছে। এ সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন ঃ

> 'স্ফূর্তির হিল্লোলে ভরা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে মনোরম, নানা ভ্রান্তি, কৌতুককর ঘটনা ও খেয়ালী চরিত্রের সমাবেশে অফুরন্ত হাসির নির্ঝর এই নাটকগুলি আমাদের মনে একটি অবিমিশ্র হর্ষলোকের সৃষ্টি করেছে।'

রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' এক বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক রচনা। গোড়ায় গলদ মানে শুরুতেই ভুল। একজনকে অন্যজন বলে ভুল করা- ঘটনাগত এই অসঙ্গতির জেরেই এই কৌতুকনাটকে হাস্যরসের সূচনা হয়েছে। ইন্দুমতীকে নিমাইয়ের কাদম্বিনী বলে ভুল করা, আর ইন্দুমতীর নিমাইকে ললিত বলে মনে করা- এই আপাতভ্রান্তি, কৌতুকময়তা ও পরিণামে ভুল সংশোধনের মাধ্যমে নিমাই ও ইন্দুমতীর মিলনের মধ্য দিয়ে পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট এই নাটকটির পরিণাম নির্দিষ্ট হয়েছে। অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তির জন্য নাটকটি অনেক সময় অবাস্তবতা দোষেও দুষ্ট হয়েছে।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই দোষত্রুটিগুলি সংশোধন করে শেষরক্ষা নাটকটি রচনা করেন। করুণ এবং হাস্যমধুর রসের দ্বৈত প্রবাহে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। তিনটি মত্র দৃশ্যে এই লঘু নাটিকাটি রচিত।

'চিরকুমার সভা' রবীন্দ্রনাথের একটি অতিপ্রশংসিত কৌতুকনাট্য। চিরকুমার সভার সদস্যদের চিরকৌমার্যব্রত গ্রহণের যে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তা নারী জীবনের সংস্পর্শে এসে কেমন করে তাসের ঘরের মতো চুরমার হয়ে গেল তারই এক কৌতুকমন্ডিত নাট্যরূপ হল 'চিরকুমার সভা'।

টিপ্পনী

কতকগুলি ক্ষুদ্র কৌতুককর রচনা যেমন - রোগীর বন্ধু, খ্যাতির বিড়ম্বনা, একান্নবর্তী, গুরুবাক্য ইত্যাদি নিয়ে রচিত 'হাস্য কৌতুক' সংকলনটি। অন্যদিকে 'স্বর্গীয় প্রহসন' ও 'বশীকরণ' এই দুটি নাট্যের সংকলন হল 'ব্যঙ্গকৌতুক'। এদের হাস্যরস শিশুমনের উপযোগী।

রূপক - সাংকেতিক নাটক ঃ

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিকে কেউ কেউ তত্ত্বপ্রধান নাটক বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই রূপ নামকরণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের ঐ নাটকগুলির নিগূঢ় তাৎপর্য ও অভিনব শিল্পশৈলী স্পষ্টীকৃত হয় না।

সংস্কৃত সাহিত্য ও নাটকে রূপক শিল্পধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে রূপক ও সংকেতধর্মিতাকে জীবনের অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা, অব্যাখ্যাত সত্যের আভাসপ্রদান এবং ভাষাতীত ও নৈর্ব্যক্তিকবোধের রহস্যঘন তাৎপর্যকে ইঙ্গিতবহ করে তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়।

রূপকের উদ্দেশ্য রূপা দান করা - কোন বস্তু বা ভাবের আশ্রয়ে অস্পষ্টতাকে স্পষ্টতা দেওয়া। অন্যদিকে কোন বিমূর্ত আইডিয়াকে সংকেতের রহস্যময়তায় রহস্যঘন করে তোলে সাংকেতিক সাহিত্য। কবি ইয়েট্‌স্ বলেছেন -

> "A symbol is indeed the possible expression of some invisible es sence, transparent lamp about a spiritual flame while allegory is one of many possible representatives of an embod-ied thing or fa miliar principle and belongs to fancy and not to imagination, the one is a revelation, the other an amusement."

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শান্তি ও সত্যকামী মানুষদের বিশ্বাসে একটা বিরাট ফাটলের সৃষ্টি করেছিল। স্বার্থ-লোভ ও ক্ষমতার দম্ভ মানবজাতিকে উপনীত করেছিল এক ঘোরতর সংকটের সামনে। পাশ্চাত্য কাব্য-কবিতা-নাটকে সেই ধ্বংস, নৈরাশ্য ও অবক্ষয়ের চিত্র আঁকা হতে লাগল আধুনিক চিত্রকল্প ও সংকেতসহায়তায়। নাট্য ক্ষেত্রে এল সেই সংকেতধর্মিতা। মেটারলিঙ্ক, হাউপ্টম্যান, স্ট্রিন্ডবার্গ প্রমুখ নাট্যকার রূপক - সংকেতের দ্বারাই যুগের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধক। সমকালীন পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থান, জড়বাদী ধারণার ক্রমঃ প্রসারণ ও আধাত্মিক ভাবনার ভূলুণ্ঠন - রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করল সাংঘাতিক ভাবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেহেতু আশাবাদী, আনন্দরূপ অমৃতের অনুসন্ধানী, সে জন্য তিনি তাঁর রূপক-সাংকেতিক আঙ্গিকের নতুন নাটকগুলিতে পাশ্চাত্য নাট্যকারদের মতো নৈরাশ্য, অবক্ষয় ও বিশ্বাসহীনতার চিত্র অঙ্কন করতে পারলেন না - ধ্বংসের

মহাশ্মশানের বুকেও দেখলেন সৃষ্টির অনাগত মহিমা।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকসমূহের সবগুলিই সমসাময়িক সমস্যার আধারে রচিত নয়, সমকালীন পৃথিবীর সংবাদ ব্যতীতও রবীন্দ্রনাথ জীবনের নানা সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিচিত্র পালাবদলের ব্যঞ্জনায় জীবনের স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা এই শ্রেণীর নাটকগুলির মাধ্যমে করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক বলতে আমরা যেগুলিকে নির্দেশ করেছি, সেই নাটকগুলিকে কেউ কেউ 'তত্ত্বমূলক' নাটক বলেও অভিহিত করেছেন। অবশ্য তত্ত্বমূলক নাট্য-অভিধার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির গভীর শিল্পসত্যকে অনুধাবন করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাট্যধারায় কোন বিশেষ ঋতু বা ঋতুচক্রেরও একটা স্পষ্ট ভূমিকা আছে - এই ধরণের নাটকগুলিকে ঋতুনাট্যেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সুতরাং পর্যায় সংখ্যা না বাড়িয়ে এই নতুন আঙ্গিকের সম্মিলিত নাটককেই আমরা রূপক-সাংকেতিক শ্রেণীর নাটকের অন্তর্ভূক্ত করতে চাই।

টিপ্পনী

এই শ্রেণীর নাটকগুলি হল ঃ শারদোৎসব (১৯০৮), রাজা (১৯০৮), অচলায়তন (১৯১০), ডাকঘর (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৪), কালের যাত্রা (১৯৩২)।

এছাড়া 'অচলায়তন'-এর পুনর্লিখিত 'রূপ গুরু' (১৯১৮), 'অরুপ রতন' হল (১৯১৯) রাজা নাটকের পুনলিখিত রুপ এবং 'কালের যাত্রায়' প্রকাশিত রথের রাশি' (১৯৩২)।

রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসব' রচনাটিকে কেউ কেউ রূপক-সাংকেতিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি। প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের মিলনে বিশ্বাত্মবোধের জাগরণ ঘটে - "এই সত্যের পটভূমিকায় শরৎঋতুর অনুষঙ্গে দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণশোধ" করার কথা শারদোৎসবে বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকের ঠাকুরদাদা চরিত্রটি নাট্যঘটনায় একটি পৃথক মাত্রা যোগ করেছে।

খেয়া - গীতাঞ্জলি পর্বে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নবজাগ্রত অধ্যাত্মচেতনার যে প্রকাশ, রাজা নাটকে সেই অধ্যাত্মচেতনারই একটি বিশিষ্ট রূপ প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটির মধ্যে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব বা দর্শনের দাস্যভাব, সখ্যভাব ও মধুরভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় যথাক্রমে সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা ও রাণী সুদর্শনার মধ্যে। 'রাজা' নাটকের কাহিনীর অন্তরালে বৌদ্ধগ্রন্থ কুশজাতক-এ উল্লিখিত কুরূপ রজার প্রসঙ্গটি আছে। মানুষ রূপতৃষ্ণায় কাতর, রূপজগতের মধ্যেই সে জীবনের চরম পাওয়াটি পাওয়ার জন্য ব্যস্ত, অরূপের সাধনাকে তার মনে হয় আত্মবঞ্চনা। এই নাটকে কুরূপ রাজা থাকেন অন্তরালে, রানী সুদর্শনার কাছেও তিনি প্রকাশ হন না। এজন্য রাণীর মনে নিরন্তর জমে ওঠে ক্ষোভ। কিন্তু দাসী সুরঙ্গমা বা সখা ঠাকুরদার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই - রাজাকে তারা অন্তরে নিজেদের মত করে উপলব্ধি করেই পরিতৃপ্ত, তাঁকে চাক্ষুষ করার কোন বাসনা তাঁদের মধ্যে নেই। কিন্তু অতৃপ্ত সুদর্শনা রূপমোহে অন্ধ, তাঁর ধারণা রাজা কুৎসিত বলেই তাঁর এই আত্মগোপনতা। এই ভ্রান্তধারণা রাণীকেই একদিন চরম ভ্রান্তির জালে জড়িয়ে দিল, রাণী সুদর্শনা "রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তার পরে সেই ভুলের মধ্য দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাঁকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ"।

সুদর্শনা যে নারী- সে-ই-সুদর্শনা। নিজেকে সৌন্দর্যবতী মন করার আত্মঅহংকারেই অরূপ রাজাকে সুদর্শনা কুরূপ মনে করেছিল। তারপর চরম সর্বনাশের দিনে সেই রাজাই যখন রাণীর ত্রাণকর্তা রূপে আবির্ভূত হলেন, তখন রাণীর সমস্ত অহংকার, রূপমোহ এবং ভ্রান্তি গেল ঘুচে, সেদিন রাজাকে রাণীর শুধু সুন্দর বলেই বোধ হলনা, মনে হল তিনি অনুপম।

টিপ্পনী

রাজা নাটকে রাজা প্রতীকী চরিত্র - দৃষ্টির অন্তরালে থেকেও তিনি চৈতন্যের সর্ব পরিসর জুড়ে অধিষ্ঠান করেছেন। এই নাটকে সংযুক্ত সংগীতগুলিও নাটকের অনির্দেশ্য সাংকেতিক ব্যঞ্জনার সঙ্গে সার্থক যুগলবন্দী করেছে। রাজা নাটকটি 'The king of Dark Chamber' নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে ছিল। 'অচলায়তনে' রবীন্দ্রনাথ নানান দিক থেকে বদ্ধ, সংকীর্ণ মানবজীবনে মুক্তি ও উদারতার সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। যুগজীর্ণ প্রথা, সংকীর্ণ সংস্কার ও জীবনবিবিক্ত আচার-অনুষ্ঠান কিংবা কঠিন অনুশাসন নিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় যুক্তি যে আসলে 'আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস-শর্বরী বসুধাকে' খন্ড -ক্ষুদ্র করে তোলে আর জীবনের চতুর্দিকে সৃষ্টি করে জগদ্দল আবরন - এই নাটকে সেই সত্যই পরিস্ফুটিত হয়েছে। এই অচলায়তনকে ভাঙার জন্য প্রয়োজন গুরুকে। শেষে গুরু আসেন, ভেঙে ফেলেন অচলায়তনের প্রাচীর ভদ্র - ম্লেচ্ছ বিভেদ যায় ঘুচে - নূতন; সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করানোর নির্দেশ দেন গুরু। এই নাটকের মহাপঞ্চক, দাদাঠাকুর, গোঁসাই এক একটি প্রতীকী দায়িত্বে নিয়োজিত, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশির মতে, "দাদঠাকুর, গোঁসাই, গুরু - এই তিন মূর্তিতে মিলিয়া গুরুর সম্পূর্ণ রূপ। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি বাদ দিলেই তাহাকে খন্ডিত করা হইল কবি বলিতে চান জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির সমন্বয়েই সাধনার সার্থকতা"

রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটিকে অধিকাংশ সমালোচকই পূর্ণাঙ্গ সাংকেতিকরীতির নাটক বলে অভিহিত করেছেন। এখানকার নাট্যসংলাপ অসীমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য মানবাত্মার যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা, সেই অনির্দেশ্য অর্থব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। ব্যাধিগ্রস্ত বালক অমল রাজার ডাকঘর থেকে রাজার একটি চিঠি পাওয়ার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষারত। সামান্য এই বালকের এই অদ্ভুত ইচ্ছায় অনেকে কৌতুকপরায়ণ অথবা উন্নাসিক। কিন্তু ঠাকুরদার বিশ্বাস রাজার চিঠি আসবেই। অমলের রোগব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধিপায়, গভীর রাতে রাজবৈদ্য সংবাদ দেন স্বয়ং রাজা আসছেন অমলকে নিতে। এরই মাঝে সুধা নামে এক বালিকা অমলের জন্য ফুল নিয়ে এসে দেখে অমল গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সুধা জানায় অমলকে যেন বলা হয় সুধা ওকে ভোলেনি। এই প্রতীকী ঘটনাই ডাকঘরের বিষয়বস্তু। এই নাটকে ঋতুচক্রেরও একটা নাটকীয় আবর্তন লক্ষ্য করা যাবে।

ডাকঘর হল অসীমের সীমারূপ। রাজা হলেন সেই অসীম। অসীমের প্রকাশ জীবাত্মায়। জীব নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনান্তে লগ্ন হতে চায় সেই অসীমেরই বুকে - অমল সেই জীবাত্মার প্রতীক। সুধা হল বসুন্ধরা - যে বসুন্ধরা মাতৃস্নেহে প্রতিটি জীবকে আঁকড়ে ধরে থাকে। জীব বিদায় নিলেও বসুন্ধরার বুকে থেকে যায় স্মৃতি। সুধা সেই ব্যথিত বসুন্ধরা। যে ডাকহরকরারা চিঠি নিয়ে আসে তারাই প্রকৃতির দূত তারা এক একটি ঋতু। বিশ্বনাট্যসাহিত্যের ইতিহাসও 'ডাকঘর' নাটকটির একটি স্থায়ী আসন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এর ইংরেজী অনুবাদ হল 'The Post-office'.

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

'ফাল্গুনীর' বিষয় বস্তুর মধ্যে জরা, যৌবন, প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এক নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। বাইরে থেকে যাকে জরা বলে ভ্রম হয়, আসলে সে জরা নয়। জরা হল মনের ব্যাধি - সুস্থ মন চিরন্তন যৌবনের প্রতীক। এই নাটকের অন্ধ বাউল অন্তর্দৃষ্টি বা

প্রজ্ঞার প্রতীক, চোখের আলো নিভে গেলে মনের আলো জ্বলে ওঠে - সেই আলোয় জীবনের অন্ধকার হয় চিরতরে বিদূরিত।

সমসাময়িক জীবন ও সভ্যতার একটি বিশেষ দিক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতম রূপক-সাংকেতিক নাটক 'মুক্তধারা' লিখিত হয়। 'মুক্তধারা' নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস নাগ মহাশয়কে একটি চিঠিতে লেখেন "Machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করেছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়।" যন্ত্রসভ্যতার অতিরিক্ত আধিপত্য আধুনিক মানবজীবনকে কি ভাবে সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যন্ত্রের অপব্যবহার কিভাবে প্রাণসংহারের খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে তার বিবরণ রয়েছে 'মুক্তধারা' নাটকে। এই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে, যন্ত্রের সঙ্গে প্রাণের সংঘাত হলে প্রাণের বিনিময়ে প্রমাণ করতে হবে যে, যন্ত্রের চেয়ে প্রাণ বড়। প্রাণকে এই স্থানে বলি দেওয়া যুক্তিযুক্ত কেননা যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের সংঘাত সৃষ্টি করবে আরও বড় বিপর্যয়, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে প্রতিযোগিতার পরিসর।

রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রসভ্যতার বিরোধী ছিলেন না, যন্ত্রের দাসত্ব করারেই তিনি অশুভ মনে করতেন। যন্ত্রের দাস যন্ত্ররাজ বিভূতি চেয়েছিলেন উত্তরকূটের ঝরণার জল যন্ত্র - দানবের সাহায্যে অবরুদ্ধ করে শিবতরাইয়ের মানুষদের তৃষ্ণার জলের চাবিকাঠি নিজেদের দখলে রাখতে। এর কারণ শিবতরাইয়ের মানুষদের চিরকাল নিজেদের অনুগ্রহের পাত্র করে রাখা। এখানেই যন্ত্রশক্তির পাশবিক আচরণটি মুর্ত হয় ওঠে। শিবতরাইয়ের মানুষদের কাছে যন্ত্র তাই দেবতার আশীর্বাদ নয়, অশুভ অসুরশক্তির প্রতীক। উত্তরকূটের রাজকুমর অভিজিৎ জানতেন যন্ত্রেরও দুর্বলতম স্থান আছে - প্রাণ দিয়ে তাকে আঘাত করতে হয়, অভিজিৎ নিজের প্রাণ দিয়ে যন্ত্রের ঔদ্ধত্যকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। মারপাগল ধনঞ্জয় মার খেয়ে মারকে ছাড়িয়ে উঠত চেয়েছে। 'এই নাটকে যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।

রবীন্দ্রনাথ এই নটকে এটাও প্রমাণ করতে চেয়েছেন মানুষনির্মিত কোন কিছুই অবিনশ্বর নয়। পাশ্চাত্যের নাট্যকার জর্জ কাইজার তাঁর 'গ্যাস' নাটকেও একই ধারণা পোষন করেছেন - 'The flaw lies in eternity'.

'মুক্তধারার' সমস্ত ঘটনার সংঘটন স্থল পথ - সূচনায় মুক্তধারা 'পথ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পথ জীবনর পথ — প্রতীকী এই অর্থও 'মুক্তধারায়' ব্যঞ্জিত হয়ছে।

'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথের আর একটি রূপক-সাংকেতিক নাটক যেখানে আধুনিক ধনতান্ত্রিক শক্তির বিবেকহীন সঞ্চয় প্রবণতা বা আকর্ষণ শক্তির পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। কর্ষণ আর আকর্ষণ জীবীর দ্বন্দ্ব কথার উদাহরণ রক্তকরবীর আলোচনা প্রসঙ্গে দেওয়াও হয়েছে।

পাতালপুরীর রাজা যক্ষ নির্মায়িক - সীমাহীন ধনতৃষ্ণা তাঁর। তিনি সর্বদা জালের আড়ালে অবস্থান করেন আর নিজেকে মহাভয়ংকর বলে প্রচার করেন । তাঁর নিযুক্ত শত শত শ্রমিক খনি থেকে তাল তাল সোনা তুলে এনে রাজার ধনাগার পূর্ণ করে তোলে। শ্রমিকরা নামহীন - সংখ্যায় তাদের পরিচয়। তাদের নিয়ন্ত্রণ করে বড় সর্দার, মেজ সর্দার, ছোট সর্দারের দল। শ্রমিকদের কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই, তাদের জীবনে আনন্দ নেই, প্রেম নেই, কাজের রাজ্যে তারা পশুর মত অষ্টপ্রহর বন্দী। তাদের স্বাধীন প্রাণস্ফূর্তিকে নেশার উপকরণ দিয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সেই পাতালপুরীতে একদিন যৌবনশক্তির আবির্ভাব ঘটল - রঞ্জন এবং নন্দিনী এল

টিপ্পনী

পাতালপুরীর বদ্ধ জীবনে প্রাণের দমকা হাওয়া নিয়ে। রাজা প্রমাদ গুনলেন। কিন্তু রঞ্জন নির্ভীক, নন্দিনী অকুতোভয় – তার সিঁথিমূলে রক্তিম রক্তকরবীর পাপড়ি। সে রাজাকে বাইরের পৃথিবীতে নেমে আসার আহ্বান জানায়, রাজা তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেন । শেষে রাজার হাতে যৌবনশক্তির প্রতীক রঞ্জনের মৃত্যু হল। রঞ্জন আসলে পৃথক কোন চরিত্র নয়, সে রাজার মধ্যকার যৌবনশক্তি – যে যৌবনকে রাজা বছরের পর বছর জালর আড়ালে থেকে তিলে তিলে হত্যা করেছেন। ধীরে ধীরে যক্ষরাজের মধ্যে প্রাণের উন্মেষ ঘটল, একদিন তিনি নিজের হাতে নিজের তৈরী জাল ছিন্ন করে বাইরের পৃথিবীতে পা রাখলেন – বাইরের পৃথিবীতে তখন পৌষের ফসলকাটার গান – 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয়রে চলে আয়, আয় আয়।'

টিপ্পনী

এই নাটকে রাজা হলেন ধনতান্ত্রিক শক্তির প্রতীক, জাল হচ্ছে এক জটিল আবরণ যা অহং-উন্মত্ততার দুর্ভেদ্য বেষ্টনী। আবার এই জাল হল ধনতান্ত্রিক শক্তির আত্মরক্ষার প্রহরী। রঞ্জন যৌবন আর নন্দিনী হল প্রাণের প্রতীক। নন্দিনীর সিঁথিমূলে রক্তকরবীর রক্তরাগ প্রেম, সৌন্দর্য ও বিপ্লবের প্রতীক। সব মিলিয়ে রক্তকরবীর নাট্যঘটনা ও চারিত্রিক প্রাণে সাংকেতিকতা ও রূপক ধর্মের ব্যঞ্জনাময় পদচারণা নাটকটিকে আধুনিক যুগজীবনের প্রতিরূপ করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' দুটি নাটকের সমবায় – 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা'।

'রথের রশির' প্রথমে নাম ছিল রথযাত্রা, এবং কবির দীক্ষার নামছিল শিবের ভিক্ষা। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন রথযাত্রা একটি বিশিষ্ট নাম – এর অর্থব্যঞ্জনা অত্যন্ত স্থূল, কিন্তু রথকে নাড়ায় যে রশি, তার মধ্যে আছে প্রতীকধর্মিতা।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরাজের শেষে শূদ্রশক্তির অবশ্যম্ভাবী উত্থানের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন। 'রথের রশিতে' সেই অবহেলিত অস্পৃশ্য ও উপেক্ষিত শূদ্রজাতিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের একাধিপত্যকে খর্ব করে নিজেদের 'সত্য – শক্তি' প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই অধিকার প্রতিষ্ঠা বাহুবলে যা অর্থবলে নয়, কালের নিয়মেই ক্ষমতার চক্র আবর্তিত হয়, রাজদন্ড হস্তান্তরিত হয়, উচ্চ নীচে নামে, নীচস্থ শক্তি উর্ধ্বায়িত হয়। এই পরিবর্তনের পিছনে যে কারণ রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে তাও স্পষ্টীকৃত করেছেন। ক্ষমতার দম্ভ, মনুষ্যবিদ্বেষ ও অহংকারনামক রিপু যখন চালিকা শক্তিকে গ্রাস করে, তখন আসন্ন হয়ে ওঠে তার পতন ও পরিণাম। যুগ যুগ ধরে ঘটে যাওয়া এই সমস্ত ঘটনা ইতিহাসের পাতায় দৃঢ় মুদ্রিত আছে । সুতরাং শূদ্রের উত্থান রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতিসূচক মানসিকতার ফলশ্রুতি নয়, ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশনায় এর সংগঠন। কিন্তু মার্ক্স বা বিবেকানন্দকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে যে নতুন কথা শোনালেন, তা হল শূদ্রও যদি ক্ষমতার অহংকারে মত্ত হয়ে ওঠে, তবে তারও পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে। তখন ছন্দপতনের সেই মহাকালের সংকটে আবির্ভূত হবেন কবি – তিনি ছন্দের শৃঙ্খলে বাঁধবেন বেসুরো সমাজকে। এ হয়তো কবির কল্পনা, বাস্তববাদী নাট্যকারের নয়, তথাপি রবীন্দ্র – বক্তব্যের এ নতুনত্ব আমাদের চমৎকৃত করে।

রথের – রশি হল হৃদয়-বন্ধনের সূত্র, সেই দড়িতে পরেছে অসংখ্য গিঁট, জীর্ণ তার অবস্থা। সেই জীর্ণ দড়ির টানে রথ চলে না। অন্যদিকে রাস্তাও হয়ে পড়েছে অসমান, অসংখ্য খানা – খন্দে পরিপূর্ণ। এই অসমতা সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্য। এখন সমাজ তো নিশ্চল – রথও তাই নিশ্চল। যখন শূদ্রকে দেওয়া হল রথ টানার অধিকার, মুহূর্তে সমাজের রাস্তা গেল সমান হয়ে, রথ চলল গড়গড়িয়ে। রথ হল সমাজ, রশি হল সমাজ চালানোর শক্তি। দার্শনিক ট্রাইন

এই শক্তিকেই 'Golden thread' বলে উল্লেখ করেছেন।

নৃত্য সংলাপ ও সংঙ্গীতের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - শাপমোচন, তাসের দেশ, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, চন্ডালিকা ও শ্যামা। অন্যদিকে গীতিপ্রধান গীতিনাট্যগুলি হল রুদ্রচন্ড, বাল্মীকিপ্রতিভা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা ইত্যাদি। এগুলিতে গীতিপ্রাণ ও কবিপ্রাণ রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লোকের কবিত্ব ও সুরমাধুর্য মন্ময় শিল্পবৈশিষ্ট্যসহায়তায় প্রতিফলিত হয়েছে।

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথ মঞ্চের দিকে তাকিয়ে নাটক রচনা করেননি - ফলতঃ মঞ্চের স্বাভাবিক দাবিগুলির কথা চিন্তা না করে তিনি স্বাধীন নাট্যকারবৃত্তি নিয়ে তাঁর নাটকগুলি রচনা করে গিয়েছিলেন। একারণেই রবীন্দ্র-নাটকের বিরুদ্ধে একটি অন্যতম প্রধান অভিযোগ হল যে, তাঁর নাটকগুলি সাধারণ ভাবে মঞ্চোপযোগী নয়। এই অনুপযোগিতা নাটকের দৈর্ঘ, নাট্য দৃশ্যের জটিল উপস্থাপনা, দৃশ্যসজ্জা, নাট্যসংলাপ ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়। তবে আধুনিক পরিচালকের সতর্ক পরিচালনায় রবীন্দ্রনাটক আজও নানান জায়গায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে। সেই অর্থে রবীন্দ্রনাটক একদিকে যেমন বস্তনিষ্ঠ শিল্প-আঙ্গিকের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি একই সঙ্গে পাঠ্যসাহিত্যের গুণ সম্পন্ন শিল্পও বটে।

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য ঃ

বাংলা নাটকের আদি যুগ ছিল মূলত ঃ অনুবাদমূলক নাটক, কিংবা ঐতিহাসিক - পৌরাণিক-সামাজিক নাটকের গতানুগতিক উপস্থাপনে বৈচিত্র্যহীন। এদের মধ্যে ১৮৬০ সালে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকেই সর্বপ্রথম গণজীবনের অভ্যুত্থান আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। সমগ্র উনিশ শতক ধরে অসংখ্য নাট্যকার যে সমস্ত নাটক রচনা করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে সমাজচেতনা যে ছিল না তা নয় কিন্তু অধিকাংশ নাটকই ছিল সংকীর্ণ নাট্য চিন্তায় আবিষ্ট।

বিশ শতকের প্রথম দু-তিনটি দশকে বাংলা সাহিত্যে নানা দিকে পালাবদল ঘটেছে। কল্লোল, কালি-কলম প্রভৃতি পত্রিকায় বাস্তব জীবনকে তুলে ধরার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে। ফ্যাসী বিরোধী লেখক সংঘ বা প্রগতি লেখক শিল্পীগোষ্ঠীর কবি সাহিত্যিকগণ একদিকে জীবনের বাস্তব দিক অন্যদিকে যে সমাজ সমস্ত ঘটনার অনুঘটক, সেই সমাজের চুল-চেরা বিশ্লেষণে অগ্রণী হয়েছেন - তাঁরা শনাক্ত করতে চেয়েছেন সমাজের মূল ব্যাধিটা কোথায়। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের অবস্থান নির্ণয় করা, সেই সঙ্গে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা - এই রকম একটা সাহিত্যিক trend বা ঝোঁক বাংলা সাহিত্যে তখন আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে - এই শুরুরই কালানুক্রমিক পরিণতি হল গণনাট্য আন্দোলন - যে আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত ছিলেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য।

গণনাট্যের উদ্ভব ও বিকাশের প্রথম লগ্নে যে কজন নাট্যকার বাংলা নাটকের আঙ্গিক, বক্তব্য, উপস্থাপনা ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন বিজন ভট্টাচার্য বাদে তাঁরা হলেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, প্রমুখ। তবে এঁদের মধ্যে গণনাট্যের সার্থক রূপকার হলেন বিজন ভট্টাচার্য। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুঃখ-দুঃখ, আনন্দ -বেদনা, তাদের সংগ্রাম চেতনা এসমস্ত বিষয়ই গণনাট্যে উপস্থাপিত হয় এবং নাট্যকারের মূল ভাবনা ও চেতনা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ মার্কসীয় রাজনীতির প্রভাবে । "গণের 'Intervention' ছাড়া

টিপ্পনী

গণনাটক হয়না। গণনাট্য আন্দোলন তখনই সম্ভব যখন গণরা নাট্যের অনুষ্ঠান করবে।" বিজন ভট্টাচার্যের মতে গণ নাটকের মধ্যে আসবে "Total aspiration of the people, mass aspiration for the conception of freedom, total conception of ourselves." প্রগতি লেখক-শিল্পীসংঘের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের জীবনধারাকে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতীয় গণনাট্যসংঘ। এই গণনাট্যসংঘ কৃষকজীবন, শ্রমিকজীবন এবং অবহেলিত-শোষিত মানবজীবনকে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে মঞ্চে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত করার প্রয়াস গ্রহণ করে এবং তা করতে গিয়ে নাট্যআঙ্গিক, মঞ্চউপস্থাপনা, রূপসজ্জা, অভিনয়, আলোক-সম্পাত সবকিছুর মধ্যে আমূল পরিবর্তন করা হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক সারা পৃথিবী ব্যাপী বিপর্যয়, মন্বন্তর, শাসক-শোষকের শাসন - শোষণ আর এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গোড়ে তোলা এই হল গণনাট্য রচনা ও অভিনয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'আগুন' বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক। 'জনযুদ্ধ' কাগজ দ্বারা আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতার জন্য 'আগুন' রচিত হয়েছিল - নাটকটি 'অরণি' পত্রিকায় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ শে এপ্রিল মুদ্রিত হয়। আগুন নকশাধর্মী নাটক - এখানে প্রথাধর্মী নাটকের মত নাট্যকার একটি আদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত কাহিনী বয়ন করেননি। তৎকালীন দেশ ও সমাজের অস্থির সময়কে নাট্যকার এই নাটকে উপস্থাপিত করেছেন। নাটক হিসাবে আগুন খুব একটা সফল নয়।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দেই 'অরণি' পত্রিকায় বিজন ভট্টাচার্যের আর একটি নাটক প্রকাশিত হয় - নাটকটির নাম 'জবানবন্দী'। 'জবানবন্দীর' মধ্যে একটি ধারাবাহিক কাহিনী আছে। একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারের বিপর্যয়কর অবস্থা, অভাব, অনটন, দুঃখ-দুর্দশা, অনাহার কলকাতায় আগমন নতুন একটা স্বপ্নকে লালন করে, সেখানে নাগরিক সভ্য-শিক্ষিত মানুষদের নিয়ত অবহেলা, ক্ষুধার তাড়নায় শিশুপুত্রের মৃত্যু, বৃদ্ধপিতার জীবনাবসান, কৃষক রমণীর জীবনে চরম সর্বনাশের সূচনা ইত্যাদি হল এই নাটকের কাহিনীবস্তু। প্রখ্যাত সমালোচক সুধী প্রধানের মতে 'আগুন' বা 'জবানবন্দী' কোনটাই বিশুদ্ধ শ্রেণীচেতনা বা মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা নাটক নায় - 'মানবিকতাই' এ-দুটি নাটকের মর্মবস্তু।

বিজন ভট্টাচার্যের তথা সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'নবান্ন'। কোন রোমান্স, অতিনাটকীয়তা, অতিরঞ্জন, বা চটকদারির পরিবর্তে বাস্তব ও জীবনঘনিষ্ঠ উপকরণকে এই নাটকে নাট্যকার রূপ দিতে চেয়েছেন। ১৯৪২- ১৯৪৪ সাল পযর্ন্ত গ্রাম-বাংলার বুকে নানান বিপর্যয় নেমে এসছিল। ১৯৪৩-এ সাইক্লোন ও বন্যার মত ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় 'নবান্ন' নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। নাটকটির কাহিনী-বৃত্ত শিথিল কিন্তু প্রত্যেকটি নাট্যদৃশ্যই এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে সমুপস্থিত। নাট্যদৃশ্যগুলির মধ্যবিন্দুতে আছে আমিনপুর গ্রাম অথবা শহর কলকাতা।

আগষ্ট বিপ্লবের পটভূমিকায় এই নাটকের কাহিনীর সূচনা। তারপর বন্যার মত এক ভয়াল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত একদল উদ্বাস্তু মানুষের কলকাতায় প্রাণহীন নাগরিক পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করার কারণে এখানকার নাট্যঘটনায় জটিলতা সূচিত হয়েছে। নগর কলকাতায় অর্থলোভী, স্বার্থপর, নির্মায়িক ও অভিজাত মানুষদের কাছে পশুবৎ আচরণ লাভ করে ক্লান্ত, রিক্ত, বিধ্বস্ত গ্রামীণ মানুষেরা শেষ পর্যন্ত গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং শেষতঃ প্রতিরোধ-সংকল্পে উজ্জীবিত হয়ে নবান্নের নতুন উৎসবে মেতে উঠেছে এবং সংকল্প করেছে সমবায় প্রথায় (গাঁতায় খেটে) চাষ-প্রবর্তনের। এক মহামন্বন্তরের বুকে দাঁড়িয়ে জীবনের যে সদর্থক রূপ

এখানে আঁকা হয়েছে, তা কোন বিলাসী নাট্যকারের খামখেয়ালিপনামাত্র নয়, তাঁর মূলে রয়েছে এক ভয়ংকর বাস্তবকে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরার ও অন্যায়ের প্রতিবিধানের আপোষহীন প্রয়াস।

নাট্যশিল্পের বিচারে নবান্ন মোটেই ত্রুটিমুক্ত নাটক নয়, কিন্তু চল্লিশের দশকের দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মজুতদার - মহাজনদের লোভ ও অর্থগৃধ্নুতা, অভিজাত সম্প্রদায়ের নির্মমতা ও ঔদাসীন্য, কলকাতার ফুটপাতে সামান্য একটু ফ্যানেরও অভাবে বুভুক্ষু মানুষদের অসহায় মৃত্যুবরণের চিত্রায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে সমসাময়িক ইতিহাসের একটি জীবন্ত রূপ এ-নাটকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন — ফলে 'নবান্ন' হয়ে উঠেছে সমসাময়িক ইতিহাসের একটি বিশ্বস্ত দলিল।

টিপ্পনী

বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' নাটকটি ১৯৪৭ সালে রচিত হলেও এর প্রকাশ কাল ১৯৫৯। একজন উদ্বাস্তু মধ্যবিত্ত স্কুল-শিক্ষক তাঁর নিজের শ্রেণী-অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে বস্তিবাসী শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের সঙ্গে কেমন করে একীভূত হয়ে গেলেন- 'গোত্রান্তর' সেই ঘটনা-ব্যঞ্জনারই সার্থক নামবাহী নাটক। নাটকটির ভূমিকা অংশে নাট্যকার লিখেছেন — ''নীতিবাদের প্রশ্ন নয় জীবনের ক্ষেত্রেই গোত্রান্তর আজ যুগসত্য। আর জীবনের ক্ষেত্রে যে সত্য চন্দ্র-সূর্য-গ্রহতারার মতই সমুজ্জ্বল - নাটকে তার অপলাপ করা কোন নাট্যকারের জীবনধর্ম হতে পারেনা।''

বিজন ভট্টাচার্যের অন্য একটি নাটক মরাচাঁদ (১৯৪৬) রচিত হয়েছিল দিনাজপুরের টগর অধিকারী নামক একজন অন্ধ দোতারা বাদকের জাবনকাহিনী অবলম্বনে। এই নাটকে পবন বাউলের ভূমিকায় অভিনয় করে ছিলেন স্বয়ং নাট্যকার। এই অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশে গণসংগীতের ধারাটিকেও উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ-শাসনাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকার কর্তৃক হিন্দু - মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ঘটনার জন্য 'Divide and Rule' নীতির প্রবর্তন করলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ঘটনায় ব্যথিত-চিত্ত নাট্যকার রচনা করেন 'জীয়নকন্যা' নাটকটি (১৯৪৬)। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজন ভট্টাচার্য দুটি উল্লেখযোগ্য বাস্তব জীবন-উপলব্ধির নাটক রচনা করেন - 'অবরোধ' এবং 'জননেতা'।

১৯৪৮ সালে বিজন ভট্টাচার্য মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালি যাত্রা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর মতান্তর সৃষ্টি হয় এবং অচিরেই তিনি পার্টি ও গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সমস্ত রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

নাটক, নাট্যাভিনয় এবং মঞ্চের সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের সমগ্র সত্তা জড়িত ছিল। তাই পার্টি ও গণনাট্যের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক-ভাবে যোগসূত্র ছিন্ন করলেও নাট্যরচনা বা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই নিজেকে যুক্ত রেখে ছিলেন। নাট্যজীবনের এই দ্বিতীয় পর্বে বিজন ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠা করেন ক্যালকাটা থিয়েটার। এই থিয়েটারের জন্য তিনি সাঁওতাল তথা আদিবাসীদের জীবনের দুঃখ - দুর্দশা ও যন্ত্রণার কথা এবং সেই সঙ্গে ঐ অবক্ষয়িত অবস্থা থেকে মুক্তি প্রাপ্তির জনগণনির্ভর জীবনসংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে রচনা করেছেন 'দেবীগর্জন' (১৯৬৬)। ''কলঙ্ক'' শীর্ষক নাটকটি লিখিত হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালকে মনে রেখে। বিজন ভট্টাচার্যের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল ''গর্ভবতী জননী'' (১৯৬৯)। ১৯৭০ সালে বিজন ভট্টাচার্য ''কবচ কুন্ডল'' নামে আর একটি নাট্যদল গড়ে তোলেন এবং জনমজুরদের বাস্তব জীবনকাহিনী নিয়ে রচনা করেন হাঁসখালীর হাঁস। বিজন ভট্টাচার্যের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'ছায়াপথ' (১৯৬১),

‘আজ বসন্ত’ (১৯৭০), ‘চলো সাগরে’ (১৯৭২)। একাঙ্ক নাটক রচনাতেও বিজন ভট্টাচার্য সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তার কয়েকটি একাঙ্ক নাটক হল – সাগ্নিক, চুল্লী, লাস ঘুর‍্যা যাউক, ইত্যাদি। তবে একবারের শেষ পর্বের নাটকগুলিতে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারেননি, আসলে তখন তাঁর নাট্যপ্রতিভা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসছিল।

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক – গ
উপন্যাস
উপন্যাস সাহিত্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা ঃ

টিপ্পনী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আখ্যানধর্মী গদ্য রচনা করলেও তিনি উপন্যাস নামক শিল্প-আঙ্গিক থেকে বহু দূরবর্তী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বা মধ্যযুগ থেকে শুরু করে প্রাক্-বঙ্কিমকাল পর্যন্ত উপন্যাসের কোনো রূপ-পরিচয় অদেখাই থেকে গিয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে উপন্যাস সর্বতোভাবেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের অবদান, এদেশে পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের প্রচলনের পূর্বে উপন্যাস-আঙ্গিক সম্পর্কে এখানকার লেখকবৃন্দের কোন ধারণাই ছিল না।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার পূর্বে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন গদ্য-লেখকের হাতে বাংলা ভাষায় গল্পরসের আস্বাদনযুক্ত অথবা চিত্র বা নক্সাধর্মী রচনা সৃষ্ট হয়েছিল,তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫),'নববিবি বিলাস'(১৮৩১), টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) ' আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৪), কালীপ্রসন্ন সিংহের ' হুতোম প্যাঁচার নকশা'(১৮৬১), হ্যানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ও 'সফল স্বপ্ন'। অবশ্য পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির কোনটিকেই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না।

কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, বাস্তব প্রতিবেশ এবং উপন্যাসিকের বিশিষ্ট জীবনদর্শনের শিল্পিত মেলবন্ধনে মানবজীবন, সমাজ, জীবনের দুরূহ, জটিল সমস্যা ও মানব মনোলোকের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিল রাসায়নে জীবনের এক সামগ্রিক রূপ-উপন্যাস সাহিত্যে বিধৃত হয়। প্রাক্-বঙ্কিমযুগে উপন্যাসের এই জটিল শিল্পরূপের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ এই বাইশ বছরের মধ্যে উপন্যাস ও উপন্যাসোপম মোট চোদ্দটি গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেছিলেন। সেগুলি হল- দুর্গেশ-নন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুন্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ (১৮৮৪), দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪), রাধারাণী (১৮৮৬) এবং সীতারাম (১৮৮৭)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসটি ইংরেজীতে লেখা। 'Indian Field' পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়- উপন্যাসের নাম- 'Rajmohan's Wife'-তবে এটি একটি অসমাপ্ত রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন-

১) ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্সধর্মী উপন্যাস ঃ দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুন্ডলা, মৃণালিনী,

ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, সীতারাম ।

২) ঐতিহাসিক উপন্যাস ঃ রাজসিংহ

৩) ইতিহাসের আধারে রচিত ঃ আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী মূলতঃ তত্ত্বমূলক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র এখানকার তত্ত্বের নাম দিয়েছেন- অনুশীলনী তত্ত্ব,তত্ত্বটি 'গীতা'র প্রভাবজাত। তবে উপন্যাসদুটিকে প্রত্যক্ষ ইতিহাসের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ। উপন্যাস দুটির মধ্যে 'আনন্দমঠ'কে আবার দেশাত্মবোধমূলক রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়।

টিপ্পনী

৪) সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস ঃ বিষবৃক্ষ, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসটি হল দুর্গেশ-নন্দিনী-মুঘল ও পাঠানের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এখানকার গতিশীল ঘটনা,ঘটনার নাটকীয় উত্থান-পতন, অপূর্ব সাহিত্য-গুণান্বিত ভাষা, রোমান্সের রহস্যময়তা, চরিত্রের আভিজাত্য সবকিছুতেই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ঔপন্যাসিক এখানে উপস্থাপিত করেছেন।এই উপন্যাসে ইতিহাস থেকে গৃহীত চরিত্রসমূহ যেমন বীরেন্দ্র সিংহ, জগৎ সিংহ, কতলু খাঁ পুরোপুরি ইতিহাস অনুযায়ী ভূমিকা পালন না করলেও উপন্যাস ঘটনায় এদের অংশগ্রহণ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

স্যার ওয়াল্টার স্কট ইতিহাসের আধারে রোমান্সের এক রহস্যময় মায়াবী জগৎ সৃষ্টি করে একদা শুধু ইংরেজী সাহিত্যে নয়, সারাবিশ্বে অতুলনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও স্কটের আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর জনপ্রিয় ঐতিহাসিক রোমান্সগুলি রচনা করেছিলেন। এই স্কটেরই 'আইভানহো' উপন্যাসটির প্রত্যক্ষ প্রভাব 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে লক্ষ্য করা যাবে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তাঁর উপন্যাসে 'আইভানহো'র প্রসঙ্গটি অস্বীকার করেছিলেন। দুর্গেশ-নন্দিনীর মুখ্য কাহিনী গড়ে উঠেছে জগৎ সিংহ, তিলোত্তমা, আয়েষার ত্রিভুজ প্রেমদ্বন্দ্বের পটভূমিকায়। এছাড়া রয়েছে একটি বিশিষ্ট চরিত্র ওসমান। এই উপন্যাসের ভাষা কাব্যিক। ঘটনাধারায় অতিরঞ্জন ব্যাপারটিও আছে। তবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসাবে 'দুর্গেশ-নন্দিনী' অনবদ্য। দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসটি রচিত।এর জমাটবদ্ধ কাহিনীসজ্জা নাট্যশিল্পের সঙ্গে তুলনীয়।গ্রীক ট্র্যাজিডির মতোই নিখুঁত শিল্প বৈশিষ্ট্য কপালকুন্ডলায় লক্ষিত হয়। অধিকাংশ সমালোচকের মতে 'কপালকুন্ডলা' শিল্পধর্মের বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

প্রকৃতির কোলে পালিতা অরণ্যচারিণী কাপালিকের পালিতা কন্যা কপালকুন্ডলার সঙ্গে নবকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ, উভয়ের প্রেমমুগ্ধতা এবং শেষে বহু বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে কপালকুন্ডলা ও নবকুমারের বিবাহ, স্বাধীনচিত্তা কপালকুন্ডলার সামাজিক জীবনে প্রবেশ ও সমাজের নানাবিধ বিধিনিষেধে ক্লান্ত হয়ে 'যদি বিবাহ দাসীত্ব জানিতাম, তবে বিবাহ করিতাম না,' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, শেষে নবকুমারের একদা বিবাহিত ও পরে পরিত্যক্তা স্ত্রী মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতীর নাটকীয় আবির্ভাবে কপালকুন্ডলার জীবনের এক করুণ পরিণতি এই উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। শুধু কপালকুন্ডলা নয়, গৃহত্যাগিনী কপালকুন্ডলার পশ্চাৎ-অনুসরণ করে নবকুমারও দুরন্ত গঙ্গাবক্ষে কপালকুন্ডলার সঙ্গে নিমজ্জিত হয়েছে। বস্তুতঃ প্রকৃতির উদার পরিবেশ ও সংসারের বদ্ধ পরিবেশের টানাপোড়েনেই কপালকুন্ডলার ট্র্যাজিডির মুখ্য কারণ।

গহন অরণ্য মধ্যে দিক্‌ভ্রষ্ট নবকুমার যেদিন প্রথম আলুলায়িত কুন্তলা অনিন্দ্যসুন্দরী

কপালকুন্ডলাকে দেখেছিল, সেদিন কপালকুন্ডলা তার নবযৌবনের মায়াবী দৃষ্টি নিয়ে নবকুমারের উদ্দেশ্যে বলেছিল-'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ।' 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাস সামাজিক নবকুমারের জীবনের পথ হারানোর ইতিবৃত্ত -কপালকুন্ডলার ঐ উক্তিটি এই উপন্যাসের প্রধানতম 'key note'।

কপালকুন্ডলার ইতিহাস প্রসঙ্গ গৌণ। মতিবিবির সঙ্গে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ যোগ থাকলেও মতিবিবিও কাল্পনিক ঘটনাবর্তের সঙ্গে অচিরেই জড়িয়ে গিয়েছে। এই উপন্যাসের এক ভয়াল অথচ অসাধারণ চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন চরিত্র হল কাপালিক। এক অতিপ্রাকৃত পরিমন্ডলে চরিত্রটির অধিষ্ঠান। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে।

টিপ্পনী

'কপালকুন্ডলা' প্রকৃত অর্থেই একটি রোমান্সধর্মী উপন্যাস। অতি প্রাকৃত জগৎ, অতিপ্রাকৃত ঘটনা, সমুদ্রবেষ্টিত অরণ্যানীর অনির্বচনীয় রহস্যময়তা এই উপন্যাসের মধ্যে রোমান্সের পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছে।

পরবর্তী উপন্যাস 'মৃণালিনী'কে একটি সার্থক সৃষ্টি বলা যায় না। বিশেষত ঃ 'কপালকুন্ডলা'র পাশে উপন্যাসটি একেবারেই নিষ্প্রভ। ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় এদেশে তুর্কী আক্রমণের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত। তবে এখানেও ইতিহাস গৌণ। ইতিহাসের পটভূমিকায় গড়ে-ওঠা মৃণালিণী ও হেমচন্দ্র এবং পশুপতি ও মনোরমার দুটি রোম্যান্টিক প্রেমকাহিনী এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। 'মৃণালিনী'তে কাহিনী গ্রন্থনের যথেষ্ট শৈশিল্য রয়েছে।

যুগলাঙ্গুরীয় একটি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস-পূর্ণাঙ্গরীতির উপন্যাস নয়। হিন্দুযুগের উল্লেখযোগ্য বন্দর সপ্তগ্রামের পটভূমিকায় উপন্যাসটি লিখিত। তবে ইতিহাস-ঘটনাকে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে নিজের মত করে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে 'চন্দ্রশেখর' অন্যতম। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতনের পর ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ মীরজাফরকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু মীরজাফর ছিলেন অযোগ্য। মীরজাফরকে অপসৃত করে এরপর মীরকাশেমকে নবাব পদে বৃত করা হয়। মীরকাশেম ছিলেন স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমী এবং ইংরেজের শাসনজাল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীনরাষ্ট্র গড়ার অভিলাষী। মীরকাশেমের এই অভিলাষের কারণে কোম্পানীর সঙ্গে মীরকাশেমের যুদ্ধ সংঘঠন ও মীরকাশেমের পরাজয়বরণ-এগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সমান্তরালে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসে চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনীর এক ত্রিভুজ জীবন-সমস্যার নাটকীয় কাহিনী বয়ন করেছেন।

শৈবলিনী এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের এক দুঃসাহসী সৃষ্টি—সমগ্র বঙ্কিম উপন্যাসেও এই চরিত্রটির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হবে। অবৈধ প্রণয়ের বিষফল ও ট্র্যাজিক পরিণতির কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পাঠককে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শৈবলিনী সেই অবৈধ প্রণয়ের মূর্ত প্রতিমূর্তি-বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'পাপীয়সী'

শৈশবে শৈবলিনী ও প্রতাপ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু জ্ঞাতি সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে উভয়ের বিবাহ অসম্ভব ছিল। প্রেমের ব্যর্থতায় সেই শৈশবেই উভয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল- কিন্তু 'আত্মাদর-প্রিয়' শৈবালিনী প্রতাপকে মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়ে

এসেছিল। ভাগ্যক্রমে চন্দ্রশেখরের প্রচেষ্টায় প্রতাপের জীবনলাভ সম্ভব হয়েছিল। এরপরই অরণ্যের সুবাসিত প্রফুল্লকুসুম শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের বিবাহ ও উপন্যাস-অংশে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূত্রপাত। উপন্যাসের উপক্রমণিকা অংশে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রগুলির শৈশব ও কৈশোর বৃত্তান্ত প্রদান করেছেন।

টিপ্পনী

দেবদুর্লভ চরিত্র চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে সুখী করতে পারেননি। শৈবলিনীর দৃঢ় জীবন- প্রত্যয়-প্রতাপই তার অন্বিষ্ট পুরুষ। এই প্রত্যয় থেকেই বিবাহিতা নারীর এক চরম অপ্রিয় সত্যভাষণ 'তুমি (প্রতাপ) বাঁচিয়া থাকিতে আমার সুখ নাই।' প্রতাপ আদর্শ চরিত্র। শৈবলিনীর প্রতি তার প্রেম আছে, কিন্তু পরস্ত্রীর প্রতি সেই প্রেম কামনাশূন্য। প্রতাপ শৈবলিনীর হিতাকাঙ্ক্ষী হতে চেয়েছিল; কিন্তু শৈবলিনীর অসংগত কাম-তৃষ্ণার আহ্বান তাকে শেষপর্যন্ত ভস্মীভূত করেছে; নিজের মৃত্যু ডেকে এনে শৈবলিনীর সুখের পথকে নিষ্কন্টক করেছে।

কিন্তু নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে শৈবলিনীকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেননি; জীবন্তে নরক-দর্শন করিয়ে, মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে তার জীবনে প্রতিনিয়ত এক আতঙ্কিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্রশেখর তাঁর উদার মানসিকতা দিয়ে শৈবলিনীকে অবশ্য ক্ষমা করেছেন, সংসার আশ্রমে বধূর মর্যাদা দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন-কিন্তু মৃত্যুর পরপারে চলে গেলেও শৈবলিনীর মন থেকে কি প্রতাপ চিরতরে মুছে গিয়েছে? সুতরাং চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর নতুন জীবনেও তৃতীয় চরিত্রের অদৃশ্য উপস্থিতি একটা অস্বস্তির কারণ হিসাবেই থেকে গেল।

অন্যদিকে এই অধ্যায়ে দলনী-মীরকাশেমেরও একটা ট্র্যাজিক চিত্র ঔপন্যাসিক এঁকেছেন- সে কাহিনীও যথেষ্ট মর্মস্পর্শী।

'রাজসিংহ'কেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একমাত্র ঐতিহাকি উপন্যাস বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন যে, এই গ্রন্থে তিনি ইতিহাসকে 'লঙ্ঘন' করেননি। যে সমস্ত অনৈতিহাসিক চরিত্র এই উপন্যাস-ঘটনায় আছে, তারাও ইতিহাস-ঘটনার অমোঘ আকর্ষণে ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।

রাজপুত-কন্যা চঞ্চলকুমারীর পাণিপ্রার্থী ছিলেন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজীব। চঞ্চলকুমারীর বিবাহকে কেন্দ্র করেই রাজসিংহের সঙ্গে ঔরঙ্গজীবের বিরোধ—এই বিরোধের পরিণাম হল উভয়ের প্রলয়ংকর যুদ্ধ এবং যুদ্ধে ঔরঙ্গজীবের পরাজয়। চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে অতঃপর রাজসিংহের বিবাহ—উপন্যাসের মূল কাহিনী এটাই। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের পরিণাম এই উপন্যাসে ইতিহাস-সমর্থিত সত্য।

ঐতিহাসিক অংশ ছাড়াও 'রাজসিংহ' উপন্যাসে একটি 'মানবজীবন' অংশ আছে—সেই মানবজীবন অংশে মবারক, বাদশাহজাদী জেব্‌উন্নিসা ও দরিয়ার অনৈতিহাসিক কাহিনী পাঠকের মনোযোগকে ইতিহাস-অংশ অপেক্ষাও অধিকতর আকর্ষণ করেছে। বাদশাহজাদী জেব্‌উন্নিসার মবারকের প্রতি প্রেম এক অপার রহস্যময়তায় আবৃত। উদ্ধত, অহংকারী, স্বেচ্ছাচারিণী, বিলাস-বৈভব ও ঐশ্বর্যে মদগর্বিতা জেব্‌উন্নিসা কেমন করে চরম আত্মদহনের মধ্য দিয়ে ধূলিধূসরিত মর্ত্যভূমিতে ভূলুণ্ঠিতা হয়ে অশ্রুসজল হয়ে উঠল সে কাহিনী সত্যিই চমকপ্রদ। আরও একটি উপকাহিনী এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে- তা হল মাণিকলাল ও নির্মলকুমারীর আখ্যান। দুটি উপকাহিনীই ইতিহাসের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রথঘর্ঘর কর্কশধ্বনির মধ্যে জীবনের এক ঐকতান সৃষ্টি করেছে। সব মিলিয়ে রাজসিংহ হয়ে উঠেছে একটি পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক

উপন্যাস।

ইতিহাসের আধারে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাসটি হল 'সীতারাম'। 'সাতীরাম' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন-'এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।' সীতারাম নামক রাজার জীবনকাহিনী এবং সমকালীন নানান্য সমস্যা, দুরবস্থা ও বিপর্যয়কর অবস্থার চিত্র অংকিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সীতারামের শান্ত দাম্পত্য জীবনে নিষ্কাম ধর্মের প্রবক্তা শ্রী-র আবির্ভাব, তার প্রতি সীতারামের রূপমোহ এবং পরিণামে জীবন-ট্র্যাজিডি-এটাই হল সীতারাম উপন্যাসের মূল ঘটনা। উপন্যাসটির মধ্যে একটি তত্ত্বভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে- যা শিল্পরসের স্বাভাবিক স্ফূর্তিকে কিছুটা ব্যাহত করেছে।

টিপ্পনী

বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বমূলক উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এর পশ্চাতে উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের একটি ঘটনার প্রভাব আছে বলা হয়। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক গবেষণায় ঐ সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে কোন মহৎউদ্দেশ্য প্রসূত বলে সিদ্ধান্ত করা হয়নি। 'আনন্দমঠ' অন্যদিকে প্রথম বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের মর্যাদায় গরীয়ান। এই উপন্যাসে সংযুক্ত 'বন্দেমাতরম্' বঙ্কিমচন্দ্রের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। দেশই এখানে জননী। এই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংসবাদী ও সশস্ত্রবিপ্লবী উভয় সম্প্রদায়ের কাছে জীবন-মন্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠেছিল-পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম উদাহরণ একান্ত বিরল।

উপন্যাসটির পটভূমিকায় রয়েছে বাংলা ১১৭৬ সালের দুর্বিষহ মন্বন্তর। স্বামী সত্যানন্দ ও সন্তানদলের রাজশক্তি বিরোধিতা এবং সেই সঙ্গে মহেন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী কল্যাণীর আখ্যান 'আনন্দমঠের' কাহিনী-অংশ গঠন করেছে। সন্তানদলের স্বপ্ন এ উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি-কারণ বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন মানুষের চরিত্রে সকলবৃত্তির সমন্বয় সাধিত না হলে অন্বিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব। নিরপেক্ষ বিচারে বলতে হয় আনন্দমঠ পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত উপন্যাস নয়।

'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসে ইংরেজ-রাজত্বকালের সময়পর্ব উল্লিখিত হয়েছে। এই উপন্যাসেও 'অনুশীলনী তত্ত্ব' নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বহুপত্নীক ব্রজেশ্বরের পরিত্যক্তা স্ত্রী প্রফুল্ল গৃহত্যাগ করে অসমসাহসিকতা ও বাক্‌পটুতায় সেকালের কিংবদন্তী দস্যুসর্দার ভবানীপাঠকের স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তারপর ভবানীপাঠকের ব্যবস্থাপনায় নিজ প্রতিভাবলে প্রফুল্ল কেমন করে শাস্ত্র, শস্ত্র, অশ্বারোহণ শিক্ষা ও যোগ্য নেতৃত্বদানের যোগ্য প্রমাণ দিয়ে দস্যুদলের রাণী দেবী চৌধুরাণীতে রূপান্তরিত হল। তারই ঘটনা-সংঘাতপূর্ণ কাহিনী হল 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাস। প্রফুল্ল দেবীচৌধুরাণী হয়ে উঠলেও তার 'প্রফুল্ল' সত্তার মৃত্যু হয়নি। তাই ঘটনাচক্রে স্বামী ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পরিণামক্রমে দেবী চৌধুরাণী তার দস্যুদলের নেতৃত্ব, ক্ষমতা ত্যাগ করে বধূবেশে ফিরে গিয়েছে ব্রজেশ্বরের সংকীর্ণ সংসার অঙ্গণে। অনেকে দেবী চৌধুরাণীর এই পরিণামকে উপন্যাসের একটি শিল্পগত ত্রুটি বলে উল্লেখ করেছেন এবং এর জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের চিরায়িত রক্ষণশীল জীবনদর্শনকে দায়ী করেছেন। বাঙালী নারীর কল্যাণী বধূরূপই বঙ্কিমচন্দ্রের কাঙ্ক্ষনীয় আদর্শ ছিল। আবার অনেকে বলেন, নারী যখন চারিত্রিক যোগ্যতা অর্জন করে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে ওঠে, তখনই সে সংসারে সম্মানের পাত্রী বলে বিবেচিত হয়, করুণার পাত্রী হিসাবে নয়। হৃতসম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য প্রফুল্লের দেবী চৌধুরাণী হয়ে ওঠার আবশ্যকতা ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভার চরম উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়েছে তিনখানি সামাজিক পারিবারিক উপন্যাসে। উপন্যাস তিনটি হল 'বিষবৃক্ষ', 'রজনী' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। তিনটি উপন্যাসেরই মুখ্য চালিকা-শক্তি নরনারীর প্রেম। এই প্রেম কখনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্বের মানস-অসংযম, কখনো জীবনের বক্রপথে চালিত হয়ে অবৈধ প্রণয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত, আবার কখনো বৈধব্য জীবনের অসংযমের পরিচায়ক। প্রেমের এই জটিল-কুটিল রূপ ছাড়াও প্রেমের কল্যাণীরূপ ভাবনাও বঙ্কিমচন্দ্রে আছে।

টিপ্পনী

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক পারিবারিক উপন্যাস। এর নামকরণ ব্যঞ্জনাধর্মী। উপন্যাসটিতে পুরুষের অসংযত কামনার এক ট্র্যাজিক-পরিণামী ঘটনা রূপায়িত হয়েছে। অভাগিনী কুন্দনন্দিনীর অকালবৈধব্য এবং বৈধব্যজীবনে তারই আশ্রয়দাতা নগেন্দ্রনাথের কামনার পাত্রী হয়ে ওঠা এবং নগেন্দ্রর স্ত্রী সূর্য্যমুখীর উদ্যোগে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রর বিবাহদান, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ এবং শেষতঃ কুন্দনন্দিনীর বিষপানে আত্মহত্যা-'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই বিষময় পরিণামের কাহিনী উপন্যাসে বর্ণনা করে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের অন্তিমে এসে বিশুদ্ধ শিল্পের পরিবর্তে ন্যায়ধর্মের প্রচারক হয়ে উঠেছেন এবং দেশের ঘরে ঘরে বিষবৃক্ষের পরিবর্তে অমৃতবৃক্ষে অমৃতফল ফলে ওঠার আশা পোষণ করেছেন। এই উপন্যাসে দেবেন্দ্র ও হীরার কাহিনীগ্রন্থনেও বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব অপরিসীম।

'রজনী' বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব-আঙ্গিকের উপন্যাস। রজনী, অমরনাথ, শচীন্দ্র এবং লবঙ্গলতা এই চারটি চরিত্রের আত্মকথনমূলক কাহিনীর মাধ্যমে উপন্যাসটি গঠিত হয়েছে-বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন যে উইলকি কলিন্‌সের 'Woman in White'-গ্রন্থে প্রথম এই রীতিটি ব্যবহৃত হয়েছিল। অন্যদিকে উপন্যাসের চরিত্র 'রজনী' পরিকল্পিত হয়েছে ইংরেজ ঔপন্যাসিক লিটনের 'Last Days of Pompeii'-র এক কানা ফুলওয়ালী নিদিয়া চরিত্রের ছাঁচে। 'রজনী' উপন্যাসের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি হল এই যে, এখানে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অপরাপর উপন্যাসে সমাজবিগর্হিত বা সমাজ অননুমোদিত প্রেমের প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন, সেই অসহিষ্ণুতা এখানে অনেকটাই স্নিগ্ধ সহিষ্ণুতায় পরিণত হয়েছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এই উপন্যাসে বিধবা যুবতী নারীর ভোগসর্বস্ব প্রেমের ভয়ংকর পরিণতি প্রদর্শিত হয়েছে। উপন্যাসটির নায়ক গোবিন্দালাল স্ত্রী ভ্রমর বর্তমান থাকতেও বালবিধবা রোহিনীর প্রতি সে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। মোহান্ধ গোবিন্দলাল রোহিনীর স্বরূপ প্রথমে উপলব্ধি করতে পারেনি। রোহিনীর মধ্যে ছিল একনিষ্ঠতার অভাব, গোবিন্দলাল যেদিন অন্যাসক্তা রোহিনীকে আবিষ্কার করল সেদিন সে তাকে হত্যা করল। রোহিনী প্রাণ দিল বটে, কিন্তু গোবিন্দলাল ভ্রমরকে চিরদিনের জন্য হারাল—প্রেমের দিক থেকে, প্রাণের দিক থেকেও। ভ্রমরের মৃত্যু গোবিন্দলালকে বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষা দিল এবং সন্ন্যাসজীবনে 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর' পাওয়ার আত্মপ্রবঞ্চনায় সাময়িকভাবে মনের ক্ষতের উপর যন্ত্রণা উপশমের প্রলেপ দিল।

এই উপন্যাসে রোহিনীর মৃত্যু সমালোচক ও পাঠকমহলে সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছিলেন- 'রোহিনী মরিল কাহার অপরাধে?' এ-প্রশ্নের মীমাংসা দীর্ঘদিনেও হয়নি। তবে অনেকেই রোহিনীর মৃত্যুর জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মাত্রাতিরিক্ত নীতিবাদকেই দায়ী করেছেন। আবার ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বিদগ্ধ ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন 'রোহিনীর

অপমৃত্যু তাহার কলঙ্কিত ভোগসর্বস্ব প্রেমের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য মৃত্যু।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা', 'রাধারাণী' কোনটাকেই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না- এদের মধ্যে বড়গল্পের শিল্পধর্মই অধিকতর প্রকট।

উপন্যাস শিল্পে বঙ্কিমচন্দ্র একজন বড় শিল্পী। প্রেমই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। মানবজীবনের শুরুর ইতিহাস থেকে নানাবিধ মানসিক সংস্কারের মধ্যে প্রেমকে অন্যতম আদিম বৃত্তি বলে আখ্যা দেওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের কাহিনী নির্বাচনে সেজন্য প্রেমের বিচিত্র গতিকেই পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। সেজন্যই তাঁর উপন্যাসের প্রদর্শনীশালায় এত বিচিত্র নরনারীর গৌরবময় সমাগম। এই প্রসঙ্গে খুব জোরের সঙ্গেই বলা যায়, বাংলা উপন্যাসক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মত ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব না ঘটলে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের মত ঔপন্যাসিকদের আবির্ভাব অনেক বিলম্বিত হত।

টিপ্পনী

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর বাংলা উপন্যাসে যিনি পালাবদল ঘটিয়েছিলেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাসের প্লট বা বৃত্ত গঠনে, চরিত্র-নির্মাণে, ভাষা ও সংলাপসৃষ্টিতে এবং চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্যে রবীন্দ্র-উপন্যাস সর্বপ্রথম আধুনিক উপন্যাসের যথার্থ মানকে স্পর্শ করেছিল। সাহিত্যের আর পাঁচটি শাখার মত উপন্যাস নিয়েও রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষা উল্লেখ করার মতো। বিষয়বস্তু-চরিত্র-আঙ্গিক - সব ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথ নতুনত্বের সন্ধানী।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন-

১) ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস

২) দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস

৩) বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাস

৪) মিস্টিক ও রোম্যান্টিক উপন্যাস।

কোনো কোনো সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে ইতিহাস ও রোমান্সনির্ভর উপন্যাস, জীবনসমস্যামূলক উপন্যাস, রাজনৈতিক ও সমাজজীবনমূলক উপন্যাস এবং রোম্যান্টিক ও তত্ত্বমূলক উপন্যাস ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ড. বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত শ্রেণীবিভাগটিকেই গ্রহণ করছি।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকার জন্য একটি ধারাবাহিক উপন্যাস রচনা করেন, উপন্যাসটির নাম 'করুণা'(১৮৭৭-৭৮)। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর উপন্যাসটিকে শিল্পগুণের বিচারে দুর্বলশ্রেণীর রচনা বলে মনে করেছিলেন, যার জন্য 'করুণা'র পরবর্তী প্রকাশনা তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

টিপ্পনী

ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস ঃ

উপন্যাসের যথার্থ শিল্পবৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাট' রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস-গ্রন্থ। রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয় (১৮৮৩)।

উপন্যাস রচনার সূচনালগ্নে রবীন্দ্রনাথ সেযুগের অত্যন্ত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত রোম্যান্সধর্মী উপন্যাসের অনুসারী হয়ে পড়েছিলেন। রোম্যান্সের রহস্যময়তা ও কাব্যিকভাষার মাধুর্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে যে গতি ও সৌন্দর্য নিয়ে এসেছিলেন উনিশ শতকের শেষে এসে রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমপ্রবর্তিত সেই পথেই পদচারণা করলেন।

যশোরের অধিপতি প্রতাপাদিত্য একসময় প্রায় জাতীয়-বীরের মর্যাদা পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সিংহাসন-আরোহণের পিছনে ছিল রক্তপারের মত বীভৎসতা।রবীন্দ্রনাথ হিংসা, ক্ষমতার লোভ ইত্যাদিকে কোন দিনই সমর্থন করেননি—তাই প্রতাপাদিত্য তাঁর দৃষ্টিতে শ্রদ্ধেয় বীরচরিত্র নয়। 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়, তাঁর পুত্র উদয়াদিত্য এবং কন্যা বিভার ভূমিকা অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাস হিসাবে বৌঠাকুরাণীর হাটকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বলা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস হল 'রাজর্ষি'। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। পরবর্তীকালে এই উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন তাঁর 'বিসর্জন' নাটকটি। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের কাহিনীটি স্বপ্নলব্ধ বলে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। শাস্ত্রীয় আচার ও পূজা অনুষ্ঠানেরর অঙ্গ হিসাবে যে বলিদান প্রথার প্রচলন ছিল, ত্রিপুরারাজ গোবিন্দমাণিক্য তাঁর রাজ্যে সেই বলিদানপ্রথা বন্ধ করে দিলে রাজপুরোহিত রঘুপতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল কিন্তু পরিণামে রাজার প্রাণবাদেরই জয় ঘোষিত হয়ে উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে। এই উপন্যাসটি নারীচরিত্র বিবর্জিত। এখানকার কাহিনী, চরিত্র ও ঘটনাধারার মধ্যে উপন্যাসের শিল্পবিশিষ্টতা অনেকখানি পরিণতি অর্জন করেছে।

দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস ঃ

১৩০৮-১৩০৯ সাল পর্যন্ত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'বিনোদিনী' নামে. রবীন্দ্রনাথের একটি অসাধারণ উপন্যাস প্রকাশিত হয়।এই 'বিনোদিনী'ই পরবর্তীকালে 'চোখের বালি' নাম পরিগ্রহ করে। চোখের বালি বাংলা উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য মাইল-ফলক। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে প্রথম আধুনিকতার সূচক এই উপন্যাসটি। সর্বোপরি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়ে প্রথম সার্থক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত করলেন রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসটির মাধ্যমে। 'চোখের বালি'-রা ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ জানালেন আধুনিক কথাসাহিত্যের লক্ষ্মণ হল 'ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, চরিত্রের আঁতের কথাকে বের করে দেখানো।'

এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসের চিরায়ত ত্রিভুজ সমস্যা সৃষ্টির ছকটি ভেঙ্গে ফেলে চতুর্ভুজ সমস্যার সৃষ্টি করলেন। চোখের বালি হল মহেন্দ্র-বিনোদিনী-আশালতা-বিহারী-এই চরিত্র চতুষ্টয়ের জীবনের জটিল টানাপোড়েনের

মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী। এই উপন্যাসের বিনোদিনী আধুনিক নারীজীবনের যথার্থ প্রতিনিধি—বিনোদিনী বিদুষী, বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্ববতী ও স্পষ্টবাক্। বিনোদিনীর অচরিতার্থ প্রেমের তীব্র তান্ডবে মহেন্দ্র-আশালতার দাম্পত্যজীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল—আদর্শবান চরিত্র বিহারী সেই বিপন্নতা থেকে বন্ধু মহেন্দ্র ও বৌঠান আশালতাকে উদ্ধার করে উপন্যাস ঘটনায় আপাতস্থিতাবস্থা নিয়ে এসেছিল। আসলে বিনোদিনীর কামনার পুরুষ বিহারী, স্থূলরুচিসম্পন্ন মহেন্দ্র নয়। বিহারীর নীরবতাই বিনোদিনীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে, এবং তার প্রতি বিহারীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই মহেন্দ্রর সঙ্গে তার পলায়ন। পরিণামে বিহারীর প্রেমের-স্বীকৃতি লাভ করে বিনোদিনী স্থূল জীবনাসক্তি বিসর্জন দেয় এবং কাশীবাসিনী হয়। বিনোদিনী দেশান্তরী হলেও আশালতার দাম্পত্য জীবনে বিনোদিনী চোখের বালির মতই অস্বস্তি জাগিয়ে রাখল কারণ দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় চরিত্র মৃত্যুহীন। 'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের মাতৃচরিত্রের চিরায়ত কল্যাণময়ী রূপটি কে ভেঙ্গে দিয়েছেন। এই উপন্যাসে মহেন্দ্র-জননী রাজলক্ষ্মী যেন এক ধ্বংসময়ী জননী, যে জননী পুত্রবধূকে প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভেবে সংসার ভাঙার খেলায় মেতে উঠেছেন।

'কপালকুন্ডলা'র পর বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন 'মৃণালিনী', তেমনি 'চোখের বালি'র পর রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি (১৩১০-১১ সালে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত) দুর্বল সৃষ্টি বলেই প্রতিপন্ন হয়। 'চোখের বালি'র তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্ব-সচেতনতা, চারিত্রিক গভীরতা এবং বস্তুধর্মী বিশ্লেষণীক্ষমতা এখানে রোম্যান্টিকতার ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এই পর্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'যোগাযোগ'(১৯২৯)। 'তিনপুরুষ' নামে এটি প্রথমে বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসের বিষয়বস্তু হল মানসিকতার বিভিন্নতার কারণে দাম্পত্যজীবনের সংকট প্রদর্শন। কুমুদিনী তার অগ্রজের শান্ত, স্নিগ্ধ, উদার ও মানবিক চারিত্রিক আদর্শে আজন্ম বড় হয়ে উঠলেও ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে যার বিবাহ হয়, সেই মধুসূদন স্থূল ও বিকৃত রুচির অধিকারী; মধুসূদনের মধ্যে রয়েছে ধনগর্ব—নৈতিকতার দিক থেকেও সে স্খলিত। দাম্পত্য সম্পর্কে তার ধারণা মধ্যযুগীয়। এই অস্বস্তিকর পরিবেশে কুমুদিনীর চরম মানসিক যন্ত্রণা ও দুঃখভোগের থেকে কুমুদিনীর সন্তানসম্ভবা হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসঘটনায় একটা সমাধানসূত্র আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এই সমাধান কখনোই কুমুদিনী চরিত্রের প্রতি সুবিচার বলে মনে হবে না।

বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাস ঃ

এই পর্যায়ের,'গোরা'(১৯১০) সমগ্র রবীন্দ্র উপন্যাস ও বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের একটি অনন্য সংযোজন। 'গোরা'কে মহাকাব্যোপম উপন্যাস ('Epic Novel') বলা হয়। দেশ ও জাতির সামগ্রিক রূপ-পরিচয় এখানে অসাধারণ বস্তুধর্মী ও জীবনঘনিষ্ঠ সচেতনতা নিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। 'গোরা'র বক্তব্যবিষয় অত্যন্ত সুগভীর ও সুপ্রসারিত। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ দিকটিও এই উপন্যাসে আভাসিত হয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নির্বিশেষে ইংরেজবিরোধী আর ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণতঃ ভারতবিরোধী। রবীন্দ্রনাথের মতে বিরোধের দ্বারা বিরোধের অবসান হয় না, বিরোধের অবসান হয় মানবাত্মার মিলনের দ্বারা। গোরা চরিত্রে মানবাত্মার মিলনের সেই আকুতি প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে সংকীর্ণ ধর্মবোধ এবং উদার মানবতাবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উপন্যাসটির মধ্যে আছে।

টিপ্পনী

গোঁড়া হিন্দু পরিবেশে বড়-হয়ে-ওঠা গোরা প্রথমে হিন্দুত্বের প্রতিনিধিত্ব করলেও তার অন্তরে ক্রমজাগরিত উদার ভারতচেতনা একসময় তাকে সকল সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক ধারণার ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছে।

গোরা জন্মসূত্রে ভারতীয় নয়- কিন্তু ভারতীয়ত্বের চেতনায় সে উজ্জ্বল। কৃষ্ণদয়ালের মুখে তার আইরিশ পরিচয় পেয়ে সে বিহ্বল হয়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত সুচরিতার প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হয়ে গোরা মানবাত্মার মহামিলনের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে। অনেক চরিত্র, কাহিনীর বিবিধ উত্থান-পতন, বক্তব্যের বৈচিত্র্য, চরিত্রের নানাবিধ মানসিক সংগঠন এবং মহাকাব্যধর্মী অর্থগভীর ভাষাবৈশিষ্ট্য—সব মিলিয়ে গোরা সত্যিসত্যিই একটি মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস।

টিপ্পনী

রাজনৈতিক সমস্যা ও নরনারীর হৃদয়ঘটিত দাম্পত্য সমস্যার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'ঘরে-বাইরে'(১৯১৫) উপন্যাসটি।বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন- উত্তর পরিস্থিতিতে দেশীয় রাজনীতির সংকীর্ণতা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল এবং তিনি ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রেক্ষাপট থেকে স্বেচ্ছায় সরেও যাচ্ছিলেন। কিন্তু মানসিকভাবে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। দেশের রাজনীতিবিদ্দের ক্ষমতালোভী-অর্থলোভী স্বার্থপরতা, দেশের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রবণতা এবং অনাবশ্যক জাতীয়তাবাদী বাগাড়ম্বর প্রিয়তা তিনি কখনোই পছন্দ করতেন না। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় তামসিক ভাবসম্পন্ন স্বজাতির একটা স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'ঘরে বাইরে'। বিমলা, স্বামী নিখিলেশ ও বন্ধু সন্দীপের এক ত্রিভুজ চরিত্র সম্মিলনে 'ঘরে বাইরে'র কাহিনী-অংশ আন্দোলিত হয়েছে।

এই উপন্যাসে একদিকে নিখিলেশের উদার দাম্পত্যসম্পর্কবোধ এবং বিমলার চরম অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যদিকে চতুর, শঠ এবং ক্ষমতা ও অর্থলোভী দেশনেতা সন্দীপের মেকি দেশপ্রেমের মুখোশ খুলে ভারতীয় রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপটিকে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে।অমূল্য এবং চন্দ্রনাথ মাস্টার এই উপন্যসের দুটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। এই উপন্যাসের রাজনৈতিক বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। কোন কোন ক্ষেত্রে তা একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক।বিশেষতঃ একক প্রচেষ্টায় নিখিলেশের দেশহিতব্রত পালনের সার্থকতা কতখানি- সে উত্তর এখানে পাওয়া যাবে না।

আক্ষরিক অর্থেই 'চার অধ্যায়' হল চারটি অধ্যায়ের সমন্বয়ে গ্রথিত উপন্যাস।একটি বিশেষ রাজনৈতিক বক্তব্যই উপন্যাসটির উপজীব্য। সমকালীন উগ্রজাতীয়তাবাদ, সশস্ত্র আন্দোলন ইত্যাদির নিষ্পেষণে নরনারীর হৃদয়ে জাগরিত স্বাভাবিক প্রেম কিভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং সেই প্রেক্ষিতে তৎকালীন দিশাহীন রাজনীতির হালচালটি নগ্ন থেকে নগ্নতর হয়ে ওঠে, 'চার অধ্যায়'-এ রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়গুলি নিজস্ব ধারণা ও বিশ্বাসের দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই উপন্যাসে অতীন্দ্র-র কাব্যিক কথোপকথন, ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব-ঋদ্ধ কর্কশ ভাষণ পাঠককে উপন্যাসের প্রতি বাড়তি মনোযোগী করে তোলে।

আবার 'চার অধ্যায়' রচনা করে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য পাঠক ও বিপ্লববাদীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিলেন। বিপ্লববাদীদের অনেকে দুখঃও পেয়েছিলেন কারণ রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে বিপ্লববাদের পথকে সমর্থন করেননি।এই উপন্যাসটি লেখার পর রবীন্দ্রনাথের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছিল যখন তাঁকে কেউ কেউ ব্রীটিশের অনুগত, ব্রীটিশের পক্ষসমর্থনকারী ইত্যাদি অপবাদে অপদস্থ করেছিল। কিন্তু ভারতীয় সশস্ত্র আন্দোলনের বহুক্ষেত্রে বিপ্লবীদের

সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগাযোগ বা বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করার উদাহরণ অজস্র আছে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের তিনটি হতাশাজনক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে লেখা এই উপন্যাসটিতে সমকালীন রাজনীতির সমালোচনা থাকলেও রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়'কে নরনারীর প্রেমসম্পর্কের উপন্যাস বলেই মন্তব্য করেছিলেন।

মিস্টিক ও রোম্যান্টিক উপন্যাস ঃ

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ'কে মিস্টিক শ্রেণীর উপন্যাস বলা যায়। জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী ও শ্রীনিবাস শীর্ষক চারটি ছোটোগল্পের সমাহার 'চতুরঙ্গ'(১৯১৫) উপন্যাস। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকায় গল্পাকারেই এগুলি প্রকাশিত হয়। পরে 'চতুরঙ্গ' নামে উপন্যাস-আকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির মধ্যে চেতনা প্রবাহরীতি-মূলক উপন্যাসের লক্ষণ আছে। জ্যাঠামশায়ের অধ্যাত্মচেতনা বা ধর্মবোধ, দামিনীর অদম্য প্রেমাকাঙ্ক্ষা, শচীশের প্রেমভাবনা, 'শ্রীবিলাসের নিষ্ঠা' সব মিলিয়ে এই উপন্যাসে কখনো মগ্নচৈতন্যের উদ্ভাসন, কখনো গুরুবাদের মিষ্টিসিজম্, কখনো দেহ-মনোবেষ্টিত প্রেমাকুতি আবার কখনো দামিনীর অতৃপ্ত প্রেমবাসনার আবেগময় আর্তি উপন্যাসটিকে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। উপন্যাসটি আগাগোড়া সাধুভাষায় রচিত।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'(১৯২৯) রোম্যান্টিক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত। গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত এই উপন্যাসে ভাষার তীব্র অন্তর্শক্তি, যৌবনরাগের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি, কল্পনাশক্তির অপ্রতিরোধ্য ইন্দ্রজাল আর চরিত্রসৃষ্টির মৌলিকত্ব অসাধারণ শিল্পকৌশলে পরিবেশিত হয়েছে। সেকালের পাঠককুল 'শেষের কবিতা'র আকস্মিক আবির্ভাবে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন।

অমিত-লাবণ্য-শোভনলাল-কেতকী-এই চারটি চরিত্রকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক প্রেমভাবনা এক আশ্চর্য জগতে এসে উপনীত হয়েছে। বিবাহ ও ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিবাহকে ঘটির জল, আর ভালোবাসাকে দীঘির জলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে তাই অমিত লাবণ্যকে নয়, বিবাহ করে কেতকীকে (কেটি), আর লাবণ্য পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয় শোভনলালের সঙ্গে। শেষের কবিতার পরিণাম হয়তো কবি-কল্পনার ফসল, কিন্তু 'শেষের কবিতা' সব দিক থেকেই সে-যুগের ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস—কল্লোলযুগের যৌবনোচ্ছ্বাসকেও সম্ভবতঃ এই উপন্যাসটি অতিক্রম করে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের দুই বোন (১৯৩৩) বা 'মালঞ্চ'-এ (১৯৩৪) উপন্যাসের বিস্তার বা গভীরতা নেই। উপন্যাস দুটিতে নারীর সেবাময়ী, মমতাময়ী ও কল্যাণী মাতৃমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস লক্ষিত হবে।

সাহিত্যের সব ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যসন্ধানী—উপন্যাস ক্ষেত্রটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে রবীন্দ্র-উপন্যাসের গুরুগম্ভীর ভাব, চরিত্রের আভিজাত্য, শিক্ষিত মানসিকতা, ভাষার ঐশ্বর্য এবং অর্থগভীরতা সাধারণ পাঠককুলের কাছে 'সহজপাচ্য' ব্যাপার ছিল না- সে কারণেই উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ মহৎ শিল্পী বটে, কিন্তু বঙ্কিম-শরৎ-তারাশঙ্করের মতো জনপ্রিয় নন।

ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

টিপ্পনী

বাংলা উপন্যাস ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরাধিকারী হলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)। বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত সুদীর্ঘ ঔপন্যাসিক জীবনে তিনি ষাটটিরও বেশী উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমিকা শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত—নাগরিক জীবন থেকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সবই তাঁর নখ-দর্পণে। তারাশংকরের প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি'র (১৯৩১) মধ্যেই ভবিষ্যতের একজন মহৎ কথাশিল্পীর আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি ছিল। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল, অন্ত্যজ লোকসমাজ, ভদ্রসমাজ-নিন্দিত আঞ্চলিক ভাষা এককথায় সাধারণ মানুষের জীবনকেন্দ্রিক সমস্ত উপকরণ তারাশংকরের রচনাতেই সর্বপ্রথম সবিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে উপন্যাস শিল্পে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা ঘটনা যেমন যুদ্ধ,মন্বন্তর, স্বাধীনতা আন্দোলন,রাজনীতি, সামন্ততন্ত্রের অবসানে ধনতন্ত্রের আগমনের যুগসন্ধিক্ষণ ইত্যাদিকে তারাশংকর সচেতন বাস্তববুদ্ধির সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন।

চিহ্নিতকরণের সুবিধার জন্য তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেব। যেমন-

আঞ্চলিক উপন্যাসঃ

গণদেবতা (১৯৪২), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪), হাঁসুলীবাঁকের উপকথা (১৯৫১), নাগিনীকন্যার কাহিনী (১৯৫২), কালিন্দী (১৯৪০), শুকসারী কথা (১৯৬৭) ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাসঃ

গন্না বেগম (১৯৬৫), অরণ্যবহ্নি (১৯৬৬), শঙ্কর বাঈ (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), ছায়াপথ (১৯৬৯)।

সামাজিক উপন্যাসঃ

মন্বন্তর (১৯৪৪), ডাকহরকরা (১৯৫৮), মহাশ্বেতা (১৯৬০), কন্নো (১৯৬২), কীর্তিহাটের করচা (১৯৬৭), ভুবনপুরের হাট (১৯৬৪) ইত্যাদি।

পারিবারিক উপন্যাসঃ

না (১৯৬০), চাঁপাডাঙ্গার বৌ (১৯৫৪) ইত্যাদি।

চরিত্রপ্রধান উপন্যাসঃ

আগুন (১৯৩৭), কবি (১৯৪৪), সন্দীপন পাঠশালা (১৯৪৬), তামস তপস্যা (১৯৫২), আরোগ্য নিকেতন (১৯৫৩), বিচারক (১৯৫৭), নিশিপদ্ম (১৯৬২), মঞ্জরী অপেরা (১৯৬৪) ইত্যাদি।

রাজনৈতিক উপন্যাসঃ

চৈতালী ঘূর্ণি (১৯৩১), পাষাণপুরী (১৯৩৩), ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), শতাব্দীর মৃত্যু ইত্যাদি।

বৈষ্ণবীয় ভাবপ্রধান উপন্যাসঃ

রাইকমল(১৯৩৪), স্বর্গমর্ত্য (১৯৬৮), রাধা (১৯৫৮) প্রভৃতি।

প্রেমনির্ভর উপন্যাসঃ

নীলকণ্ঠ (১৯৩৩), অভিযান (১৯৪৬), সপ্তপদী (১৯৫৭), বিপাশা (১৯৫৮), অভিনেত্রী (১৯৭০) প্রভৃতি।

উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ একটি স্থূল বিষয়মাত্র-কারণ কোন শ্রেণীই শিল্পক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়-একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রেম প্রসঙ্গ আছে, আঞ্চলিক উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আছে, কিংবা রাজনৈতিক উপন্যাসে আছে সমাজ প্রসঙ্গ। একথা মনে রেখেই আমরা মোটের উপর তারাশংকরের গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করব।

টিপ্পনী

তারাশংকরের ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, মন্বন্তর এই উপন্যাসগুলিতে বাংলা ও বাঙালী জীবনের যুগসন্ধিক্ষণের বা ক্রান্তিকালের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ক্রমক্ষীয়মান সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সাম্রাজ্যে ধনতন্ত্রের কৌশলী অথচ অনিবার্য অনুপ্রবেশের চিত্র তারাশংকরের একাধিক উপন্যাসে আছে। 'কালিন্দী' এই শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। গণদেবতা ও পঞ্চগ্রামে চিত্রিত হয়েছে যুগসৃষ্ট অর্থনৈতিক আঘাতে গ্রামীণ বাংলার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ছবি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাঢ়-বাংলার নানান সংস্কার-কুসংস্কার, প্রেম-অপ্রেম, ধনীর ধনগর্বিতা এবং দেবু পন্ডিতের মত ব্যক্তির আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন। সব মিলিয়ে উপন্যাস দুটি রাঢ় অঞ্চলের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রশালা হয়ে উঠেছে। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে রয়েছে কলকাতার বুকে মহাযুদ্ধকালীন বোমাতঙ্ক এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার গ্রামবাসীদের কলকাতায় আগমন এবং ফুটপাতে অসহায় মৃত্যুবরণের জন্য-এও এক কালান্তরের ইতিহাস।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, কালিন্দী, কবি, নাগিনীকন্যার কাহিনী প্রভৃতি উপন্যাসে তারাশংকর আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে লোকসমাজের সংস্কার-কুসংস্কার ও অধ্যাত্মবিশ্বাস, করুণ অর্থনৈতিক অবস্থা, স্থূল প্রেমচেতনা ইত্যাদিকে দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছন। এছাড়াও এগুলির মধ্যে পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে নবাগত সভ্যতার একটা দ্বান্দ্বিক পটভূমিকাও স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে।

তারাশংকরের এক অসাধারণ কাব্যিকগুণসম্পন্ন উপন্যাস হল 'কবি'। এই উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় ঝুমুর দলের নরনারীদের সঙ্গে ঔপন্যাসিক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তবে নিতাই কবিয়ালের চরিত্রই এখানে মুখ্য চরিত্র হিসাবে অঙ্কিত হয়েছে।

কৃষ্ণেন্দু আর রীণা ব্রাউনের জীবনের এক মমর্ন্তুদ টানাপোড়েনের কাহিনী 'সপ্তপদী' উপন্যাসটি। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর স্বরূপ-দর্শনের বিস্ময়কর ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। সমালোচকের ভাষায় ''সমগ্র উপন্যাসখানি তারাশংকরের মৃত্যুদর্শনের এক আশ্চর্য্য দলিল।''

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকে আঞ্চলিক-উপন্যাস রচয়িতা বলে অবিহিত করতে চেয়েছেন। একথা সত্য, আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় তারাশংকর অত্যন্ত পটু ছিলেন, কিন্তু তিনি শুধুমাত্র আঞ্চলিক-ঔপন্যাসিক -এরূপ সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়। তারাশংকরের উপন্যাসের পটভূমি বিচিত্র—নাগরিক জীবনের পটভূমিকাতেও তাঁর উপন্যাসকাহিনী গড়ে উঠেছে।

তারাশংকরের ভাষা বস্তুধর্মী, অর্থগভীর,রাঢ় বাংলার প্রকৃতি চিত্রণে তিনি অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। রাঢ়ের রূঢ়-রূক্ষ প্রকৃতি তারাশংকরের লেখনীতে বাস্তবের অবিকল রূপ পেয়েছে।

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক – ঘ

আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত–আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্য

টিপ্পনী

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল। এই পর্বেই পাশ্চাত্যধর্মী বাংলা নাটক, উপন্যাস, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য সবকিছু মিলে বাংলা সাহিত্যে যেন যৌবনরসের বন্যা বয়ে গেল। বঙ্কিমচন্দ্রেরু উপন্যাস, মধুসূদন–দীনবন্ধুর নাটক আর এরই পাশাপাশি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়–প্রবর্তিত আখ্যানকাব্য বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি অভিনব আঙ্গিকের জন্ম দিল। ইংরেজী কাব্যকবিতা,স্কট–ম্যুর–বায়রণের ইতিহাস–নির্ভর রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাবে রঙ্গলাল তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী আবার কখনো ঘটনাশ্রয়ী একাধিক আখ্যানকাব্য রচনা করলেন। তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'শূরসুন্দরী','বীরবাহুকাব্য' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে রঙ্গলালের মধ্যে মহাকবির প্রতিভা ছিল না, পাশ্চাত্য শিল্পকর্মকেও তিনি পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারেননি আবার রক্ষণশীলতার বাতাবরণ ছিন্ন করে যথার্থ আধুনিক হয়ে ওঠার অন্তর–প্রেরণাও তাঁর মধ্যে ছিল না। বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন দত্তই হলেন সেই কবি–ব্যক্তিত্ব, যাঁর কাব্যে সচেতনভাবে যুক্ত হয়েছিল আধুনিকতার চেতনা,ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্রোহ এবং উনিশ শতকের নবজাগ্রত রেনেশাঁস বা নবজাগরণ থেকে জাত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবতাবাদ। বন্ধু গৌরদাস বসাককে তিনি লিখেছিলেন –"আমি মহাকবি হবো,তুমি আমার জীবনী লিখবে গৌর।"জীবনের প্রথম লগ্ন থেকেই দূরতর শ্বেতদ্বীপ' ইংল্যান্ডের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন তিনি; লিখেছিলেন–"I sigh for Albion's distant shore." মিল্টন, বায়রণ, শেলী, কীট্স্–এর মত কবি হতে চেয়েছিলেন তিনি—রচনা করেছিলেন অনেক ইংরেজী কবিতা, 'A vision of the Past-Captive Ladie'- র মত ইংরেজী কাব্য,কিন্তু ইংরেজ কবিদের মত খ্যাতি তাঁর অধরাই রয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত কিছুটা আশাহত হয়েই বাংলা নাটক ও অব্যবহিত পরেই বাংলা কাব্যচর্চায় তাঁর আবির্ভাব এবং মহাকবির বিরল সম্মানে সম্মানিত হওয়ার সৌভাগ্যঅর্জন।

বাংলা কাব্য–কবিতার ক্ষেত্রে মধুসূদনের যুগান্তকারী ও বিপ্লবাত্মক উদ্ভাবন হল অমিত্রাক্ষর ছন্দ। পয়ার–ত্রিপদীর বেড়ী ভেঙ্গে তিনিই ভগীরথের মত প্রথম বাংলা ছন্দোপ্রবাহকে যৌবনের অমিতশক্তিতে দুকূলপ্লাবী করে তুললেন। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তাঁর প্রথম আখ্যানকাব্য হল ' তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। কাব্যটির প্রকাশকাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ। প্রকৃতির সৌন্দর্যবর্ণনায় মধুসূদন এখানে ইংরেজকবি কীট্সের সুযোগ্য শিষ্য হয়ে উঠেছেন।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের' কাহিনী মধুসূদন সংগ্রহ করেছেন সংস্কৃত পুরাণ থেকে। সুন্দ–উপসুন্দ এই দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন প্রচন্ড অত্যাচারী। তাদের অত্যাচার থেকে দেবকুলকে রক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল অনিন্দ্যসুন্দরী লাস্যময়ী রমণী তিলোত্তমাকে। এই তিলোত্তমাকে কেন্দ্র করে দৈত্যভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধ এবং পরিনামে পতন–এই হল কাব্যটির মুখ্য কাহিনীঅংশ। চারটি সর্গে মধুসূদন কাব্যটির আখ্যান–অংশকে বিভক্ত করেছেন। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যের যাবতীয় উপস্থাপনা অভিনব বলে স্বীকৃত হয়েছে। তবে প্রথম সৃষ্টির কিছু কিছু ত্রুটি এই কাব্যের ছন্দ, ভাষা,বাক্রীতি, চিত্রকল্প, উপমা ইত্যাদির ব্যবহারে লক্ষিত হবে। তবে এই ত্রুটি সত্ত্বেও বলতে হয় যে, এই কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্যকলার অপূর্ব মেলবন্ধন স্থাপিত হয়েছে। কালিদাস, মিল্টন, কীট্স প্রমুখ কবি–মহাকবির কবিত্ব–কারুকার্য ' তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের' কাব্য–দেহ নির্মাণে মধুসূদনকে অনেকখানি সহায়তা করেছে।

রোম্যান্টিক কবি–প্রকৃতি ছাড়াও এই কাব্যে মধুসূদনের কবিত্বের ক্লাসিক–গাম্ভীর্য মহাকবির কাব্যপ্রতিভাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন–

‘‘ ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে-
অভ্রভেদী,দেবতাত্মা,ভীষণ দর্শন,
সতত ধবলাকৃতি,অচল অটল,
যেন ঊর্ধ্ববাহু সদা শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী-
যোগকুলধ্যেয় যোগী ! ’’

টিপ্পনী

মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরবর্তী যুগান্তকারী রচনাটি হল একটি মহাকাব্য—নাম মেঘনাদবধ কাব্য।প্রথমে কাব্যটিদুটি খন্ডে প্রকাশিত হলেও (১৮৬১ খ্রীঃ) ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে খন্ডদুটি একত্রিত হয়ে প্রকশিত হয়। মেঘনাদবধ কাব্যের মূল কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল কিন্তু মধুসূদন এখানে বাল্মীকি-রামায়ণের যে চিরন্তন ঐতিহ্য এবং আর্যশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র সম্পর্কে বাল্মীকির যে দৃষ্টিভঙ্গি তার মূলে প্রবল ‘কুঠারাঘাত’ করেছেন।মধুসূদনের মূল্যায়নে আর্যচন্দ্রমা রামচন্দ্র নন, রাক্ষসরাজ রাবণই হলেন ‘Grand fellow.’ রামচন্দ্র এবং তাঁর অনুচরবর্গ সম্পর্কে মধুসূদনের বিদ্রোহাত্মক মন্তব্য- ‘I despise Rama and his rabble.’ সদম্ভে তিনি একথাও বলেছিলেন, ‘ I don’t care a pin’s head for Hinduism’- আর বলেছিলেন যে ,তাঁর কাব্য হবে তিন-চতুর্থাংশ গ্রীক।

কাব্যটির মধ্যে কবি মধুসূদন পাশ্চাত্য ‘heroic tale’ -এর আদর্শ গ্রহণ করেছেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ ভারতীয় মহাকাব্যের যে আদর্শ বা বৈশিষ্ট্য তার অনেকগুলিই গৃহীত হয়েছে। তবুও সার্বিক বিচারে প্রাণধর্মের দিক থেকে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ পাশ্চাত্যমহাকাব্যেরই অনুসারী।

নয়টি সর্গে বিন্যস্ত ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ রাবণের বীরপুত্র বীরবাহুর অকাল-মৃত্যু থেকে শুরু করে রাবণের প্রিয়তম পুত্র ‘লঙ্কার পঙ্কজ-রবি’ মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ‘তস্করবেশী’ লক্ষ্মণের হাতে অসহায় মৃত্যুবরণ,তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া,ও পুত্রবধূ প্রমীলার সহমরণযাত্রার করুণকাহিনী দিয়ে আলোচ্য কাব্যের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।কাব্যের সূচনায় মধুসূদনের অঙ্গীকার ছিল, ‘গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত’-এর; কিন্তু কাব্য-পরিণামে বীররসের প্রাবল্যের পরিবর্তে ইন্দ্রজিতের সৎকারজনিত কারুণ্যে ‘সপ্ত দিবা-নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে’-এই বিষণ্ণতাই প্রাধান্য পেয়েছে।

‘মেঘনাদবধ কাব্যের’ ঘটনাকাল অত্যন্ত পরিমিত-মোট তিনদিন দু’রাত্রির ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। দেশ-বিদেশের বহু কবির ‘কাব্য-ফুল-বনমধু’ নিয়ে যে নতুন ‘মধুচক্র’ কবি রচনা করেছেন সেখানে বাল্মীকি, কালীদাস, সংস্কৃত বহু পুরাণ-উপপুরাণ, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কালীরামদাসের মহাভারত প্রভৃতি ছাড়াও পাশ্চাত্যের মহাকবি হোমারের ইলিয়ড,ওডিসি, ভার্জিলেব ‘ঈনিড’, ট্যাসোর ‘জেরুজালেম ডেলিভার্ড’, দান্তের ‘ডিভাইন কমেডি’, মিল্টনের ‘প্যারাডাইস লস্ট’ ইত্যাদির প্রভাব আছে।

মেঘনাদবধকাব্যের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল,মধুসূদন এখানে বিজাতীয় সংস্কার ও মোহবশে রামচন্দ্রকে ধূলিমলিন করে রাবণকে বড়ো করে দেখিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবি আর্য-নিন্দিত রাবণের মধ্যেই দেখেছিলেন নবযুগের দৃপ্ত মানবিকতাবাদ, পুরুষাকারশক্তি,স্বদেশানুরাগ ও আত্মশক্তিতে আস্থাশীল এক আদর্শ মর্ত্যমানবকে। সেই তুলনায় রামচন্দ্রকে তাঁর মনে হয়েছিল দৈবকরুণাপ্রত্যাশী, পরনির্ভরশীল ও দুর্বলচরিত্র এক ব্যক্তি। এই ধারণা থেকেই প্রাচীনযুগের Authentic Epic -এর আদর্শ পরিত্যাগ করে মধুসূদন আধুনিক Literary Epic -এর আদর্শে ‘মেঘনাদবধ কাব্যের’ কাহিনী, চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যের

পুনর্বিন্যাস করেছেন।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' মহাকবির ঐশ্বর্য ও কবি-প্রতিভা ছত্রে-ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানকার ভাষা, শব্দবৈভব, ছন্দ, উপমা, চিত্রকলা, দেশী-বিদেশী মহাকাব্যের আলংকারিক প্রয়োগ ও ঘটনা-প্রভাব কাব্যটির রাজকীয় আভিজাত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। তবে এই কাব্যের ঘটনা-বিন্যাসে চতুর্থ সর্গের সীতাউপাখ্যান এবং অষ্টম সর্গের নরকবর্ণনা মূল কাব্যকাহিনীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ নয়; বিশেষতঃ অষ্টম সর্গের কাহিনীর সঙ্গে মূলরামায়ণ-কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই—দান্তের 'ডিভাইন কমেডির' নরকবর্ণনার দ্বারা কবি এখানে ভীষণভাবে প্রভাবিত। এখানকার ভাষাবৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে অনেক সমালোচক মনে করেছেন, মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা বড় বেশী আভিধানিক। তবে এক্ষেত্রে মহাকাব্যের ভাষার গুরুগাম্ভীর্যের দিকটির কথাও মনে রাখতে হবে। কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''বৃত্রসংহার কাব্য''-কেই শ্রেষ্ঠ বলে মত প্রকাশ করেছিলেন-কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

টিপ্পনী

মধুসূদনের পরবর্তী রচনা 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' (১৮৬১) সম্পূর্ণ ভিন্নরস ও ভিন্নরীতির কাব্য। বৈষ্ণবীয় ভক্তিরস থেকে নয়,'Poor lady of Braja' শ্রীরাধার মানবিক মনোভাবনার কাব্যরূপ হল 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য'। এই কাব্যে বিরহবিধুরা শ্রীরাধার মনোদুঃখ বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটি মিলনাত্মক পটভূমিকায় সমাপ্ত করার অভিলাষ কবির ছিল,কিন্তু সেই ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়নি। অতি সরস ও মিত্রাক্ষর রীতির ছন্দে এই ছোট্ট কাব্যে মধুসূদনের গীতিধর্মী মানসিকতাই যেন প্রাধান্য পেয়েছে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের আর একটি অভিনব আঙ্গিকের রচনা-'বীরাঙ্গনা কাব্য'। পাশ্চাত্যের পত্রকাব্যের আদর্শে এটি লিখিত হয়। ছন্দের বিশুদ্ধতা, কবিত্ব,স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশরীতি এবং কাবৈশ্বর্যের বিচারে 'বীরাঙ্গনাকাব্যকে' মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলা যায়। প্রসিদ্ধ রোমান কবি পাব্লিয়াস্ ওভিদিয়াস্ ন্যাসোর (ওভিদ) 'Heroides' শীর্ষক পত্রকাব্যের আদর্শে মধুসূদন ভারতীয় পৌরাণিক রমণীদের অন্তর্লোকের এক অসাধারণ চালচিত্র রচনা করেছেন। তবে পাশ্চাত্যজীবনের দেহবাদী প্রেমের ভোগসর্বস্বতা, উদ্দামতা ও নীতিহীনতার দিকগুলি যথাসম্ভব বর্জন করে মধুসূদন নারীমনের স্বাভাবিক প্রেমবৃত্তি,অধিকারবোধ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদাকে অধিকতর মূল্য দিয়েছেন।

মধুসূদন 'বীরাঙ্গনাকাব্যে' একুশজন ভারতীয় নারীর পত্র-মাধ্যমে একুশটি পত্রকাব্য রচনার পরিকল্পনা করলেও শেষপর্যন্ত এগারোখানি পত্রকাব্য রচনা করতে সক্ষম হন- বাকী পত্রকাব্যের তিনি খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন মাত্র। বীরাঙ্গনা কাব্যের নারীচরিত্ররা নানাস্তরীয়—কেউ কুমারী, কেউ বিধবা, কেউ বা বিবাহিতা। চরিত্রগুলি দৈহিক শক্তিতে নয়-ব্যক্তিচরিত্রের তেজে,নারীমনের স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশে এবং নির্ভীক মতপ্রকাশে 'বীরাঙ্গনা' হয়ে উছেছে। পত্রকাব্যগুলির মধ্যে 'সোমের প্রতি তারা', দশরথের প্রতি কেকেয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা এবং 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রকাব্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বলা যায় 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র ভাব, ভাষা, ছন্দোমাধুর্য এবং কবিত্বের স্বতঃস্ফূর্ততা 'মেঘনাদবধ কাব্য' অপেক্ষাও উচ্চমানের। সবচেয়ে বড়কথা বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদনের নারীসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিকযুগের নারীব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষরবাহী।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রায় একশ'টি সনেটের এই সংকলনগ্রন্থে মধুসূদনের কবি-আত্মার এক ভিন্নতর রূপ উন্মোচিত হয়েছে। সুদূর বিদেশে বসে যখন কবি এই সনেটগুলি রচনা করেছেন তখন কবির স্বদেশ, স্বদেশের কৃতীসন্তান, এখানকার প্রকৃতি, কবিকে কতখানি ব্যাকুলিত ও 'নস্ট্যাল্জিক'

করে তুলেছিল তারই আবেগ-ঋদ্ধ আকুতি কবিতাগুলিতে অনুরণিত হয়েছে। মধুসূদনই বাংলা সনেটের প্রথম সার্থক প্রবর্তক। পেত্রাকীয় রীতির জটিল সনেট রচনায় মধুসূদনের সমকক্ষ আর কোন বাঙালী কবি একান্তই বিরল।

মধুসূদনের সাহিত্যজীবন স্বল্পকালের। এই স্বল্পকালমধ্যে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন বাংলা সাহিত্যে সেগুলির সবই অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। মধুসূদনই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা কাব্য-কবিতা-নাটক সর্বক্ষেত্রে একটা আধুনিকতার প্রাণশক্তি এনে দিয়েছিলেন এবং সমকালীন ও ভবিষ্যৎ সারস্বতসাধকদের মনে স্বাধীন কবিকল্পনাবৃত্তি পরিচর্যার সাহস যুগিয়েছিলেন।

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কাব্য কবিতা

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর কবি-পরিচয়কেই তাঁর শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পরিচয় হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি-সার্বভৌম, তিনি বিশ্বকবি—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আমি পৃথিবীর কবি'। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর -পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, গৃহশিক্ষক, জ্যেষ্ঠভ্রাতাদের সাহচর্য্য ও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া নিত্য উৎসাহ অতিবাল্য থেকেই রবীন্দ্রনাথের জন্মগত কবি-সত্তাকে সযত্নে লালন করেছিল। অতি শিশু বয়সে লেখা আমসত্ত্ব দুধে ফেলি/তাহাতে কদলী দলি থেকে শুরু করে ১২৮১ বঙ্গাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালক রচিত অভিলাষ' এই নাম পরিচয়হীন কবিতা এবং তারপর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুমেলা' উপলক্ষ্যে স্বনামে রচিত কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'ইত্যাদি দিয়ে কবিতা রচনার বা কবিতা -অনুশীলনের একটি পর্ব রবীন্দ্রকাব্যজীবনে পরিলক্ষিত হয়।

সূচনা পর্বেই কালিদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্য' ও শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদকার্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টিকে আরও বেশী প্রসারিত করে দিয়েছিল। পরবর্তীতে 'ভোরের পাখী' বিহারীলাল চক্রবর্তীর মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন আত্মমগ্ন ভাবজগৎকে—প্রকৃতি জগৎ, সৌন্দর্য্য জগৎ ও মানবজগৎকে 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে সৃষ্টির নতুন জগতে উত্তীর্ণ করিয়ে দেওয়ার কাব্যমন্ত্র। ধীরে ধীরে বালককবির কবি-আত্মা একদিন কৈশোরপ্রান্তে পৌঁছে গেল-গুহায়িত কবি-আত্মা চেতনার আলোয় আলোকিত হয়ে বেরিয়ে এল মুক্তজগতে—হল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চার বিভিন্ন স্তরকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল-

১. শৈশব বা সূচনাপর্ব (১৮৭৮-১৮৮১)

২. উন্মেষ পর্ব (১৮৮২-১৮৮৬)

৩. ঐশ্বর্য্য পর্ব (১৮৯০-১৮৯৬)

৪. অন্তর্বর্তী পর্ব (১৯০০-১৯১০)

৫. গীতাঞ্জলি পর্ব (১৯১০-১৯১৪)

৬. বলাকা পর্ব (১৯১৬-১৯২৯)

৭. অন্ত্যপর্ব (১৯২৯-১৯৪১)

শৈশব বা সূচনাপর্ব ঃ

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চার ইতিহাস উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর রুদ্রচন্ড, বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া ইত্যাদি গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্যের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে 'শৈশব সংগীত' কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতা, যেগুলি মোটামুটিভাবে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থ হিসাবে 'শৈশব সংগীত' ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই রচনাগুলিতে আবেগের অতিরেক, অতিশয়োক্তি ও রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাস কবিত্বের সংযমকে বিনষ্ট করেছে।

টিপ্পনী

উন্মেষ পর্ব ঃ

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। কাব্যগ্রন্থগুলি হল-সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২),প্রভাতসংগীত (১৮৮৩),ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪), ছবি ও গান (১৮৮৪), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) এবং এই সময়কালে রচিত শৈশবসংগীত কাব্যগ্রন্থের (১৮৮৪) কিছু কবিতা।

'সন্ধ্যাসংগীতের' কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে এখানকার 'কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে।' এই কাব্যগ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম নিজেকে খুঁজে পেলেন-রোম্যান্টিক ভাব আর ছন্দের নিজস্বতায়।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'প্রভাতসংগীত'-এ কবি-মনের বিষণ্ণভাব দূরীভূত হয়ে জগৎ-সংসার ও বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে মিলিত হওয়াব মুক্তানন্দভাব ফুটে উঠেছে। এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি যেন রবীন্দ্র-কাব্যভাবনার এক প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে—অসীমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এবং মনের তামসভাব দূর করে নব আলোকিত জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার একটা অন্তরপ্রেরণা এই কবিতায় সঞ্চার করেছে অভিনব জীবনবোধ।

বৈষ্ণব মহাজন-কবিদের কাব্য-আঙ্গিক ও ভাষারীতি অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ এরপর রচনা করেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। তবে এখানকার কবিতা বৈষ্ণবপদাবলীর মত অধ্যাত্মরস বা সাহিত্যরসের বিশিষ্টতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেননি, একথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''.... ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই।''

রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের উন্মেষপর্বে রচিত 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থটি নানা কারণে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। কাব্যগ্রন্থটি কতকগুলি সনেটের সমাহারে গ্রন্থিত। 'কড়ি ও কোমলের' প্রথম দিককার কিছু সনেটে রবীন্দ্রনাথের দেহ-নির্ভর ইন্দ্রিয়চেতনা, ভোগরাগ এবং 'যৌবনের মাদকরস' ক্ষরিত হয়েছে। এর জন্য রবীন্দ্রনাথকে বিস্তর সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ভোগকামনাময় প্রেমের সমর্থক ছিলেন না,তাই অচিরেই তিনি তাঁর কবি-দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটিয়ে এই কাব্যগ্রন্থের শেষের দিকের সনেটগুলিতে স্নিগ্ধ প্রেম ও শান্তজীবনবাদের ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

'ছবি ও গান' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে রয়েছে বিষয়ের বৈচিত্র্য। কবি এখানে রোম্যান্টিক কল্পনার কল্পজগৎ থেকে অনেকটাই মাটির বুকে নেমে এসেছেন। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যেও সেই মাটির স্পর্শ আমরা পেয়েছি এইভাবে-

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

(অতিরিক্ত সংযোজন)

ঐশ্বর্য পর্ব ঃ

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল- মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬) এবং চৈতালী। রবীন্দ্রনাথের প্রেম,প্রকৃতি এবং সৌন্দর্যবোধসম্পর্কিত ধারণার এক ক্রমিক উত্তরণ এই কাব্যগ্রন্থগুলির বিভিন্ন কবিতায় পরিদৃষ্ট হবে। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে প্রেম ও প্রকৃতি কবিমনে একপ্রকার দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। এই কাব্যে কবির প্রেমভাবনা ইন্দ্রিয়রাগকে উপেক্ষা করে অপার্থিব সূক্ষ্ম ভাবজগতে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়াসী- এখানেই কবির সেই প্রত্যয়িত উপলব্ধি নারীর উক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে এই ভাষায়-'অপবিত্র ও করপরশ সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।'

টিপ্পনী

'সোনার তরী' রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের এক অতুলনীয় সৃষ্টি। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে পদ্মার বুকে এবং প্রকৃতির উদার অনুষঙ্গে এখানকার অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থেই 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতায় নিরবধি প্রবহমান কালের বুকে জীবনের অবিচ্ছিন্ন অখন্ড রূপটিকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন আর 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় প্রকৃতি,বসুন্ধরা ও মানবের মধ্যে গড়ে তুলেছেন অচ্ছেদ্য প্রীতি ও স্নেহমমতামাখা মানবিক সম্পর্ক। 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির মুখ্য বিষয়বস্তু জগৎ ও প্রকৃতির বুকে প্রিয়জনকে আঁকড়ে ধরে রাখার 'যেতে নাহি দিব'-সূচক আকুতি-বাণী, কিন্তু পরিণামে 'যেতে দিতে হয়' এই নির্মম ভবিতব্য। 'সোনার তরী'র অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'সোনার তরী'-নাম কবিতা, 'পুরস্কার', 'ঝুলন', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'।এই কাব্যগ্রন্থের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র অপরিচিত রমণীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা ভাবনার সূত্রপাত হয়েছে বলা হয়।

'চিত্রা' শুধু রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়, সমগ্র বাংলা কাব্যজগতের এক অমূল্য সম্পদ। প্রেম, প্রকৃতি, মানবজীবন,দার্শনিকচিন্তা, সৌন্দর্যবোধ এবং রবীন্দ্রকাব্যজীবনের মূল চালিকাশক্তি জীবনদেবতার স্পষ্ট উপস্থাপনে এই কাব্যের অর্থমাত্রা বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। অপার্থিব, অলৌকিক স্বর্গলোক অপেক্ষা 'প্রেমধারা অশ্রুজলে'-সিক্ত 'ভূতলের স্বর্গখন্ডগুলি' এখানে কবির কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় হয়ে উঠেছে। এই কাব্যগ্রন্থের 'প্রেমের অভিষেক' এবার ফিরাও মোরে, অন্তর্যামী,স্বর্গ হইতে বিদায়, উর্বশী, বিজয়িনী, জীবনদেবতা প্রভৃতি কবিতা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিজগতের সম্পদবিশেষ। প্রাচীন ভারতবর্ষ,তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য,ইতিহাস চেতনা,কল্পজগৎ ইত্যাদি বিষয় 'চৈতালী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে-'চৈতালী' ঐশ্বর্য্য পর্বের চৈতালী ফসল।

অন্তর্বর্তী পর্ব ঃ

এই পর্বে রয়েছে 'কথা'(১৯০০),'কাহিনী'(১৯০০),'ক্ষণিকা (১৯০০), 'নৈবেদ্য'(১৯০১),'স্মরণ'(১৯০২-১৯০৩),'শিশু'(১৯০৬),'উৎসর্গ'(১৯১৪), 'খেয়া'(১৯৮০)।

'চৈতালী' কাব্যগ্রন্থের অতীতচারিতা,ইতিহাস চেতনার পুনরুল্লেখ দেখা গেল 'কথা ' 'কাহিনী' ও 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে। 'কল্পনা' এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের. একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা, বিশ্বশক্তির উপর নির্ভরতা, প্রাচীন ভারতীয় ভোগবিবিক্ত জীবনধর্মী এবং সমসাময়িক 'উদ্‌ভ্রান্ত' পৃথিবীর লোভ-লালসা, ক্ষমতাভোগ ও আগ্রাসন, অন্ধ জাতি-প্রেম এবং তার অনিবার্য পতনের ইঙ্গিতপ্রদান এই বিষয়গুলি প্রাধান্য লাভ করেছে। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির কোন শীর্ষনাম নেই-সেগুলি সংখ্যাচিহ্নিত।

কবির স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ 'স্মরণ' কাব্য-গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। শোকের ভাবাবেগ অপেক্ষা সংযত উপলব্ধি এখানকার কবিতাগুলিকে ভিন্ন তাৎপর্য দান করেছে।

'শিশু' ভিন্ন স্বাদের কাব্যগ্রন্থ। এখানকার কবিতাগুলি শিশুমনের উপযোগী করে লেখা হয়েছে। শিশুরা সরলমতি,তারা কপটতা জানে না,পার্থিব ধন-সম্পদে তারা অনাগ্রাহী-

'রতন-ধন খোঁজে না তারা,
জানে না জাল ফেলা
জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।'

টিপ্পনী

পরবর্তী কাব্য 'উৎসর্গের' কবিতাগুলিতে কবি-চিত্তের বেদনাভারাতুরতা আবার ফিরে ফিরে এলেও সেই ব্যক্তিবেদনাকে সর্বজনীন করে তোলার একটা প্রয়াস লক্ষিত হবে। 'খেয়া' কাব্য রচনার প্রাক্কালে ও সমকালে স্ত্রী, কন্যা, পুত্রের মৃত্যু কবিকে শোকাহত করেছিল-এই শোকভার লাঘব করার জন্য মানসিকভাবে তিনি অধ্যাত্মজগতে আশ্রয় খুঁজে ছিলেন-'খেয়া' কাব্যগ্রন্থে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

গীতাঞ্জলি পর্ব ঃ

গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪) এবং গীতালি (১৯১৫) এই কাব্যত্রয় নিয়েই রবীন্দ্র-কাব্যচক্রের 'গীতাঞ্জলি' পর্ব।

প্রখ্যাত রবীন্দ্র-সমালোচক ড. ক্ষুদিরাম দাস তাঁর 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরধারণাকে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস বা সংকীর্ণ অধ্যাত্ম-চেতনাজাত ঐশ্বরিক শক্তি বলে মনে করেননি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস সম্পর্কে অনুরূপ মত পোষণ করতেন। একথা মনে রেখেই 'গীতাঞ্জলি' পর্বে রবীন্দ্রনাথের পোষিত অধ্যাত্মচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদ 'Song Offerings' এর (বাংলা 'গীতাঞ্জলি'-র কবিতা সংকলনের সঙ্গে বেশ কিছু পার্থক্য আছে) জন্যই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন (১৯১৩ খ্রীঃ)। সমসাময়িক অশান্ত পৃথিবীর বুকে গীতাঞ্জলি পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে সত্য, শিব, সুন্দর ও শান্তির প্রতীকরূপে পরিগণিত হয়েছিল। এক সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবোধের আশ্রয়ে তারা খুঁজে পেয়েছিল অস্তির কল্যাণময় আশ্রয়। 'গীতিমাল্য' এবং 'গীতালি' তে 'গীতাঞ্জলি'রই ভাবনাপ্রবাহ একটা পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই গ্রন্থত্রয়ীর অধিকাংশ রচনারই একটি সাঙ্গীতিক মূল্য আছে।

বলাকা পর্ব ঃ

এই পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলি হল-'বলাকা' (১৯১৬),পূরবী (১৯২৫) এবং মহুয়া (১৯২৯)।

'গীতাঞ্জলি' পর্বের অধ্যাত্মরসমিশ্রিত অসংখ্য কবিতার পর রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে বেরিয়ে এল অপ্রতিহত গতিবেগের অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনাসমন্বিত কবিতাগুচ্ছ-কবিতাগুলি স্থান পেল যে কাব্যগ্রন্থে,তার নাম 'বলাকা'। অসীম আকাশে উড্ডীয়মান যে বলাকা বা হংসশ্রেণী, তাদের পাখায় যে গতির অফুরন্ত শক্তি-সেই গতিশক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজগতের জড় ও সজীব সবকিছুর মধ্যেই চিরায়ত শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করলেন। ফরাসী দার্শনিক বাগসঁ-এর 'এলান ভাইটাল'তত্ত্ব, উপনিষদের 'চরৈবেতি' মন্ত্র আর রবীন্দ্রনাথের চিরপরিবর্তনশীলতার ধর্মে

বিশ্বাস-এই ত্রয়ী বৈশিষ্ট্য সম্মিলিত হয়ে 'বলাকা'য় গতিতত্ত্বের নতুন বার্তা প্রচারিত হল। জড়বস্তুর মধ্যে সঞ্চারিত হল তীব্র প্রাণাবেগ, তাই 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', বলাকার পাখার ধ্বনিতে ব্যঞ্জিত হল 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে' এই আহ্বান। পূর্ণতাকে বলা হল মৃত্যুর নামান্তর-'যে মূহূর্তে পূর্ণ তুমি,সে মূহূর্তে কিছু তব নাই'।

'বলাকা' কাব্যের সবুজের অভিযান, শঙ্খ, চঞ্চলা (নদী) 'ছবি' 'সাজাহান', 'ঝড়ের খেয়া' 'বলাকা' ইত্যাদি কবিতার মূল সুর গতিবাদ। 'বলাকা'র গতিবাদ আরও বেশী প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এখানকার অসম্ভব গতিশীল মুক্তক ছন্দের সৌজন্যে।

টিপ্পনী

'বলাকা'-র পর রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়- 'পলাতকা' (১৯১৮) এবং 'শিশু ভোলানাথ' (১৯২২)।

জীবনে সবই ক্ষণস্থায়ী ,সবই পলায়নপর-'পলাতকা'র মূল সুর এটাই। 'শিশু ভোলানাথ'-এর ''প্রতিপাদ্য বিষয় বস্তুগ্রাস থেকে মনের মুক্তি ও চিত্তের নির্মলতা''।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'পূরবী' ও 'মহুয়া'; আর আছে 'বনবাণী' ও পরিশেষ কাব্যগ্রন্থ। 'পূরবী'তে পৃথিবী থেকে আসন্ন বিদায়ের মনোভাবটি প্রকাশিত হয়েছে,-বিদায় আসন্ন হলেও কবিমনে পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ম্লান হয়নি। বার্ধক্যে উপনীত হলেও কবির মন থেকে যে প্রেম-প্রণয় বা ভালোবাসার অনুভূতি হ্রাস পায়নি,বরং তার ঔজ্জ্বল্য বর্তমান আছে,পরবর্তীকাব্য 'মহুয়া'য় তার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের ঐতিহাসিকের ভাষায় ''মহুয়া পর্বে' রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে জৈবিক বৃত্তিরূপে নয়, মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিরূপে দেখেছেন। নারীকে আত্মার সঙ্গিনী বলে জেনেছেন।''

'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি, উদ্ভিদজগৎকে কবি দেখেছেন আত্মপ্রাণের দোসররূপে । উদ্ভিদকে কবির মনে হয়েছে 'বিশ্ববাউলের একতারা;..... যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে।''

'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে রয়েছে প্রাক-পরিশেষ যুগের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি।

অন্ত্যপর্ব ঃ

এই পর্বে কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

পুনশ্চ (১৯৩২), বিচিত্রিতা (১৯৩৩), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), বীথিকা (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬) এবং শ্যামলী (১৯৩৬)। রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্বের রচনাগুলির মধ্যে 'পুনশ্চ' থেকে 'শ্যামলী' পর্যন্ত এই কাব্যগ্রন্থগুলিকে পুনশ্চপর্বও বলা হয়ে থাকে।

'পুনশ্চ'পর্ব-পরবর্তী অন্ত্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হল-

প্রান্তিক (১৯৩৮), সেঁজুতি (১৯৩৮), আকাশপ্রদীপ (১৯৪০), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১) এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষলেখা (১৯৪১)।

১৯২০-র দশক থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত হয়ে বাংলা কবিতা রচনার একটা সচেতন প্রয়াস চলতে থাকে। কল্লোল,কালি-কলম প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প-উপন্যাস-কবিতা সবকিছুর মধ্যেই রবীন্দ্রবিরোধী একটা মনোভাব স্পষ্টতা লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনিও ছিলেন পরিবর্তনকামী। সাহিত্যের আঙ্গিক,বিষয়বস্তু ইত্যাদির মধ্যে যে যুগগত পরিবর্তন ঘটে চলেছিল,রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার শরিক হতে দ্বিধা করেননি। 'পুনশ্চ' পর্বে রবীন্দ্রনাথ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গদ্যছন্দের প্রবর্তন

করলেন। শুধু গদ্য-ছন্দই নয়,কবিতার বিষয়বস্তুতেও স্থান পেল আটপৌরে জীবন,সাধারণ চরিত্র এবং অনেকক্ষেত্রে কাহিনীধর্মিতা।শেষসপ্তক,পত্রপুট,শ্যামলী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও পুনশ্চের কবি-মনোভাবকে অটুট রাখার চেষ্টা করলেন রবীন্দ্রনাথ। শেষসপ্তকে কবির অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও মহাবিশ্বজীবনের ইশারা কবিতাগুলির মধ্যে যোগ করেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মাত্রা। 'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের কবিতায় রয়েছে বৈচিত্র্যধর্মিতা-আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা, সাধারণ জীবনানুরাগ, নিজের অক্ষমতা, পাশ্চাত্যজীবনের লোভ, শক্তিদম্ভ ইত্যাদি এখানকার কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। 'শ্যামলীতে' উচ্চভাবময়তা নয়, পারিপার্শ্বিক সাধারণ জীবন ও প্রকৃতি তাঁর কবি-দৃষ্টিতে নিয়ে এসেছে বিস্ময়ের চমক।

টিপ্পনী

রবীন্দ্রজীবনের প্রান্তিকলগ্নের কবিতাগুলি সংহত, মিতায়িত, বক্তব্যসমৃদ্ধ এবং আবেগ-উচ্ছ্বাসের বাহুল্যবর্জিত। এই পর্বে কবির প্রজ্ঞা, বোধ ও বোধি এবং অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা কবিতাগুলিকে যেন শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। সেই সময়কালে দেশীয় সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, আন্তর্জাতিক টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বৃহৎশক্তিগুলির আগ্রাসন, বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের আতঙ্ক ইত্যাদি সভ্যতাবিরোধী পরিস্থিতি কবিচিত্তকে প্রবলভাবে আন্দোলিতও করেছিল। বর্তমান সভ্যতাকে তাঁর নাগিনীর মতই ভয়ংকর বোধ হয়েছিল। 'প্রান্তিক'-এর কবিতায় এই দানবীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আবার এই কাব্যগ্রন্থেই তিনি আসক্তিশূন্য এক নবজীবনসন্ধানী হয়ে পড়েছেন- অবশ্য এই আসক্তিহীনতা তাঁর জীবনবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেনি কখনো। 'সেঁজুতি'র অর্থ হল সন্ধ্যাবাতি-জীবনসায়াহ্নে কবি যেন এই কাব্যে জীবনের দীপ জ্বালিয়েছেন-সেই দীপালোকে পাঠ করেছেন ফেলে আসা জীবনের কতশত লিপি—কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন সকলের প্রতি; মূল্যায়ন করেছেন জীবনের।

এই পর্বে 'নবজাতক' রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন এবং সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এক তির্যক মূল্যায়নসমন্বিত কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ তিনি বলেছেন- ".....এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।" 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে ভীড় করেছে অতি ছোটোখাটো খুঁটিনাটি অকুলীন বস্তুসামগ্রী। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্র-জীবনজিজ্ঞাসার উচ্চতর দিকগুলি তাই অনুপস্থিত।

'রোগশয্যা'য় অসুস্থ কবির মনোলোকে অনেক খেদ,অভিযান ও অপূর্ণতা জেগে উঠলেও আনন্দবাদী ও আশাবাদী এই কবি মনে করেছেন মৃত্যু-দুখঃ,যন্ত্রণা ও তমিস্রার মধ্য দিয়ে মানুষের যে যাত্রাপথ, 'সুসংগত কলেবর নব সূর্যালোকে' সেই তমিস্রা বিদূরিত হবেই। রোগপীড়িত কবিমন তখন ব্যক্তিদুঃখ নিয়ে ভাবিত হয়নি বলেই কবিতার শরীরে রোগ-পান্ডুরতার কোন চিহ্ন ফুটে ওঠেনি। 'আরোগ্য' কাব্যে আশাবাদ আর সাধারণ কর্মী মানুষের জয়গাথা রচিত হয়েছে, অন্যদিকে উচ্চারিত হয়েছে মনুষ্যবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন প্রতিবাদ। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও অমলিন রবীন্দ্রনাথ আনন্দস্নাত, 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের কবিতায় তাঁর নিবেদন-'আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ।' রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে গিয়ে কোন আত্মপ্রবঞ্চনা করেননি, কবিতা রচনার নামে শৌখিন মজদুরি করেননি। তিনি জানতেন তাঁর কবিতা 'গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।' সর্বত্রগামী কবিতা যাঁরা লিখতে পারবেন, সেই ভাবীকালের কবিদের তিনি সসম্মান আহ্বান জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শেষলেখা'র কবিতাগুলি অর্থগর্ভ, ভাবগম্ভীর, সংক্ষিপ্ত কিন্তু হৃদয়বেদ্য।

টিপ্পনী

কবি কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ কবির সঙ্গে তুলনা করলে কাজী নজরুল ইসলামকে একজন গোত্রছাড়া ব্যক্তি ও গোত্রছাড়া কবি বলে মনে হবে। অতি বাল্যকাল থেকে সীমাহীন দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম, পারিবারিক বহু প্রতিকূলতা, প্রথাগত শিক্ষালাভে অজস্র বাধা-বিপত্তি এবং শেষতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান ও করাচীর সেনানিবাসে ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনের একজন সৈনিক হিসাবে নিযুক্তি—কাজী নজরুলের প্রারম্ভিক যৌবনপর্ব এই সমস্ত ঘটনার ঘনঘটায় পরিপূর্ণ। ১৯২০ সালে বাঙালী পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে কর্মহীন নজরুল কলকাতায় আসেন এবং সাম্যবাদী-রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক মুজফ্‌ফর আহমেদের সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভ করেন। মূলতঃ মুজফ্‌ফর আহমেদের উৎসাহ ও নির্দেশেই ব্রীটিশ সরকারের কোন চাকরীতে যোগদানে বিরত থেকে সাহিত্যসেবায় নজরুলের আত্মনিয়োগ।

করাচী সেনানিবাসে থাকার সময় নজরুল রুশবিপ্লবের নানা খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে গোপনে খোঁজখবর রাখতেন এবং এই সময়েই তাঁর মধ্যে সাম্যবাদী ভাবধারার প্রতি আনুগত্য জন্মায়। সেনানিবাসে থাকাকালীন কাজী নজরুল 'ব্যথার দান' নামে একটি গল্প রচনা করেন (১৯১৮) যেটি ১৯২০ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যপত্রিকায়' প্রকাশিত হয়েছিল।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত সেনাবাহিনী থেকে কলকাতায় আগমনের পর থেকেই। তাঁর কবিজীবন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়পর্ব থেকে মোটামুটিভাবে ১৯৪২-এর আগষ্ট বিপ্লবের সূচনাকাল পর্যন্ত। এরপর তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত (২৮ আগষ্ট,১৯৭৬) রুদ্ধবাক্ ও সম্পূর্ণ স্মৃতিশক্তিহীন অবস্থায় কাটান।

কবি হিসাবে নজরুল কত বড় কবি সে বিচারে না গিয়ে একথা খুব জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে,বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তির জন্য যে-কবিগণ সোচ্চার হয়েছিলেন,কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম বলিষ্ঠ কবি। বাংলা কাব্যে অপরিমিত যৌবনশক্তি, ব্যক্তি-পৌরুষ ও বিদ্রোহের অশ্রুতপূর্ব বাণীস্পন্দন নিয়ে বাংলা কবিতার জগতে তাঁর আবির্ভাব। 'নজরুল স্মৃতিকথা'য় মুজফ্‌ফর আহমেদের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়-

''সাহিত্য সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা বাদ দিয়েও আমি বলব, আমাদের বাংলা ভাষা মিষ্ট, আমাদের ভাষা সুকোমল। শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা আমাদের ভাষায় রচিত হতে পারে,এই ছিল আমাদের ধারণা। আমাদের ভাষায় জোর নেই, সংগ্রামশীলতা নেই এই ধারণা আমাদের ভিতরে বদ্ধমূল ছিল বলেই আমরা শ্লোগান দিতাম হিন্দুস্থানীতে। নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়ের পর আমরা বুঝেছি যে বাংলা ভাষাও জোরালো, সংগ্রামশীল ও অসীম শক্তিশালী।'' ব্যক্তিতেজে উদ্ভাসিত নজরুল দৃপ্তকণ্ঠে বললেন-

'বল বীর,
চির উন্নত মম শির,
শির নেহারি আমার নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।'

অকৃত্রিম মানবতাবাদ, শাসন-শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ধর্মধ্বজীদের প্রতি ক্ষমাহীন মানসিকতা এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতি নিরঙ্কুশ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে বাংলা কাব্যজগতে তাঁর পদচারণা। বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'সৈনিক' কবি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম-তিনি প্রকৃতই সংগ্রামী; তাঁর ''পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।''

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি

হল-অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলনচাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ভাঙার গান (১৯২৪), ছায়ানট (১৯২৪), পূবের হাওয়া (১৯২৫), সাম্যবাদী (১৯২৫), চিত্তনামা (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ঝিঙেফুল (১৯২৬), ফণিমনসা (১৯২৭), সিন্ধুহিন্দোল (১৯২৭), জিঞ্জীর (১৯২৮), চক্রবাক (১৯২৯), সন্ধ্যা (১৯২৯), প্রলয়শিখা (১৯৩০), নতুন চাঁদ (১৯৪৫), শেষ সওগাত (১৯৫৮) প্রভৃতি।

'নজরুল চরিত-মানস'-এর লেখক ড. সুশীলকুমার গুপ্ত কাজী নজরুলের কাব্যগ্রন্থগুলির ভাব ও বিষয়বস্তু অনুসারে তিনটি শ্রেণী নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', ' সর্বহারা', 'ফণিমনসা', 'জিঞ্জীর', 'সন্ধ্যা ' ও 'প্রলয়শিখা' কাব্যগ্রন্থের সুর সমজাতীয়। দেশাত্মবোধ, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, বৈষম্যবাদ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে কবির অসন্তোষ, ক্ষোভ, দুঃখবোধ এবং বিদ্রোহী মনোভাব এই কাব্যগুলির কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে মানবিক প্রেম-প্রীতি, বাৎসল্য, প্রকৃতি-প্রীতি ইত্যাদি ভাব পরিস্ফুটিত হয়েছে 'দোলনচাঁপা', 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া', 'সিন্ধুহিন্দোল', 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের কবিতায়। নজরুলের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে পূর্ব-উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থগুলিরই ভাব কোন না কোনভাবে লক্ষিত হবে।

'অগ্নিবীণা' কাজী নজরুল ইসলামের সর্বাধিক প্রচারিত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কাব্যখ্যাতির অন্যতম নিদর্শনও এই কাব্যগ্রন্থটি। এই কাব্যগ্রন্থে মোট বারোটি কবিতা আছে। কবিতাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা হল- 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'আগমনী', 'ধূমকেতু' ইত্যাদি। এদের মধ্যে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি নজরুলের কাব্যজীবনের সর্বাপেক্ষা আলোচিত কবিতা। অনেকে কবিতাটির উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' গদ্য-কথিকাটির কথা বলে থাকেন। এই নিয়ে নজরুল-মোহিতলাল বিতর্ক একটা তিক্ততার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

'অগ্নিবীণা' গ্রন্থটি নজরুল 'বাঙলার অগ্নিযুগের আদি পুরোহিত সাগ্নিক বীর শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করেন। ১৯২৪ সালে 'বঙ্গবাণী'তে এই কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় '' কবিতাগুচ্ছের অগ্নিবীণা নাম সার্থক হইয়াছে; কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে আগুনের ফুলকি ফুটিয়াছে,আর কোথাও বা সে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়াছে।''

'অগ্নিবীণা'র দ্বিতীয় খন্ডে যে সমস্ত 'কবিতা' ও 'গান' প্রকাশ করার ইচ্ছা কাজী নজরুলের ছিল, সেই সমস্ত কবিতা ও গান দিয়ে তিনি 'বিষের বাশী' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেন। কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে কবির বক্তব্য-'' বিষের বাঁশীর বিষ যুগিয়েছেন, আমার নিপীড়িতা দেশ-মাতা, আর আমার ওপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।'' এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় নজরুলের স্বভাবসুলভ বিদ্রোহ আর প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

'ছায়ানট' প্রেমভাবনামূলক কবিতার সংকলন। প্রেমচেতনাই সংগ্রামী মানুষের কর্মোন্মাদনার উৎস—এমন ভাবনার প্রকাশও এখানে লক্ষ্য করা যাবে।

কাজী নজরুলের 'পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থের ৩৭ টি কবিতার মধ্যে ২৫টি ছায়ানট থেকে গৃহীত হয়েছে—প্রেমের করুণ-মধুর মরমী রাগিনী এখানকার কবিতায় অনুরণিত হয়েছে।

সর্বহারা কাজী নজরুল ইসলামের একটি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। ব্রিটীশবিরোধী আন্দোলনে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী যখন নিয়োজিত, তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্মম অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য কাজী নজরুল ইসলাম মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সেই সঙ্গে শোষণমুক্ত বৈষম্যবিহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও দেখছিলেন। ইতিপূর্বে 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছে যে কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার সঙ্গে আরও কয়েকটি কবিতা সংযোজন করে 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এখানকার উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলির মধ্যে 'সাম্যবাদী',

টিপ্পনী

'নারী', 'সাম্য', 'কুলি-মজুর' (সর্বহারা কবিতাগুচ্ছ), 'সর্বহারা', 'কৃষাণের গান', শ্রমিকের গান', 'ছাত্রদলের গান', 'কান্ডারী হুশিয়ার', 'ফরিয়াদ', 'আমার কৈফিয়ৎ' (নতুন লিখিত কবিতাবলী) ইত্যাদি।

কাজী নজরুলের 'ফণিমনসা' কাব্যগ্রন্থের বিশিষ্ট কবিতাগুলি হল- 'সব্যসাচী', 'প্রবর্তকের ঘুর চাকায়', 'সত্য-কবি', রক্তপতাকার গান', 'অন্তর ন্যাশন্যাল সঙ্গীত', 'পথের দিশা', 'যুগের আলো' ইত্যাদি। এখানকার কবিতাগুলিরও মূলসুরটি হল বিদ্রোহের।

টিপ্পনী

'সিন্ধু-হিল্লোল' কাব্যগ্রন্থে কবির প্রেমভাবনার নানাদিক প্রতিফলিত হয়েছে। 'সওগাত' পত্রিকায় এই কাব্যগ্রন্থে নজরুলের প্রেমসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিকে পৌরুষদীপ্ত বলে মন্তব্য করা হয়েছিল-''.....পৌরুষ-মহিমায় তাঁহার (কাজী নজরুল ইসলাম) সমস্ত কবিতাই উজ্জ্বল।এমনকি প্রেমের কবিতাগুলিতেও এই পৌরুষ বিদ্যমান।....নারীর প্রেমের কাঁদুনি-বাহুল্য বাংলা কবিতায় পাঠকের অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল। নজরুল-প্রতিভা সেই একঘেয়ে রূপ বদলাইয়া দিয়াছে।'' এখানকার উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল-'সিন্ধু (১ম তরঙ্গ-তৃতীয় তরঙ্গ), 'গোপনপ্রিয়া', 'দারিদ্র্য', মাধবী-প্রলাপ' ইত্যাদি।

'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি প্রেমভাবকে আশ্রয় করে লিখিত হয়। প্রকৃতিও এখানে প্রেমভাবের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করেছে। কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ২১ টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে 'তোমারে পড়িছে মনে', 'বাদল-রাতের পাখী', 'গানের আড়াল', 'বাতায়ন পাশে গুবাকতরুর সারি' 'চক্রবাক' উল্লেখযোগ্য কবিতা। এখানকার কোন কোন কবিতায় প্রেমকে বিরহবোধের সঙ্গে যুক্ত করে কবি তাঁর রোম্যান্টিক বিষণ্ণতার পরিচয়ও দিয়েছেন।

'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থে কবি প্রেমের কোমল-মধুর ও বিরহজনিত বিষণ্ণতার পরিমন্ডল ছেড়ে সমাজসচেতনতা ও বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশের দিকে ঝুঁকেছেন।

'প্রলয়শিখা' কাব্যগ্রন্থে কবির বিদ্রোহের সুর আরও উচ্চবাক্ হয়েছে। প্রলয়ের দেবতা নটরাজের নৃত্যতরঙ্গে যে ধ্বংসের আভাস,সেই প্রলয়কালেই শত্রু ও অত্যাচারীর বিনাশসাধন করতে হবে, এই ধ্বংস বা বিনাশের পরই সৃষ্টির মুহূর্ত হবে সমাগত-

বিশ্বজুড়িয়া প্রলয়-নাচন লেগেছে ঐ
নাচে নটরাজ কালভৈরব তাথৈ থৈ।.....
ঊর্ধ্ব হইতে এসেছি আমরা প্রলয়ের শিখা অনির্বাণ
জতুগৃহদাহ অন্তে কবির জ্যোতির স্বর্গে মহাপ্রয়াণ।''

বাংলা কাব্যসাহিত্যের এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। রবীন্দ্র-বিরোধিতার অঙ্গীকার নিয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে যে দু-একজন কবি নতুন ধারার কবিতা লিখতে শুরু করেন, কাজী নজরুল ইসলাম সেই ধারারই একজন কবি। তবে তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধিতা কোন অহংকারী পদক্ষেপ নয়, আসলে কাজী নজরুলের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এক ধরণের নতুনত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর কবিতায় বিদ্রোহের চড়া সুর, প্রতিবাদের ঝড়, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি এসেছে তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানান অভিজ্ঞতা, ক্ষোভ এবং বিশেষ ব্যক্তিমন্ডলীর সঙ্গে তাঁর সংযোগের সূত্র থেকে। একথা সত্যি যে, তাঁর কবিতায় সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের অভাব আছে, আবেগের অসংযম ও অতিরঞ্জন আছে, কখনো আছে স্ব-বিরোধী মনোভাব—কিন্তু যে যুগপরিবেশ তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু সেখানে তাঁর মনে হয়েছিল একটি নিষ্ক্রিয়, প্রতিবাদবিমুখ, 'সংকোচের বিহ্বলতায় ম্রিয়মাণ' জাতিকে নব প্রাণশক্তিতে জাগিয়ে তুলতে হলে প্রয়োজন উচ্চকণ্ঠ উৎসাহব্যঞ্জক কবিতা। কাব্যকবিতা রচনার ক্ষেত্রে এই সরব উচ্চারণ নজরুলের হয়তো একটা মুদ্রাদোষেও রূপান্তরিত হয়েছিল। এছাড়া অত্যন্ত খেয়ালী মেজাজের মানুষ হওয়ার কারণে

সৃষ্টিকার্যে তিনি ধৈর্য্যশীলতা বা গভীর চিন্তা-ভাবনার অবকাশ গ্রহণ করেননি-তাৎক্ষণিক ভাবনার তাৎক্ষণিক শিল্পরূপ দানেই অধিকতর উৎসাহ বোধ করেছেন।

এজন্য কাজী নজরুল তাঁর জীবিতকালেই নানা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কেউ তাঁকে বলেছেন 'স্বভাবকবি', কেউ বলেছেন 'যুগের কবি', কারও মতে তিনি 'হুজুগের কবি'। আবার বুদ্ধদেব বসুর মত সমালোচক বলেছেন- 'হৈ-চৈ-করা কবি'।

তবে নজরুল শুধু 'বিদ্রোহী' কবি নন—বিদ্রোহ তাঁর কবিত্বের একটা দিক। প্রেম, প্রকৃতি, ব্যক্তিভাবনার নিজস্বজগতেও কাজী নজরুলের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। অতি ছোট বয়স থেকেই 'নেটোর দলে' গান গাওয়া, 'গান লেখা' ইত্যাদি থেকে তাঁর স্বভাব-কবিত্বের প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছিল, আর পরিণত বয়সে তাঁর কবিত্ব বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা দিক্‌দর্শীর ভূমিকা পালন করেছিল। তবে একথা সত্য যে, বিদ্রোহী মেজাজেই কাজী নজরুল অনেক বেশী স্বতঃস্ফূর্ত-এই বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য তাঁর একাধিক রচনা ইংরেজের রাজরোষে পড়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছে, কবিকে কারাগারে রুদ্ধও হতে হয়েছে। আসলে তাঁর কবিকর্মের যে চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল তা তিনি পূর্বেই স্থির করে নিয়েছিলেন এবং নির্দ্বিধায় কবিত্বের জগতে অমরত্ব লাভের লোভকে তুচ্ছ করে 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় বলেছিলেন, 'পরোয়া করি না, বাঁচি আর মরি, যুগের হুজুগ কেটে গেলে'; আর তাঁর ভবিষ্যতের কবিতাসৃষ্টি সম্পর্কে প্রত্যয়িত উচ্চারণ করেছিলেন-

'প্রার্থনা করো, যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয়, আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ !'

টিপ্পনী

কবি জীবনানন্দ দাশ

রবীন্দ্র-কবিব্যক্তিত্বের অভিকর্ষকে অতিক্রম করে বাংলা কবিতায় যিনি যথার্থ আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন তিনি হলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক, পাশ্চাত্য সাহিত্যবোদ্ধা এবং আপাদমস্তক কবিতামগ্ন একজন ভাবুক কবি হলেন জীবনানন্দ। তাঁর কবিতার ভাব, ভাষা, মনন জ্ঞান, বুদ্ধি ও শিল্পপ্রকরণের মহোচ্চতা একসময় জীবনানন্দকে সাধারণ কবিতা-পাঠক থেকে অনেক দূরবর্তী করে রেখেছিল-তখন তিনি ছিলেন 'কবিদের কবি'। জীবনানন্দ তার প্রথম আবির্ভাবেই আধুনিক কবিদের পরম আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিলেন; কল্লোল যুগের কবি-সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মন্তব্যে আমরা যেন তারই প্রতিধ্বনি শুনি-''অন্তরের গহন গোপন মহারহস্য আবিষ্কার করতে হলে মাঝে মাঝে এসে বসতে হয় সমুদ্রের তীরে কিংবা খোলা আকাশের নীচে। আমাদের জীবনে জীবনানন্দ সেই সমুদ্রতীর, সেই অনবরুদ্ধ দীপ্ত আকাশ।'' জীবনানন্দ মনে করতেন, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। যাঁর ভেতরে আছে অনন্ত কালচেতনা, অন্তর্শক্তি, অনুভবে ও মননে আছে পরিচ্ছন্নবোধ-তিনিই কবি হওয়ার যোগ্য। জীবনানন্দ 'কবিতার কথা' প্রবন্ধগ্রন্থে বলেছেন- 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে কালজ্ঞান।' জীবনানন্দ এও মনে করতেন ভালো কবিতা নিজের গুণেই পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে। পাদ্রীরা যেমন বাইবেল বিতরণ করেন, ভালো কবিতা সেইভাবে বিতরিত হওয়ার জিনিস নয়- 'কবিতার কথায়' জীবনানন্দ এমন কথাই বলেছেন।

জীবনানন্দ জানতেন রবীন্দ্র-প্রভাবিত হয়ে থাকলে বাংলা কবিতার মুক্তিলগ্ন কখনোই আসবেনা- তাই সচেতনভাবেই তিনি সূচনা থেকে রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা

করেছেন। অবশ্য তাঁর প্রথম কাব্য 'ঝরাপালক'-এ রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তি পুরোপুরি ঘটেনি- এই কাব্যগ্রন্থের 'নীলিমা', 'পিরামিড', 'সেদিন এ ধরণীতে' প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভূত হবে। এছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম এবং মোহিতলাল মজুমদারের কিছু কিছু প্রভাব প্রথম কাব্যগ্রন্থের কোন কোন কবিতায় আছে। কিন্তু এই সমস্ত কবির প্রভাব কাটিয়ে উঠে জীবনানন্দ অচিরেই বাংলা কবিতায় একটি নতুন ঘরানা যা একান্তভাবেই জীবনানন্দীয়, তার সূচনা করলেন।

টিপ্পনী

জীবনানন্দের কবিতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় কবিদের ধ্যান-ধারণার স্পষ্ট প্রভাব আছে। টি.এস.এলিয়ট, ইয়েটস্ জীবনানন্দকে নতুন যুগের কবিতা-নির্মাণের রসদ যুগিয়েছেন। যুগের ক্লান্তি, হতাশা, নৈরাজ্য, অন্তঃসারশূন্য মানবসভ্যতার অবিবেকী ক্রিয়াকলাপ, 'আধুনিক কু-রাষ্ট্রের মূঢ় সন্তানদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা-এ সমস্ত নেতিবাচক ধারণা জীবনানন্দের কবিতায় আছে। কিন্তু জীবনানন্দ নৈরাশ্যবাদী কবি নন, তিনি বলেন, 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন / তবুও মানুষ ঋণী পৃথিবীরই কাছে।' -মানুষের মনে একদিন সুচেতনার সঞ্চার হবে, হয়তো তার জন্য দীর্ঘমেয়াদী অপেক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু পৃথিবীর 'ক্রমমুক্তি' অবশ্যম্ভাবী।

জীবনানন্দ-রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল- ঝরাপালক (১৯২৭), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), আমিষাশী তরবার (১৯৬৯), রূপসী বাংলা (রচনাকাল ১৯৩২, প্রকাশকাল ১৯৫১), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১) এবং সুদর্শনা (১৯৭৩)।

জীবনানন্দের কবি-স্বভাবের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে কেউ তাঁকে বলেছেন 'নির্জন কবি' (বুদ্ধদেব বসু), কেউ বলেছেন মৃত্যু চেতনার কবি, কেউ বা বলেছেন হেমন্তের কবি। কিন্তু প্রত্যেকটি অভিধাই তাঁর কবি-স্বভাবের আংশিকভাবের নির্দেশক।

'ঝরাপালক' জীবনানন্দের প্রথম কবিতার বই। কবি এই কাব্যগ্রন্থে তাঁর পূর্বসূরী ও সমসাময়িক কোন কোন কবির প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেননি- একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৯৪৬ সালে জীবনানন্দ দাশ একটি চিঠিতে নিজেই তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের দোষত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে লিখেছিলেন-'প্রথম কবিতার বইটির ..... বিশেষ কোন ইম্পরটেন্স আছে বলে মনে হয় না।''

'ধূসর পাণ্ডুলিপিতে' এসে কবি আত্মস্থ হয়েছেন—কবি হিসাবে তাঁর মনে হয়েছে 'নিজের মুদ্রাদোষে (?) তিনি সমকালিকদের থেকে আলাদা প্রকৃতির-এই স্বাতন্ত্র্যের স্বাদ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র কবিতায় আছে। 'বোধ', 'অবসরের গান', 'ক্যাম্পে', 'স্বপ্নের হাতে' সেই শ্রেণীর কবিতা।

রূপসী বাংলার কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল১৯৩২ সাল সম্পর্কে। কোন উচ্চাকিত শব্দোচ্চারণে নয়, প্রথধর্মী স্বদেশপ্রেমের কবিতার আদলেও নয়, কোমল-স্নিগ্ধ শব্দসমবায়ে অনুচ্চকিত স্বদেশপ্রেম জীবনানন্দীয় ভঙ্গীতে এখানকার অনেক কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলার প্রকৃতি, লতা-গুল্ম-ফুল, ফল, নাম-না-জানা উদ্ভিদ, অকুলীন পাখীরা, সোনালি রোদ, নীলাকাশ, হেমন্ত ঋতু, মঙ্গলকাব্যের অনুষঙ্গ, জ্যোৎস্নার মায়াবী রাত্রি, কবির আকাঙ্ক্ষার অনির্বচনীয় প্রকৃতি এই কাব্যকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতিকেও অতিক্রম করে গিয়েছে বলে মনে হয়- কিন্তু সেই অতিক্রান্তির মধ্যে কোন উপেক্ষার বাণী নেই।

'বনলতা সেন'-এ এসে জীবনানন্দ অনন্য। এই কাব্যের নাম-কবিতাটি বিশ্ব কাব্যসাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ইতিহাসচেতনা আর অনির্দেশ্য জীবন-পথ পরিক্রমার অনুষঙ্গে 'বনলতা সেন' উত্তাল জীবনসমুদ্রে বিপন্ন আত্মার পরম প্রেমাশ্রয়। এই কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতাগুলি হল- ধানকাটা হয়ে গেছে, পথ হাঁটা, সুরঞ্জনা, সবিতা,

সুচেতনা, আবহমান ইত্যাদি। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে মহাসময়, মহাজীবন এবং তাদের বুকে নিরবচ্ছিন্ন প্রাণকণিকার অনন্ত প্রবাহের কথা কবি ব্যক্ত করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম দিককার কবিতাগুলোতে যদি নির্জন অন্ধকারের স্বাক্ষর থাকে, তবে ক্রমশঃ সেই অন্ধকারই কবিমনে অন্ধকার-উজ্জ্বলতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়-কবি বলেন-

'গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;.....

হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া,

আমাকে জাগাতে চাও কেন?'

টিপ্পনী

আবার এই কাব্যগ্রন্থেই 'সুচেতনা' কবিতায় অসুস্থ পৃথিবীর কাছে ঋণস্বীকার করে, 'রণরক্ত সফলতার' নশ্বরতা ঘোষণা করে এবং আপাতপরাজয়ের পর মানুষের নবউত্থান ও ক্রমমুক্তির কথা ঘোষণা করে জীবনানন্দ বলেছেন-

'এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;
প্রায় ততদূর ভালো মানব-সমাজ।'

আর বলেছেন-

''সুচেতনা ,এই পথেই আলো জ্বেলে- এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;''

বনলতা সেন পর্বেই জীবনানন্দ কিছু নতুন ধরণের কবিতা লিখতে শুরু করেন। মোটামুটিভাবে ১৯২৯ থেকে ১৯৪১ সময়পর্বে সেগুলি রচিত হয়েছিল। ১৯৪৪ -এ প্রকাশিত মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থে সেই ভিন্নজাতের কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে, তবে সব কবিতা নয়। জীবনানন্দের আর একটি কাব্যগ্রন্থ 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবিতাগুলিও ঐ সময়পর্বে রচিত হয়েছিল-তবে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। 'বনলতা সেন'-এর নাটোর, বনলতার শান্তিদাত্রীরূপ এসবকে সরিয়ে রেখে কবি 'মহাপৃথিবী'র পথের পথিক হয়ে উঠেছেন। 'মহাপৃথিবীর' 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় কবি অনুভব করলেন আধুনিক জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাধি 'alienation'-বা বিচ্ছিন্নতাবোধ। এই বিচ্ছিন্নতা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, এমনকি নিজের সঙ্গেও। এক সুখী গৃহকোণে থেকেও একটি পরিতৃপ্ত মানুষ বিচ্ছিন্নতার ভূতের আমন্ত্রণে লাসকাটা ঘরের হিমশীতল টেবিলে প্রাণহীন হয়ে পড়ে থাকে। জীবনের চতুর্দিকে যখন প্রাণকে আগলে রাখার প্রবল আকুতি, তখন পলায়নবাদী একটি মানুষ রক্তের ভিতরে খেলা-করা বিপন্ন-বিস্ময়ের অসহায় শিকারে পরিণত হয়। কিন্তু জীবনানন্দ অপঘাতে মৃত্যুর নৈরাশ্য দিয়ে কবিতা শেষ করেননি, 'আমরা দুজনে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'- জীবনবাদের এই দৃঢ় উচ্চারণ দিয়ে কবিতার উপসংহার রচনা করেছেন।

নগর চেতনা- বিশেষতঃ কলকাতাকেন্দ্রিকতা, সেই সঙ্গে জাতিবৈরিতা, বিশ্বযুদ্ধ, দারিদ্র্য, মন্বন্তর, মানবিকতার বিকারত্ব ইত্যাদি বিষয় কবিকে প্রবলভাবে সংক্রমিত করেছে এই পর্বের কবিতা-নির্মাণের সময়। 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'তেও এই বোধকেই কোন কোন কবিতায় আমরা প্রসারিত হতে দেখি।

বাংলা কাব্য-কবিতায় জীবনানন্দই প্রথম অরাবীন্দ্রিক। তাঁর শব্দচয়নে আভিজাত্য ও কৌলীন্যের পরিবর্তে আছে দেশজ গন্ধ।

দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতির গাছপালা,ফুল-ফল ইত্যাদির নাম নির্বাচনে তিনি নিরপেক্ষ নির্বাচক-তিনি কুলীন মহীরুহ কিংবা পুষ্পজগতের রাণীকেই কবিতার শরীরে আমন্ত্রণ

জানাননি-ভাঁট-কলমীফুলও তাঁর কাছে সম্মাননীয় কাব্য-উপকরণ।

তৃতীয়তঃ- স্যুররিয়ালিজমের স্পষ্ট ব্যবহার জীবনানন্দেই প্রথম প্রত্যক্ষগোচর হয়।

চতুর্থতঃ- তাঁর কবিতা এক অর্থে আন্তর্জাতিক বিষয়োপলব্ধিতে প্রসারিত। এলিয়ট্, ইয়েট্স্, বোদলেয়ার তাঁর কবিতায় আছেন ভাবে, আঙ্গিকে-চিত্রকল্পে কিংবা অন্যকোন রূপে।

পঞ্চমতঃ- জীবনানন্দ সম্পূর্ণরূপে কবিতামগ্ন এক ব্যক্তিত্ব—কবিতা তাঁর শরীরে, কবিতা তাঁর আত্মায়।

টিপ্পনী

পূর্ব আলোচনার সংক্ষিপ্তায়ন
দ্বিতীয় একক

(ক)
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

বাংলা গদ্য ভাষার উন্মেষলগ্নে মিশনারীদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিদেশী বণিক ও ধর্মযাজকদের নিজস্ব প্রয়োজনেই এই বাংলা গদ্য ভাষার ঐতিহাসিক উদ্ভব। মনো-এল-দ্য-অস্-সুম্পসাম, দোম-আন্তোনিও-দে-রোজারিও প্রমুখ মিশনারী নিজ উদ্যোগে বাংলা ভাষা শিক্ষা করে বাংলা গদ্য ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। মিশনারীদের দ্বারা রচিত গ্রন্থগুলি মূলতঃ ছিল খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারমূলক।

টিপ্পনী

তারপর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্লীর উদ্যোগে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলে ঐ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরীর উৎসাহ ও উদ্যোগে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে আগত তরুণ ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যপুস্তকের অভাব পূরণ করতে বাঙালী পন্ডিত-লেখকদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। উইলিয়াম কেরী নিজেও একজন খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। তিনি ব্যতীত নবনিযুক্ত পন্ডিত-লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ মূলতঃ বাংলা গদ্য ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা পূরণ করতে প্রয়াসী হয়েছিল কিন্তু এখানকার প্রবর্তিত বাংলা গদ্যভাষা মননশীল ভাবের বাহক হয়ে ওঠার শক্তি অর্জন করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াসেই বাংলা গদ্য রচনায় মননশীল প্রবন্ধ-সাহিত্যের লক্ষণ কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায় মূলতঃ ছিলেন সমাজ-সংস্কারক। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাশীলতা, উদারমুক্ত মানসিকতা, শিক্ষানুরাগ, নারীজাতিকে মধ্যযুগীয় নাগপাশ থেকে মুক্ত করার দৃঢ় ইচ্ছা - সব মিলিয়ে উনিশ শতকীয় নবজাগরণের তিনিই ছিলেন অগ্রদূত - আর জীবন ও সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তিনি হলেন 'Morning star of the reformation.' সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ তাঁর জীবরে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম।

প্রচলিত সমাজ, ধর্ম, নিয়ম-নীতি-কুসংস্কার এ সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার জন্য রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাঁকে সর্বাত্মকভাবে আক্রমণ করেছিল। এই আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্যই তাঁর লেখনীধারণ। রাজা রামমোহন প্রাচীন ভারতীয় অনেক শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন - বেদান্ত থেকে উপনিষৎ সেই গ্রন্থতালিকায় রয়েছে। এছাড়া তিনি প্রবন্ধধর্মী বেশ কিছু বিতর্কপুস্তিকা রচনা করেন - যেগুলিতে তাঁর গভীর পান্ডিত্য, নিগূঢ় শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তিবাদিতা এবং বিচারশীল বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রকাশ লক্ষিত হবে। এছাড়া ব্যাকরণ গ্রন্থ ও কিছু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা, সংবাদপত্র প্রকাশ ইত্যাদি ব্যাপারেও তাঁর উদ্যোগ মনে রাখার মত।

তবে রাজা রামমোহন সুসাহিত্যিক ছিলেন না। তাঁর গদ্যভাষা নীরস, সাহিত্যগুণবর্জিত এবং সংস্কৃতানুগ। বাক্যগঠনও জটিল, দূরান্বয় সমন্বিত এবং অনেকক্ষেত্রে অর্থবোধেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার যথার্থ শিল্পী। তাঁকেই শিল্পিত বাংলাগদ্যের জনক বলা হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব রাজা রামমোহন রায়ের মত সমাজ-সংস্কারকে কেন্দ্র করেই। বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত। নারী-শিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ রোধ, বিদ্যালয় স্থাপন এবং যুক্তিবাদী, বিচারশীল সমাজ গঠনের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিদ্যাসাগর।

টিপ্পনী

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষে এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দুটি বিতর্কমূলক পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। এছাড়া কালিদাসের অমর নাটক অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্-এর অনুবাদ শকুন্তলা, বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকান্ড ও সংস্কৃত নাট্যকার ভবভূতির, 'উত্তররামচরিত' নাটক অবলম্বনে অনূদিত গ্রন্থ 'সীতার বসবাস', হিন্দী 'বৈতাল পচ্চিসীর' বঙ্গানুবাদ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' এবং শেক্স্পীয়রের নাটক 'কমেডি অব্ এররস্' -এর অনুবাদ 'ভ্রান্তিবিলাস' - বিদ্যাসাগরের অসাধারণ সাহিত্যকীর্তি।

বিদ্যাসাগর কিছু স্কুলপাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন - যেগুলির অধকাংশই অনুবাদগ্রন্থ। এছাড়া সংস্কৃত সাহিত্য-সমালোচনা, 'বর্ণপরিচয়' ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এছাড়াও ছদ্মনামে তাঁর কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক রচনাও আছে।

বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষার উৎকর্ষ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী অনেকেই প্রশংসাকর মন্তব্য করেছিলেন। বাক্যগঠনে বিজ্ঞানসম্মত রীতিতে যতিচিহ্ন ব্যবহার বিদ্যাসাগরই প্রথম করেছিলেন। তাঁর আগে দু'একজন যতিচিহ্ন ব্যবহারে ইংরেজী ভাষার নিয়মে কমা, সেমিকোলন, হাইফেন ইত্যাদি ব্যবহারের চেষ্টা করলেও খুব একটা সফল হননি। বিদ্যাসাগর - সৃষ্ট গদ্যভাষা সাধু গদ্যানুসারী হলেও সেই ভাষা সুখপাঠ্য, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সাহিত্যরসান্বিত, সুবোধ্য এবং সুললিত। পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্ট ভাষাদর্শই অন্যান্য সাহিত্যিকদের নতুন নতুন ভাষাশৈলী সৃষ্টিতে উৎসাহ যুগিয়েছিল।

(খ)

নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত

পাশ্চাত্য রীতিতে সার্থক বাংলা নাট্য সৃষ্টির সমস্ত কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রাপ্য। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব আকস্মিক - কিন্তু স্বল্প সময়েই তিনি বাংলা নাটককে একটি শক্ত বনিয়াদের উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর শর্মিষ্ঠা নাটক, ঐতিহাসিক ট্র্যাজিডি 'কৃষ্ণকুমারী' এবং গ্রীকপুরাণের অনুসরণে রচিত পদ্মাবতী মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, 'কৃষ্ণকুমারী' যথার্থ অর্থে বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম পাশ্চাত্য নাট্যশিল্পধর্মী ট্র্যাজিডি নাটক।

প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্ত অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেছেন। প্রহসন শিল্প তাঁর হাতেই একটি রুচিশীল ও গুরুগম্ভীর রূপ লাভ করেছিল। তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুটি যুগান্তকারী সৃষ্টি।

মাইকেল মধুসূদনের নাটকে ব্যবহৃত নাট্যসংলাপ যথেষ্ট বাস্তবতামণ্ডিত, যদিও সংস্কৃত

ভাষার প্রভাবকে তিনি সর্বত্র অতিক্রম করতে পারেননি। কিন্তু প্রহসনের সংলাপ রচনায় তার কৃতিত্ব বিস্ময়কর।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নাম দীনবন্ধু মিত্র। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং শেক্স্পীয়রীয় নাট্যরীতির অনুসরণ—দীনবন্ধুর অন্যতম নাট্যবৈশিষ্ট্য। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তাঁর রচিত যুগান্তকারী নাটক হল 'নীলদর্পণ'। এদেশের রাইয়তদের উপর নীলকরসাহেবদের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ এই নাটকটি রচিত হয়েছিল। ইংরেজ প্রশাসনিক মহলে এই নাটকটি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নীলদর্পণ ট্র্যাজিডি হিসেবে খুব একটা সার্থক না হলেও, সমালোচকের মতে, 'নীলদর্পণের মত শক্তি আর কোন নাটকে নাই।' এই একটি নাটকই দীনবন্ধু মিত্রকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অমরস্থান প্রদান করেছে। দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকের মধ্যে রয়েছে 'লীলাবতী', 'জামাইবারিক', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ইত্যাদি। দীনবন্ধু একটি অসাধারণ সৃষ্টি হল 'সধবার একাদশী' নামে প্রহসন।

টিপ্পনী

দীনবন্ধু বাস্তবজীবনের সার্থক রূপকার – কিন্তু রোম্যান্টিক বিষয় কিংবা অভিজাত সমাজের রূপচিত্রণে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ। নাট্যসংলাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অনুরূপ মন্তব্যই প্রযোজ্য।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্য যে কোন নাট্যকারের ঈর্ষা উদ্রেক করবে। নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, প্রথাগত নাটক, রূপক–সাংকেতিক নাটক ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে তাঁর নাটকগুলি বিভক্ত।

প্রথাধর্মী নাটকগুলির মধ্যে বিসর্জন, রাজা ও রাণী, মালিনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রূপক–সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে রক্তকরবী, মুক্তধারা, রাজা, ডাকঘর, রথের রশি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাটকগুলিতে বাস্তবজীবনের ক্রিয়া অপেক্ষা ভাবজগতের চিন্তাশীলতা ও কবিত্বগুণই প্রাধান্য পেয়েছে বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন।এও বলা হয়ে থাকে, তাঁর নাটকগুলির অভিনয়যোগ্যতা কম। রবীন্দ্রনাথ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তাই নাটকের মঞ্চায়ন ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না।তিনি নাটক নিয়ে নানা পরীক্ষা–নিরীক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন। রূপক–সাংকেতিক নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অবিসম্বাদিত।

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য

আধুনিক যুগের নাট্যকারদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্যের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁকে কেন্দ্র করেই এবং তাঁরই প্রত্যক্ষ উদ্যোগে বাংলা নাটকে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। গণনাট্য আন্দোলনের তিনিই পুরোধা ব্যক্তিত্ব। গণের জীবন, গণের আশা–আকাঙ্ক্ষা, গণের অর্থনীতি ইত্যাদিকে গণজীবনের ঘনিষ্ঠ করে প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই গণনাটক রচিত হয়েছিল। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' সেই ধারার একটি অসামান্য নাটক। 'নবান্ন' গণনাট্য আন্দোলনের ধারায় একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী নাটক। বিজন

ভট্টাচার্য 'গণ নাট্য' –এর আঙ্গিকে বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেন। পরবর্তীকালে পার্টির সঙ্গে মতবিরোধের কারণে তিনি গণনাট্যের সংস্রব ত্যাগ করে নতুন নাট্যদল গড়ে তোলেন। বিজন ভট্টাচার্য বেশ কয়েকটি মঞ্চসফল একাঙ্ক নাটকও রচনা করেছিলেন। বিজন ভট্টাচার্য একাধারে নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা ও মঞ্চপরিচালক ছিলেন।

টিপ্পনী

(গ)
ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৬৫ খ্রী: রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে ১৮৮৭ খ্রী: রচিত 'সীতরাম' পর্যন্ত তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ১৪টি। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির তিনটি বিভাগ – ১) ইতিহাসনির্ভর রোমান্সধর্মী উপন্যাস; ২) ঐতিহাসিক উপন্যাস ৩) পারিবারিক–সামাজিক উপন্যাস।

প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা, চন্দ্রশেখর, মৃণালিনী, আনন্দমঠ, সীতারাম ইত্যাদি উপন্যাস।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে – ঐতিহাসিক উপন্যাস – 'রাজসিংহে'

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল – বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উইল এবং রজনী

বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা, রাধারাণী ইত্যাদি রচনাকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না। কারণ এগুলিতে উপন্যাসের ঘটনাগত ও চরিত্রগত বিস্তার নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের যেমন স্রষ্টা, তেমনি এর অন্যতম শিল্পীও বটে। স্যার ওয়াল্টার স্কটের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ইতিহাস নির্ভর রোমান্সধর্মী উপন্যাস রচনায় তিনি উৎসাহী হয়েছিলেন। রোমান্সধর্মী উপন্যাসের মধ্যেও তিনি আধুনিক জীবনের মত মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার প্রয়োগ করেছেন। সামাজিক উপন্যাসগুলিতে নরনারীর প্রেমসমস্যার চিত্র রূপায়ণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকক্ষেত্রেই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি উপন্যাসকে তত্ত্বধর্মী উপন্যাস হিসেবে উল্লেখ করা হয় – সেগুলি হল, 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরানী' এবং 'সীতারাম'। এই তত্ত্বটির নাম হল 'অনুশীলনী তত্ত্ব'। উপন্যাসত্রয়ের মধ্যে 'আনন্দ মঠ'–কে স্বদেশ প্রেমমূলক উপন্যাস এবং সর্বপ্রথম রচিত বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস বলে অভিহিত করা হয়।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের যে ধারায় রবীন্দ্রনাথ লেখনী ধরেছেন, সেই ধারাতেই তিনি সোনা ফলিয়েছেন – উপন্যাসধারাও তার ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব লগ্নটি মোটামুটিভাবে বঙ্কিমীযুগ বলেই চিহ্নিত করা যায়। অপরিণত ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ তখন বঙ্কিমী আদর্শ অনুসরণ করে ইতিহাস–ঘটনানির্ভর উপন্যাস রচনায় উৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন এবং প্রথম পর্বে তিনি রচনা করেন 'রাজর্ষি' এবং 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসদ্বয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক বিষয়ের পুনরাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে দীর্ঘকাল উপন্যাস রচনায় বিরত থাকলেন। তারপর ১৯০৩ সালে তাঁর 'চোখের বালি' যখন আত্মপ্রকাশ করল, বাংলা

উপন্যাস-সাহিত্য তখন প্রকৃত অর্থে আধুনিক মনস্তত্ত্বধর্মী উপন্যাসের জগতে পা রাখল। রবীন্দ্রাথের উপন্যাসে বিচিত্র বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে - যেমন, নরনারীর প্রেম সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, সমাজ প্রসঙ্গ, আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

'গোরা' রবীন্দ্রনাথের একটি 'এপিক নভেল' বা মহাকাব্যোপম উপন্যাস। গোরার জীবনদৃষ্টির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় জীবন - সমাজ, রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ ও আন্তর্জাতিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির নামে ভণ্ড রাজনীতিকদের দৌরাত্ম্যকে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করেছেন, আর এর মধ্যেই নর-নারীর প্রেমসমস্যার একটি নতুন দিক উন্মোচিত করেছেন। 'যোগাযোগ' নর-নারীর প্রেমদ্বন্দ্বের একটি বিশিষ্ট দিকের উন্মোচক। চতুরঙ্গ চেতনাপ্রবাহধর্মী উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত - প্রেম, আধ্যাত্মিকবিষয় সর্বোপরি জীবনবাদ এই উপন্যাসের মুখ্য আলোচিতব্য বিষয়। 'চার অধ্যায়' সশস্ত্রবিপ্লববাদীদের কার্যসূচীর পটভূমিকায় অতীন্দ্র-এলার প্রেমজীবনের করুণ পরিণতির কাহিনী। 'শেষের কবিতায' রবীন্দ্রনাথ চিররোম্যান্টিক' - উপন্যাসটিতে প্রেমতত্ত্বের এক অভিনব পরিচয় প্রদর্শিত হয়েছে। এখানকার ভাব, ভাষা, কবিতার অর্থবহ প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের যৌবনোচ্ছ্বাসের মাত্রাকে বহুগুণিত করে তুলেছে। এছাড়াও প্রেমসমস্যার আরও নতুন দিক লক্ষ্য করা যাবে তাঁর 'দুইবোন', 'মালঞ্চ' প্রভৃতি উপন্যাসে।

রবীন্দ্রনাথ মননশীল ও উচ্চচিন্তার অধিকারী ছিলেন। তাঁর উপন্যাসে সেই অর্থে সাধারণ মানুষের জীবন-সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদির কথা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়নি। তিনি বস্তুতঃপক্ষে মানবজীবনের গভীর থেকে এমন কিছু সমস্যা, এমন কিছু সত্যকে তুলে আনতে চেয়েছিলেন যা কোন নির্দিষ্ট মানবশ্রেণী বা নির্দিষ্ট সমাজনির্ভর নয়, তিনি ব্যাপক অর্থে মানুষকেই তাঁর উপন্যাসের আলোচ্য বিষয় করতে চেয়েছেন।

ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাঢ় অঞ্চলের মানুষ হওয়ার সুবাদে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় অতি শৈশব থেকেই রাঢ়ের প্রকৃতি, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সেখানকার লোকজীবন, আদিবাসী-উপজাতি জীবনের স্বাতন্ত্র্য, লোক-সংস্কৃতি, ভাষা, উৎসব-অনুষ্ঠান এবং যন্ত্রসভ্যতার পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ়ের আদি অকৃত্রিম রূপটির ক্রমিক পরিবর্তরে লক্ষণ সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অন্যদিকে জমিদারী জীবনের সঙ্গে সংযোগ ছিল বলে জমিদারতন্ত্রের বিলোপ ও সামন্ত্রতন্ত্রের অবক্ষয়ের দিকগুলিও তাঁর দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়েই উপস্থিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রোত্তর উপন্যাস সাহিত্যে যাঁরা অভিজাত, মধ্যবিত্ত জীবন ও নগরকেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করে উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রকে প্রত্যন্ত মফঃস্বল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তারাশংকরের উপন্যাসে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট - আঞ্চলিক হয়েও তাঁর উপন্যাসগুলি মানবজীবনের সর্বজনীন ধর্মটিকেই উদ্ঘাটিত করেছে। তাঁর চৈতালীঘূর্ণী, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, নাগিনীকন্যার কাহিনী, কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, কবি, ধাত্রীদেবতা সেই শ্রেণীর উপন্যাস। 'ভিসনের' গভীরতা যাঁর যত বেশী এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে যিনি বৃহৎকে আবিষ্কার করতে পারেন, তিনি তত বড় সাহিত্যিক। তারাশংকরের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্যই বর্তমান ছিল। তাই তাঁর উপন্যাসে অভিজাত-সভ্রান্ত চরিত্রের পাশে কোনো আদিবাসী যুবক, অন্ত্যজ প্রৌঢ় কিংবা অশিক্ষিত কবিয়াল সমান মর্যাদা নিয়ে দন্ডায়মান রয়েছে।

টিপ্পনী

তারাশংকর নিছক আঞ্চলিক জীবনের রূপকার নন। তাঁর উপন্যাসের পরিধি গ্রাম থেকে শহরে এবং শহর থেকে মফঃস্বলেও বিস্তারিত হয়েছে। নাগরিক জীবনের পটভূমিকাতেও তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন। বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থায়ী অবদানের কথা অস্বীকার করা যাবে না।

টিপ্পনী

(ঘ)

কবি মধুসূদন দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ অতিক্রম করে বাংলা কাব্যসাহিত্যে ভগীরথের মত কলকল্লোলিনী পাশ্চাত্য ভাবধারাকে যিনি আবাহন করে এনেছিলেন তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আপাদমস্তক পাশ্চাত্য চিন্তায় চিন্তিত এই কবি বাংলা সাহিত্যে সব দিক থেকেই আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন। পয়ারের একঘেয়ে সুর থেকে তিনি বাংলা কবিতায় নিয়ে এসেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের তীব্র প্রবহমানতা, পঙ্‌ক্তি থেকে অন্য পঙ্‌ক্তিতে গিয়ে স্বাধীনভাবে যতি স্থাপনের ব্যাপারে কবির স্বাধীনতা - এক কথায় পয়ারের অক্টোপাস-বন্ধন থেকে বাংলা কবিতা মুক্তি পেল গতির জগতে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যুগন্ধর কবি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিই বিদ্যাভারতীর আশীর্বাদপুষ্ট। তাঁর প্রথম আখ্যান-কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য - প্রথম কাব্যেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ-উত্থানের সম্ভাবনা তৈরী করে রাখলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করে তিনি পেলেন 'মহাকবি'র শিরোপা। 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রচলিত বিশ্বাস আদর্শের প্রতি এক চরম বিদ্রোহ - রামচন্দ্র তাঁর কাছে ঘৃণিত চরিত্র আর লঙ্কাধিপতি দশানন 'Grand fellow.' সমগ্র কাব্য জুড়ে মহাকবি মধুসূদনের বিচিত্র কারুকার্য রচনাটিকে সার্থক 'Literary Epic' বা সাহিত্যিক মহাকাব্য করে তুলেছে।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন কোমলপ্রাণ। 'Poor lady of Braja'-রাধার মনোবেদনার সমব্যথী তিনি। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভার সর্বোচ্চ উন্মোচন - স্বাধীনচেতণা, জীবনবাদিনী, স্পষ্টভাষিণী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী একগুচ্ছ পৌরাণিক ভারতীয় নারীচরিত্রের প্রিয়জনসকাশে পত্রমাধ্যমে আত্মবক্তব্য উপস্থাপন। শকুন্তলা, তারা, কেকয়ী, শূর্পণখা, জনা —এরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নারীচরিত্র।

'বীরাঙ্গনা' কাব্য পরিকল্পনায় মধুসূদন পাব্‌লিয়াস্ ওভিদিয়াস্ ন্যাসো - সংক্ষেপে ওভিদের কাছে ঋণী। ওভিদের কাব্যের নাম 'Heroides'- কিন্তু ওভিদের কাব্যমানসিকতা ও জীবনাদর্শ মধুসূদনের কাছে সবটা গ্রহণীয় ছিল না, তাই তিনি 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে ভারতীয় জীবনের পক্ষে গ্রহণীয় বক্তব্যকেই কাব্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুধু বাংলা কাব্যসাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা বিস্ময়কর বলেই বিবেচিত হবে। রবীন্দ্রনাথ নিজের কবি পরিচয়কেই সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অতিবাল্যকাল থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে সংস্কৃতিমনস্ক পরিবেশে তাঁর কবিমন লালিত-পালিত হয়েছিল। শৈশব থেকে তাঁর কাব্যচর্চার সূত্রপাত, এবং প্রারম্ভিক যৌবনেই তাঁর কাব্যগ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী কড়ি ও কোমল ইত্যাদি

হল তাঁর কবিত্বের উন্মেষ পর্বের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

এগুলিতে যৌবনসুলভ আবেগ, অতিকথন এবং কখনও কখনও দুঃসাহসী চিন্তা (কড়ি ও কোমলের বেশ কয়েকটি কবিতায়) রবীন্দ্রনাথকে জীবন ও কাব্যের এক রহস্যময় জগতে পরিচালিত করেছে। তারপর পূর্ববঙ্গে শিলাইদহ, সাজাদপুর ইত্যাদি অঞ্চলে গ্রামীণপরিবেশে প্রকৃতির উন্মুক্ত কোলে রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা সৃষ্টির ঐশ্বর্যপর্বে উপনীত হল - প্রকাশিত হল মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালীর মত কাব্যগ্রন্থ - রবীন্দ্রকাব্যজীবনের এই পর্বকে স্বর্ণপর্ব বলেও কেউ কেউ অভিহিত করেছেন।

টিপ্পনী

এই ঐশ্বর্যপর্বের যুগ পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিক্রমা আরও দূর-বহুদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। প্রেম, প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সৃষ্টির গতিবাদ, দার্শনিক বোধ - এমন কোন বিষয় নেই যা রবীন্দ্রকবিতায় অনুল্লিখিত থেকেছে। প্রকৃতঅর্থেই তিনি বিশ্বকবি - তিনি বিশ্বনাগরিক। খন্ডের সাধনা নয়, অখন্ডের সাধনায় তিনি বিশ্বাসী; সীমা আর অসীমের মিলনেই জীবনের পূর্ণতা - এই তাঁর উপলব্ধি; নৈরাশ্য নয়, আনন্দবাদই হল জীবনের মূলধন; কারণ - 'অমৃতরূপমৃতং যদ্বিভাতি।'

কাজী নজরুল ইসলাম

মূলতঃ বিদ্রোহীকবি হিসেবে পরিচিত হলেও কাজী নজরুল ইসলাম প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও রচনা করেছে। নজরুলের বিদ্রোহমূলক কবিতাগুলি আবেগাত্মক। তাঁর বিদ্রোহ অত্যাচারী শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে, সমাজের অন্যায়-অবিচার এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে। ক্ষুদ্র স্বার্থ, সংকীর্ণ চিন্তা, ধর্মের গোড়ামি এবং সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি উপেক্ষা এসবের বিরুদ্ধেও তাঁর বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ। নজরুল তাঁর কবিতায় যা বলেছেন তা প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্টভাবব্যঞ্জক। তাঁর কবিতায় হয়তো সবসময় উচ্চভাব ও গভীর মননশীলতা নেই - কিন্তু তাঁর বক্তব্য সব ধরণের কাপট্যমুক্ত। সমসাময়িক সমাজ-সত্যকে ফুটিয়ে তোলার দিকে কাজী নজরুল ইসলামের ঝোঁক বেশী ছিল বলে অনেকে তাঁকে 'যুগের কবি', 'স্বভাব-কবি', 'হুজুগের কবি' বলে অবিহিত করেছিলেন। নজরুলের কাব্যভাষা হল মিশ্ররীতির। বাংলা ভাষার মধ্যে তিনি প্রচুর আরবী-ফার্সী শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর প্রেম ও প্রকৃতিমূলক কবিতায় কোমলপ্রাণ ও সৌন্দর্যপ্রেমিক কবিসত্তার পরিচয়টি পরিস্ফুটিত হয়েছে।

কবি জীবনানন্দ দাশ

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য-কবিতায় জীবনানন্দ দাশ একটি স্বতন্ত্রধারার স্রষ্টা। রবীন্দ্রবিরোধী কবিগোষ্ঠীর মত তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধিতা উচ্চকণ্ঠ বা প্রচারমুখী নয়, জীবনানন্দের রবীন্দ্রবিরোধিতা আত্মনিমগ্ন এক কবির স্বভাবজাত স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যশৈলীর নির্জন স্বাক্ষরে। জীবনানন্দের কবিতা তাঁর নিজস্ব প্রাণধর্মের মতই স্বাভাবিক - কোন বাহ্য প্রণোদনা নয়, বাইরের কোন তাগিদে নয়, জীবনানন্দের কবিতা রাত্রির শিশির পতনের মতই নিঃশব্দ ক্রিয়া, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ও সময়ানুগত। জীবনানন্দের প্রিয় ছন্দ মিশ্রবৃত্ত ছন্দ, প্রিয় শব্দের তালিকায় রয়েছে তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও বিদেশী শব্দ থেকে শুরু করে একেবারে দেশজ-লৌকিক ও অকুলীন শব্দ। মরা, ঠ্যাং, পচা চালকুমড়ো, কুষ্ঠরোগী, লাসকাটা-ঘর, চিল, শালিক, ছাতারে পাখি, ভুমুর, কলমিলতা - কোন

টিপ্পনী

শব্দই তাঁর কাছে অকাব্যিক নয়। তাঁর কবিতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বাস্তবরূপের প্রতিফলন আছে, টি, এস, এলিয়ট, ইয়েট্‌স্ প্রমুখ কবিদের কাব্যশৈলী চিত্রকল্প ইত্যাদির প্রভাব আছে - কিন্তু জীবনানন্দ পাশ্চাত্য কবিদের মত বন্ধ্যাপৃথিবীর নিষ্প্রাণ রূপ দেখে শোক-কবিতা লেখেন নি, তাঁর কবিতায় আছে নতুন প্রভাতের ইশারা, 'নিস্তেল' বাংলার বুকে নবান্নের উৎসব শুরু হওয়ার ইঙ্গিত কিংবা 'জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার' শূন্য করে চলে যাওয়ার জীবনবাদী ঘোষণা। তিনি মনে করতেন কবিতার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, তার মধ্যে থাকবে কবি-মননের স্পন্দন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হয়ে উঠতে হবে কবিতা। কবিতা বিতরণের সামগ্রী নয়, কাব্য-রসিকের প্রাণের আরাম হল কবিতা। তাঁর 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে শুরু করে 'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা অবেলা কালবেলা' এবং অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের কবিতায় জীবনানন্দ কবিতাকে পাঠকের অনুভূতির গভীরে পৌঁছে দিয়েছেন অসাধারণ কাব্য-কুশলতায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় খুঁজে পেয়েছেন কবিত্বের রস, বুদ্ধদেব বসুদের মত কবিবৃন্দ বিস্ময়ে আভিভূত হয়েছেন তাঁর কবিত্বের কারুকৌশলে - কিন্তু এও সত্য জীবনানন্দের কবিতা অনুকরণের বিষয় নয়; ফলতঃ জীবনানন্দ নিজেই বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্রধারা —পালাবদলের ঋত্বিক তিনি, কিন্তু উত্তরসূরীদের কাছে প্রায় অ-ধরা।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. বাংলা গদ্যের উন্মেষপর্বে মিশনারীদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিত-লেখকবর্গের সৃষ্ট বাংলা গদ্যভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করুন।

৪. বাংলা গদ্যভাষার ক্রমবিকাশে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণের বাংলা গদ্যভাষারীতির সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের পার্থক্য উল্লেখ করে রাজা রামমোহন রায়ের সাহিত্য-প্রতিভার মূল্যায়ন করুন।

৬. বাংলা গদ্যভাষার যথার্থ শিল্পরূপ সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৭. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থ অবলম্বনে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় দিন এবং এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলা কতখানি সমীচীন বিচার করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১. দু'জন পোর্তুগীজ মিশনারী রচিত বাংলা গদ্যগ্রন্থের পরিচয় দিন।

২. শ্রীরামপুর মিশন বাংলা গদ্যভাষার বিকাশে কি ভূমিকা পালন করেছিল?

৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদ গ্রন্থগুলির পরিচয় দিন।

৪. সংস্কৃত থেকে অনূদিত রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করুন এবং এই অনুবাদ

কর্মের পিছনে তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল বলে আপনার মনে হয়।

৫. রাজা রামমোহন রায়ের বিতর্কমূলক পুস্তিকাগুলির পরিচয় দিন।

টীকা লিখুন ঃ

১. ক) ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সম্বাদ খ) কথোপকথন গ) লিপিমালা ঘ) প্রবোধচন্দ্রিকা ঙ) রাজাবলী।

টিপ্পনী

(খ) রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত নাটকগুলি অবলম্বনে নাট্যকারের নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিন।

২. মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৩. বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৪. বাংলা নাটক রচনায় দীনবন্ধুর সাফল্য-অসাফল্যের দিক দুটি তাঁর রচিত নাটক অবলম্বনে ব্যাখ্যা করুন।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকগুলির শ্রেণীবিভাগ করুন এবং তাঁর রচিত রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির শিল্পসার্থকতা বিচার করুন।

৬. প্রথাধর্মী নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৭. গণনাট্য বলতে কি বোঝেন? এই শ্রেণীর নাট্যরচনায় বিজন ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব বিচার করুন।

৮. বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিজন ভট্টাচার্যের অবদান সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করুন।

টীকা লিখুন ঃ

১. ক) কৃষ্ণকুমারী খ) পদ্মাবতী গ) নীলদর্পণ ঘ) সধবার একাদশী ঙ) জামাই বারিক চ) বিসর্জন ছ) রাজা ও রাণী জ) চিত্রাঙ্গদা ঝ) মালিনী ঞ) রক্তকরবী ট) মুক্তধারা ঠ) রাজা ড) রথের রশি ঢ) নবান্ন ণ) জবানবন্দী।

গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির শ্রেণীবিভাগ করুন এবং তাঁর ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলির পরিচয় দিন।

২. সামাজিক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব বিচার করুন।

৩. বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় দিন।

৪. উপন্যাস-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫. সামাজিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করুন।

৬. বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৭. আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব বিচার করুন।

৮. তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সমস্ত উপন্যাসে যুগসন্ধির লক্ষণ ফুটে উঠেছে সেগুলির বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় দিন।

৯. তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'রাঢ়ের ঔপন্যাসিক' বলা কতদূর সঙ্গত বিচার করুন।

টিপ্পনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১. বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বমূলক উপন্যাসগুলির নাম বলুন। সেগুলিতে কোন্ তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে?

২. রোমান্স কাকে বলে? বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সধর্মী উপন্যাস কোন্গুলি?

৩. রবীন্দ্রনাথ রচিত দুটি রাজনৈতিক উপন্যাসের নাম বলুন। উপন্যাস দুটিতে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক বক্তব্য স্থান পেয়েছে?

৪. রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসটি প্রথমে কোথায় প্রকাশিত হয়? বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে 'চোখের বালির' গুরুত্ব কোথায়?

৫. রাঢ় অঞ্চলের চিত্রসমন্বিত তারাশংকরের চারটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৬. 'গণদেবতা' ও পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ

বিষবৃক্ষ, রাজসিংহ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কপালকুন্ডলা, আনন্দমঠ, রজনী, গোরা, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা, ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, নাগিনীকন্যার কাহিনী, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, সপ্তপদী।

ঘ) রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবি-ধর্মের পরিচয় দিন।

২. প্রচলিত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যজগতে যে নতুনত্বের সঞ্চার করেছিলেন, তাঁর রচিত কাব্যগুলি অবলম্বনে তা বিশ্লেষণ করুন।

৩. উন্মেষপর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যকবিতার সামগ্রিক পরিচয় দিন।

৪. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

৫. কাজী নজরুল ইসলামের কবি-মানসিকতা ও কাব্য-স্বভাবের পরিচয় দিন।

৬. বিদ্রোহের কবিতা ছাড়াও কাজী নজরুল ইসলাম প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছেন - আলোচনা করুন।

৭. জীবনানন্দ দাশকে রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি বলা হয় কেন তাঁর কাব্য-কবিতা আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৮. জীবনানন্দ দাশের মূল কাব্যগ্রন্থগুলি অবলম্বনে তাঁর কবি-ধর্মের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১. মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৌলিক চিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২. 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নামকরণে মধুসূদনের কোন্ ভাবনা ক্রিয়াশীল ব্যাখ্যা করুন।

৩. রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম বলুন। কবিতা রচনার প্রথম পর্বে প্রকাশিত তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।

৮. 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের কবিতায় কাজী নজরুলের কি জাতীয় মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে বলুন।

৫. নজরুলের কবি-স্বভাবের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করুন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তৃতীয় একক – বৈষ্ণব পদাবলী (নির্বাচিত পদ)

পূর্বকথা

ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, সুর-তাল-লয় ইত্যাদি সমন্বিত গীতি বা সঙ্গীতের যে লিখিত রূপ, তাকেই সাধারণতঃ পদ বলা হয়। পদের সমষ্টি হল পদাবলী। বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে পদ বা পদসমষ্টি তাকেই এক কথায় বৈষ্ণব পদাবলী বলা হয়। বিষ্ণু দেবতা যার অথবা বিষ্ণুর উপাসক যিনি তিনিই বৈষ্ণব। অতএব বৈষ্ণবপদাবলী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় উভয়ের মধ্যে এক গাঢ়তর সম্পর্ক আছে – সেই বিচারে বৈষ্ণব পদাবলী ধর্মীয় সাহিত্য। খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকেই এদেশে বৈষ্ণব ধর্মীয় বিশ্বাসের বনিয়াদটি স্থাপিত হয়েছিল – তবে বিষ্ণু, নারায়ণ – কৃষ্ণ এঁদের সম্পর্ক, স্বরূপ ইত্যাদি নিয়ে নানা গ্রন্থে ও নানাজনের মতে পার্থক্য বিস্তর। আমরা বিতর্কের সেই ব্যাসকূটে প্রবেশ না করে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে প্রেম-রসিক, ঐশী চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দময় সত্তা রাধার অভূতপূর্ব প্রেমলীলার যে রসায়ন তা আস্বাদনে প্রবৃত্ত হব।

টিপ্পনী

প্রাক্-চৈতন্যযুগ এবং চৈতন্যযুগ -এই দুই সময়পর্বে বৈষ্ণব পদাবলীর বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ এবং আবেদনগত পার্থক্যগুলি চোখে পড়ার মত। প্রাক্-চৈতন্যযুগে জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং ভাগবতের মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলাসংক্রান্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তারও পূর্বে সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সুভাষিতাবলী, গাহা সত্তসঈ (গাথাসপ্তশতী) ইত্যাদি গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ নাম ও প্রসঙ্গসমন্বিত পদগুলিতে কোন আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা, অপার্থিব চেতনা কিংবা ঐশীলীলাসংক্রান্ত বক্তব্য ছিল না। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যও অধ্যাত্মভাবনার আবরণে আদিরসাত্মক ভাবনার প্রকাশনামাত্র। আদিমধ্যযুগে রচিত বড়ুচণ্ডী দাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকৃত অর্থে লৌকিক নায়ক-নায়িকার কামনা-বাসনামন্ডিত প্রেমকাহিনীর স্থূল সংস্করণ – যার জন্য বলা হয়, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণও নাই, কীর্তনও নাই।"

মিথিলার কবি বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত পদাবলী মূলতঃ মর্ত্যজীবনকেন্দ্রিক ভাবনা ও জাগতিক নর-নারীর প্রেম-বিরহ-মিলন সমন্বিত ভাবের দ্যোতক হলেও সেগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই একটা অধ্যাত্মভাবনা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে আত্ম প্রকাশ করেছে। চৈতন্যপূর্ব চন্ডীদাসের পদাবলীও সেই অর্থে মর্ত্যজাগতিক প্রেমাদর্শ, প্রেমের সুখ-দুঃখ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও মিলন প্রত্যাশার আন্তরিক রূপায়ন হিসেবেই প্রতিভাত হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য, বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলী এবং চন্ডীদাসের পদ পাঠে অপার্থিব লীলারসে নিমগ্ন হয়ে যেতেন।

প্রাক্-চৈতন্য, চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের পার্থক্য ঃ

প্রাক্-চৈতন্যযুগ থেকেই রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক রচনার যে প্রচলন ছিল, সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই রাধাকৃষ্ণলীলা কথা ও পদাবলীর ধারা যদি বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে এদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কিছু বিশেষত্ব ধরা পড়বে। যেমন প্রাক্চৈতন্য এবং চৈতন্য-সমকালীন অথবা চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যুগগত কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে।

টিপ্পনী

১. প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদাবলী বিশুদ্ধ বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত হয় নি। সেগুলি মূলতঃ সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করে রাধা এবং কৃষ্ণের মধ্যে মর্ত্য-প্রেমিক-প্রেমিকার গুণাবলী সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে — দেবত্ব অপেক্ষা মানবিক বৈশিষ্ট্যই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এই পর্যায়ে অনেক পদাবলীকার ছিলেন যাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন না। রাধা-কৃষ্ণের গভীর প্রেম-কথার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তাঁরা পদাবলী রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন।

কিন্তু চৈতন্য সমকালীন বা চৈতন্যোত্তর যুগে পদাবলীকারগণ একাধারে ভক্ত-বৈষ্ণব ও কবি। তাঁদের রচিত পদাবলীতে তাই রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলার প্রকাশ ঘটেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়ে। ফলতঃ রাধাকৃষ্ণের প্রেম কথা বর্ণনায় এই পর্যায়ের কবিগণ স্থূল মানবিক দৃষ্টিকোণের পরিবর্তে পরকীয়া প্রেমের এক স্বর্গীয় রূপকে উদঘাটন করেছেন।

২. প্রাক্-চৈতন্য যুগে মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে কারণে ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যমন্ডিত প্রেম-স্বরূপটিকেই কবিগণ অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রভাবে ঐশ্বর্যমন্ডিত প্রেমের স্থলে মধুর রসের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৩. চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলীতে একটি নতুন পর্যায়ের উদ্ভব হয়েছিল - তা হল, গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী। এই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলীর আবার দুটি রূপ - একটি ধারায় শ্রীগৌরাঙ্গের মানবিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয় স্থান পেয়েছে, সেগুলি বিশুদ্ধ গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী। আর কিছু পদে রাধাকৃষ্ণের যুগলতনু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মধ্যে রাধা অথবা কৃষ্ণভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিজীবন সেগুলিতে গৌণ। এগুলি গৌরচন্দ্রিকা এই জাতীয় পদগুলি রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ পর্যায়ের পালাকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূল পালাগানের ভূমিকাস্বরূপ কীর্তনীয়াগণ আসরে পরিবেশন করতেন। গৌরচন্দ্রিকা হল রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত কীর্তনগানের প্রবেশকস্বরূপ।

বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্ব

বৈষ্ণব-দর্শনশাস্ত্রে কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণরতিকেই একমাত্র 'রতি' বলে গণ্য করা হয়। রতি হল প্রেম। শান্ত, দাস্য, সখ্য বা বাৎসল্য নয়, মধুর রসের সাহচর্যেই কৃষ্ণপ্রেম গাঢ়তাপ্রাপ্ত হয়। এই প্রেমের রূপ তিন প্রকার - সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা।

সাধারণের যে রতি, তা হল সাধারণী রতি। এই রতিতে সম্ভোগের ইচ্ছা প্রবল। তাই এখানে আত্মরতিই মুখ্য - অতএব বৈষ্ণবদর্শনের বিচারে এই রতি উচ্চপর্যায়ের নয়। সমঞ্জসা রতির প্রকাশ ঘটে কৃষ্ণের সঙ্গে নায়িকার পরিণয়বন্ধনসূত্রে - যেমন, রুক্মিনী এবং সত্যভামার পরিণয়সূত্রে কৃষ্ণসঙ্গলাভ। এই রতিও শ্রেষ্ঠ রতি নয়। এখানেও আত্মরতির প্রাধান্য থেকে যায়।

কৃষ্ণের জন্য সমাজ, ধর্ম-কুল-মান-জাতি-আত্মজন-পরিজন, আমিত্ব এককথায় সর্বস্বত্যাগ, কৃষ্ণসুখবিধানেই আত্মসুখ অনুভব এবং কৃষ্ণ তৃপ্তি পেলেই আত্মতৃপ্তিবোধ - এমন রতিকেই বলে সমর্থা রতি।

ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী এবং শ্রীরাধার রতি হল সমর্থা -এঁরা কৃষ্ণের 'নিত্যপ্রিয়া'।এঁদের মধ্যে চন্দ্রাবলী ও রাধা হলেন শ্রেষ্ঠা - আরও সুক্ষ্ম বিচারে এই দু'জনের মধ্যে আবার রাধাই উচ্চবর্তিনী। তিনি মহাভাবময়ী।

শ্রীকৃষ্ণ হলেন সচ্চিদানন্দ (সৎ+চিৎ+আনন্দ)। তাঁর যিনি আনন্দাংশ - তিনি রাধা। সমালোচকের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ নিজে "আনন্দস্বরূপ হয়েও যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং আনন্দ অনুভব করেন এবং জীবগণকে অনুভব করান সেই শক্তির উদ্ভব হয় আনন্দ অংশে, তার নাম হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনীর সার হল প্রেম এবং প্রেমের পরম সার মাদন নামক মহাভাব। শ্রীরাধা এই মহাভাবস্বরূপ।"

টিপ্পনী

এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবশাস্ত্রে উল্লিখিত পরকীয়া নায়িকাতত্ত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে। রাধা বিবাহিতা, সেই অর্থে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দিক থেকে পরকীয়া নায়িকা। পরকীয়া প্রেম লৌকিক অর্থে অনৈতিক - তা লৌকিক-সমাজ-অননুমোদিত।বাহ্য দৃষ্টিতে দেখলে শ্রীকৃষ্ণের রাধার প্রতি প্রেম অনৈতিক। কিন্তু শাস্ত্রমতে রাধা কৃষ্ণেরই স্ব-শক্তির প্রকাশ - সেই অর্থে এই প্রেম স্বকীয়া।আবার অন্যদিকে "জীব রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের সহস্র বন্ধনে বাঁধা বলিয়া জগতের স্বকীয়, ভগবানের পরকীয়। ভগবানের আহ্বানে সাড়া দিতে হইলে জীবকে সংসারবন্ধন তুচ্ছ করিয়া বাহির হইতে হয়; ইহাই পরকীয়ার অভিসার।" সাধারণ মানুষ বৈষ্ণব-দর্শনের এই গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বলেই তাঁরা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে নীতিহীনতাদোষে দুষ্ট বলে মনে করেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন -

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ।।
মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।

স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রেমের আবেদনগত পার্থক্য নিরূপণের দ্বারাও রাধাকৃষ্ণ প্রেমের পরকীয়া তত্ত্বের সারবত্তা নির্দেশ করা যায়।স্বকীয়া প্রেম হল নিজের বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি প্রেম।স্ত্রীর প্রতি প্রেম বৈচিত্র্যহীন।কারণ এই প্রেমের পক্ষে কোন বাধা, নিষেধ, প্রতিকূলতা বা কষ্টসাধ্য আয়াস নেই; এই প্রেম অনায়াসলভ্য।ফলে প্রেমের আকর্ষণী শক্তি এখানে শূন্য পরিমাণ।কিন্তু পরকীয়া প্রেমের পথে রয়েছে বহু বাধা-বিপত্তি, ন্যায়-নীতি-অনুশাসনের ভ্রূকুটি, সমাজ-পরিবার-পরিজনের শাসন - এ সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে, লাজ-লজ্জা ও পার্থিব জগতের নিয়মনীতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পরকীয়া প্রেমের নায়ক-নায়িকা পরপর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে।কারণ পরকীয়া প্রেমের আকর্ষণীশক্তি দুরপনেয়, অপ্রতিরোধ্য।সেইরকম পার্থিব সব মায়াবন্ধন অগ্রাহ্য করেও জাগতিক সম্পর্ককে নশ্বর জ্ঞান করে ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণকে জীবন-মরণের সঙ্গী করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, তখন লৌকিক পরকীয়া প্রেমের আকর্ষণী শক্তিই তার একমাত্র তুলনা হতে পারে।এখানে পরকীয়া প্রেমের রূপকার্থটিই বৈষ্ণবদর্শনের মূল নির্দেশিত বিষয়।বৈষ্ণব ভক্তসমাজ সততই বিশ্বাস করতেন

"কানুর প্রেম নিকষিত হেম, কাম-গন্ধ নাহি তায়।"

রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তি ঃ

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে "রাগাত্মিকা ভক্তির কথা শুনে লুব্ধ হয়ে যে সব ভাগ্যবান ব্রজবাসীদের অনুগমন করেন, শাস্ত্রের যুক্তি মানেন না, তাদের ভক্তিই রাগানুগা ভক্তি। অন্যদিকে রাগাত্মিকা ভক্তিতে কৃষ্ণপ্রেম "সাধন দ্বারা অর্জিত নয়, - তা জন্মগত, স্বভাবজাত।"

টিপ্পনী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ভক্তেরা সখীভাব বা মঞ্জরীভাবের সাধনাকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে মনে করে থাকেন। এই সাধনরীতিতে বৈষ্ণব ভক্ত কবিগণ রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলায় নিজেরা সখী বা মঞ্জরীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং পরমানন্দে রাধা-কৃষ্ণের সেবা-পরিচর্যা করে দূরে অবস্থান করে মানস-নয়নে সেই লীলানন্দ পর্যবেক্ষণ করেছেন। পুষ্প-লতিকায় নিজে ফুল হয়ে না ফুটে, সেই লতিকা-মূলে জল সিঞ্চন করে লতিকাকে পুষ্পিত করে তোলাতেই তাঁদের অধিকতর তৃপ্তি।

প্রাক্-চৈতন্যযুগে সাধারণতঃ সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে উল্লিখিত নায়ক-নায়িকা প্রকরণকেই কাব্য-কবিতায় মান্যতা দেওয়া হত। রাধা-কৃষ্ণ সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনা ও পদাবলী সাহিত্যেও সেই রীতি দীর্ঘকাল অনুসৃত হয়েছে। প্রাক্-চৈতন্যযুগে রাধা-কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত বিভিন্ন পালাগান যেমন দানলীলা, নৌকালীলা ইত্যাদিতে রাধা-কৃষ্ণের পৌরাণিক পরিচয়টিকে বহিরঙ্গে রেখে অন্তরঙ্গে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের নায়িকা-প্রকরণ তথা লৌকিক জীবনের প্রেমভাবকেই কাব্যাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

কিন্তু চৈতন্যযুগ ও চৈতন্যোত্তর যুগে আবেগাত্মক বৈষ্ণবধর্ম যখন একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হল তখন নায়ক-নায়িকা প্রকরণে বৈষ্ণবকবিগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের নির্দেশাবলী মেনে চললেন। এ ব্যাপারে তাঁদের পথিকৃৎ হয়ে উঠল রূপগোস্বামী চরিত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ।

শৃঙ্গার রস - বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ

প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়ক-নায়িকা প্রকরণে শৃঙ্গার রসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই শৃঙ্গার রসের দুটি ভাগ - বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। রূপ গোস্বামীও শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসের দুটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন এবং সেই শ্রেণী বিভাগ সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রেরই পুনরুক্তি অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

বিপ্রলম্ভ মিলনের বিপরীত মেরু হলেও বিপ্রলম্ভকে সম্ভোগ বা মিলনের পুষ্টিসাধক বলে অভিহিত করা হয়। রূপ গোস্বামীর মতে "রঞ্জিত বস্ত্রের পুনর্বার রঞ্জনে রঙের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পায়, তেমনি বিপ্রলম্ভের দ্বারা অনুরাগ ও মিলনের আনন্দ গাঢ়তর হয়।" এই বিপ্রলম্ভ কি? নায়ক এবং নায়িকা উভয়ের অভিমত আলিঙ্গন ইত্যাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকটিত হয় তাকে বিপ্রলম্ভ বলে।

বিপ্রলম্ভ চার প্রকার - পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

পূর্বরাগ ঃ মিলনের পূর্বে যে রতি দর্শন, শ্রবণাদি দ্বারা উৎপন্ন হয়ে বিভাবাদির সংযোগে আস্বাদনীয় অবস্থা লাভ করে, তখন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাকে পূর্বরাগ বলেন।

১) 'দর্শন' বলতে সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপট দর্শন ও স্বপ্নেদর্শন।

২) শ্রবণ বলতে দূতীমুখে শ্রবণ, ভাটমুখে শ্রবণ, গুণিজনের নিকট শ্রবণ এবং বংশীধ্বনি শ্রবণকে বোঝায়।

পূর্বরাগ উৎপন্ন হলে নায়ক-নায়িকার দশটি দশা বা অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেগুলি হল - লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, তানব বা কৃশতা, জড়িমা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু।

টিপ্পনী

মান ঃ 'মান' - এর সংজ্ঞা নানাভাবে দেওয়া হয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, প্রতিনায়িকা যদি নায়ক কর্তৃক উৎকর্ষ বা প্রাধান্য লাভ করেন, তাহলে নায়িকার মনে ঈর্ষাজনিত যে রোষের উদ্ভব হয়, তারই আস্বাদনীয় অবস্থার নাম মান। মানের দুটি বিভাগ - সহেতু মান এবং নির্হেতু মান।

নির্হেতু মানে প্রেমের আধিক্য থাকে বলে একে সহেতু মানের চেয়ে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

'মান' পর্যায়ে নির্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চপলতা, গর্ব, অসূয়া, গ্লানি ইত্যাদি ভাব দৃষ্ট হয়।

প্রেমবৈচিত্ত্য ঃ

প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে -

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।।

অর্থাৎ প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয়ের সন্নিকটে থেকেও তার সঙ্গে বিচ্ছেদভয়ে যে বেদনার উপলব্ধি, তার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।

প্রেমবৈচিত্ত্যই বৈষ্ণবপদাবলীতে আক্ষেপানুরাগে পরিণত হয়েছে। রূপগোস্বামীর মতে এই আক্ষেপ আটটি বিষয়কেন্দ্রিক - নিজের প্রতি আক্ষেপ, সখীর প্রতি আক্ষেপ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, দূতীর প্রতি আক্ষেপ বংশীর প্রতি আক্ষেপ, বিধাতা, কন্দর্প এবং গুরুজনদের প্রতি আক্ষেপ।

প্রবাস ঃ "পূর্বে মিলিত হয়েছিলেন, এমন নায়ক-নায়িকার দেশ বা স্থানান্তরের ব্যবধানকে বলে প্রবাস।" এই প্রবাসকেই বলে বিরহ। চৈতন্যযুগে এই বিরহকেই 'মাথুর' বলা হয়েছে। এই প্রবাস তিন প্রকার - ভাবী প্রবাস, ভবন প্রবাস, ভূত প্রবাস।

বিরহেরও দশটি দশা - এই দশটি দশা বা অবস্থা পূর্বরাগেরই অনুরূপ।

সম্ভোগ ঃ শৃঙ্গার রসের অন্যতম বিভাগ হল সম্ভোগ। সম্ভোগ হল "নায়ক-নায়িকার মিলনজাত উল্লাসময় ভাব।" বৈষ্ণবপদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলাকেই সম্ভোগ বলা হয়েছে।

সম্ভোগ দু'প্রকার - মুখ্য সম্ভোগ ও গৌণ সম্ভোগ।

মুখ্য সম্ভোগ আবার চারটি ভাগে বিভক্ত - সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান।

গৌণসম্ভোগ বলতে স্বপ্নসম্ভোগকে বোঝায়।

এছাড়া ভাবসম্মেলন পর্যায়ে যেখানে রাধাকৃষ্ণের মিলন ব্যাপারটি সম্পূর্ণতঃ রাধার মানসিক ব্যাপার, সেখানে এই পর্যায়ের পদগুলিও গৌণ সম্ভোগের অন্তর্ভুক্ত বলেই ধরে নেওয়া হয়।

বৈষ্ণবপদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের লীলারসকে উজ্জ্বলনীলমণির আদর্শ অনুযায়ী কতকগুলি পর্যায়ে সজ্জিত করা হয়েছে। পর্যায়গুলি হল – পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, খন্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, রাসলীলা, মাথুরলীলা, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি।

টিপ্পনী

বৈষ্ণব পদাবলীতে নায়িকার মনোভাব ও আচরণকে প্রাধান্য দিয়ে নায়িকার আটটি বিভাগ নির্দিষ্ট হয়েছে। 'রসমঞ্জরী'–তে বৈষ্ণবপদকার পীতাম্বর দাস নায়িকার যে অষ্টবিভাগ করেছেন, সেগুলি হল – অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খন্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা এবং স্বাধীনভর্তৃকা।

অভিসারিকা ঃ রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে অভিসারিকার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে –

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা।।

অর্থাৎ,

যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান অথবা নিজে অভিসার করেন, তাঁকে বলা হয় অভিসারিকা। এই অভিসারিকা জ্যোৎস্না ও অন্ধকারে বিশেষ বেশ দ্বারা সজ্জিত হন। জ্যোৎস্না ও তামসী ভেদে অভিসার দু'প্রকার।

'গীতগোবিন্দ' 'সর্বাঙ্গসুন্দরী' টীকায় নারায়ণ দাস অভিসারিকার সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করেছেন – "দুরন্ত ও অতিশয় কামনার আগুনে উত্তপ্তা তীব্র ব্যাকুল মনে নির্ভীকভাবে যে নায়িকা দয়িতের সঙ্গে মিলনের জন্য যাত্রা করেন, তাঁকেই বলা হয় অভিসারিকা।"

বৈষ্ণব পদাবলীতে অভিসারের আটটি রূপ লক্ষিত হবে। সেগুলি হল – জ্যোৎস্নাভিসার, তামসী অভিসার, বর্ষাভিসার, দিবাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, তীর্থযাত্রাভিসার, উন্মত্তাভিসার এবং সঞ্চরাভিসার।

অভিসার কেবলমাত্র লৌকিক নায়িকার লৌকিক নায়কের উদ্দেশ্যে কষ্টসাধ্য যাত্রা নয়। অভিসারের একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও আছে।

কৃষ্ণ জীবাত্মাকে সর্বদা তাঁর দিকে আকর্ষণ করছেন। রাধিকা শব্দটি আরাধিকা অর্থদ্যোতক। রাধা জীবাত্মার প্রতীক। জীবাত্মাস্বরূপিনী রাধা কৃষ্ণের (দুর্লঙ্ঘ্য প্রেম) আকর্ষণে অভিসারের দুর্গমপথের যাত্রিনী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন –

"বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা –
পদে পদে মিলেছে একতানে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।"

বৈষ্ণব পদাবলীতে অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। অভিসারের পদে কাব্যিক সৌন্দর্যের রূপায়ণে গোবিন্দদাস তাঁর কাব্যগুরু বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম করে গিয়েছেন। তবে অভিসারের দু'একটি পদ রচনায় কবি রায়শেখর গোবিন্দদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উপস্থিত আছেন।

বাসকসজ্জিকা ঃ

কান্তের ইচ্ছানুসারে কান্তা স্বগৃহ ও স্বদেহ সজ্জিত করে নায়কের আগমনের জন্য কুঞ্জকুটীরে অপেক্ষা করেন এবং মিলন-কামনায় কান্তের আগমন পথ নিরীক্ষণ করেন, কখনও সখীর সঙ্গে নায়ক সম্পর্কিত আলোচনা করেন, আবার কখনও দূতীকে প্রেরণের প্রয়াস করেন - এই সমস্ত লক্ষণ ও আচরণযুক্ত নায়িকাকে বাসকসজ্জিকা বলে।

টিপ্পনী

উৎকণ্ঠিতা – নায়কের আগমনের বিলম্বহেতু বিরহভাবে আক্রান্ত নায়িকা বিরহভাবে পীড়িতা হয়ে অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে নায়কের জন্য অপেক্ষা করেন, তখন তাকে উৎকণ্ঠিতা বলে।

বিপ্রলব্ধা ঃ বিপ্রলব্ধার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে - "সঙ্কেত করা সত্ত্বেও নায়ক নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত না হলে উপেক্ষিতা নায়িকার অন্তর অতিশয় বেদনার্ত হয়, নায়িকার এই অবস্থাকে বলা হয় বিপ্রলব্ধা।"

খন্ডিতা – "ভোগ লক্ষণাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খন্ডিতা।" - অন্য নায়িকার ভোগ চিহ্নসহ পরদিন প্রভাতে নায়ক কুঞ্জদুয়ারে উপস্থিত হলে, নায়িকাকে খন্ডিতা বলা হয়।

চন্ডীদাসের একটি পদের অংশবিশেষ -

"হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ি কোন্ লাজে আস।।
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কনের দাগ।
কোন্ কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ।।"

কলহান্তরিতা – কান্তকে উপেক্ষা করে পরে নায়িকার অনুতাপ - কলহান্তরিতায় এই ভাবটি প্রতিফলিত হয়।

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।।

অর্থাৎ - যে নায়িকা সখীদের সম্মুখে পদানত বল্লভকে রোষভরে পরিত্যাগ করে পরে অনুতপ্তা হয়, তাকে কলহান্তরিতা বলে।

গোবিন্দদাসের একটি পদের অংশবিশেষ -

"যাকর চরণ- নখররুচি হেরইতে
মূরছিত কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণি লোটায়ল
পালটি না হেরলুঁ হাম।।
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।"

প্রোষিতভর্তৃকা – যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে, সেই নারীকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে। বৈষ্ণব পদাবলীতে নায়কের দূরদেশে গমনজনিত কারণে নায়িকার যে কাতর অপেক্ষা, সেই অপেক্ষমানা নায়িকাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে।

বিদ্যাপতির একটি পদে –

"কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।"

টিপ্পনী

স্বাধীনভর্তৃকা ঃ নায়িকার আয়ত্তে সর্বদা নায়ক অধিষ্ঠিত থাকলে সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে।

বৈষ্ণবপদাবলী (নির্বাচিত পদ)
গৌরচন্দ্রিকা -(১)

শ্রীরাগ[১]

নীরদ নয়নে নীর[২]ঘন সিঞ্চনে
পুলক[৩]-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ[৪] বিন্দু বিন্দু চুয়ত[৫]
বিকশিত ভাব-কদম্ব।।
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে[৬] ঝঙ্করু[৭]
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ[৮] সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর[৯]।।

পাঠান্তর - ১. বিভাষ ২. নব ৩. পুরল ৪. মরন্দ ৫. চোয়ত, চয়ত ৬. কমলে ৭. সঞ্চরু ৮. লোভে ৯.

নীরদ নয়নে..... পুলক - মুকুল অবলম্ব

জলপূর্ণ মেঘমালার ন্যায় মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের চক্ষুদ্বয় থেকে অবিরত বারি বর্ষিত হচ্ছে, আর সেই বারিপাতে যেমন বৃক্ষে বৃক্ষে মুকুল উদ্‌গত হয়, তেমনি মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের দেহে পুলকরূপ মুকুল উদ্‌গত হচ্ছে।

স্বেদমকরন্দ ... ভাবকদম্ব

শ্রীগৌরাঙ্গকে যেহেতু 'পুষ্পতরুর' সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে, সেইহেতু পুষ্প থেকে যেমন 'মকরন্দ' বা মধু ক্ষরিত হয়, তেমনি মহাপ্রভুর গাত্র থেকে অবিরত যে স্বেদশ্রুতি হচ্ছে তাকে মকরন্দের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 'বিকশিত ভাব-কদম্ব' শব্দের অর্থ ভাবরূপ কদম্বের প্রস্ফুটন। মুকুলের অবলম্বন তরু, আর সেই তরুতে কদম্বফুলের বিকশিত হয়ে ওঠা - এর বিশেষার্থ হল অশ্রু, পুলক, স্বেদ ইত্যাদি সাত্ত্বিকভাবের সঙ্গে অন্যান্য ভাবের বিকাশও মহাপ্রভুর শরীরে দৃশ্যমান।

পেখলুঁ - দেখলাম; গৌর-কিশোর - কিশোর-বয়স্ক গৌরাঙ্গ।
'অভিনব হেম ..... উজোর।'
অভিনব - নতুন; হেমকল্পতরু - সোনার কল্পতরু অর্থাৎ বাঞ্ছাপূরণকারী স্বর্ণবৃক্ষ।
সঞ্চরু - সঞ্চরণ করে। সুরধুনী - গঙ্গা (স্বর্গে প্রবাহিত গঙ্গা), উজোর - উজ্জ্বল।

গঙ্গার তীর উজ্জ্বল করে সোনার কল্পতরু সঞ্চরণ করছে। গৌরাঙ্গকে এখানে 'অভিনব হেমকল্পতরু' বলা হয়েছে। 'অভিনব' কারণ গৌরাঙ্গের এ রূপ অদৃষ্টপূর্ব; সোনার কল্পতরু - কারণ গৌরাঙ্গের গাত্রবর্ণ স্বর্ণতুল্য অর্থাৎ গৌরবর্ণ, আর 'কল্পতরু' এই জন্য যে, তিনি ভক্তবাঞ্ছাপূরণকারী। সেই হেম কল্পতরু সঞ্চরমান এই কারণে গৌরাঙ্গ সদা নাম-সংকীর্তনে ব্যস্ত এবং ভক্তের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য চঞ্চল। 'তরু' স্বাভাবিক অর্থে গতিহীন। কিন্তু

টিপ্পনী

গৌরাঙ্গরূপ 'হেমকল্পতরু' গতিবান। উজোর – উজ্জ্বল।

চঞ্চল – চরণ – কমলতলে ..... ভোর।

চঞ্চল – অস্থির; চরণ–কমল – পাদপদ্ম। চরণকে পদ্মফুলের সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভকত–ভ্রমরগণ – ভক্তরূপ ভ্রমরগণ। কমল অর্থাৎ পদ্মফুলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চৈতন্যদেবের চরণরূপ পদ্মে ভ্রমররূপী ভক্তগণের উপস্থিতিকে বোঝানো হয়েছে। ঝঙ্করু – ঝঙ্কার করছে। বহুভ্রমরের গুন্‌গুন্‌ ধ্বনি যেন ঝঙ্কারতুল্য। ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য পাদপদ্মে পতিত হয়ে মহাপ্রভুর গুণগান করছে – এই অর্থে 'ঝঙ্করু' পদের ব্যবহার।

'পরিমলে লুবধ ... অগোর।।'

পরিমল – সুগন্ধ, পরিমলে লুবধ – সুগন্ধলোভী, এখানে সুগন্ধে আমোদিত বা মোহিত। সুরাসুর – দেব এবং দৈত্য; ধাবই – ধাবমান হচ্ছে। অগোর – অজ্ঞান, চেতনাহীন। অহর্নিশি – দিবারাত্র।

মহাপ্রভুর চরণ কমলের সুগন্ধে লুব্ধ হয়ে দেবতা, দৈত্য অর্থাৎ সজ্জন, দুর্জন সকলেই দিবারাত্র তার চরণারবিন্দের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে চৈতন্যদেবের অলৌকিক আকর্ষণী শক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

'অবিরত ... মনোরথ পুর।'
অবিরত – সর্বদা, নিরবচ্ছিন্ন; প্রেম–রতন–ফল – প্রেমরত্নরূপফল। গৌরাঙ্গদেব যে কল্পতরু স্বরূপ, সেই তরুর ফল হল হেমরত্ন। ভক্তগণকে তিনি সেই ফল বিতরণ করছেন। অখিল–মনোরথ পুর – সমগ্র বিশ্বের যাঁরা শরণাগত তাঁদের মনোরথ অর্থাৎ মনের ইচ্ছা মহাপ্রভু পূরণ করছেন।

'তাকর চরণে ... রহু দূর।'

তাকর ঃ তাঁর (মহাপ্রভু বা শ্রীগৌরাঙ্গের); দীনহীন – সামান্য ব্যক্তি;

গোবিন্দ দাস রহু দূর – গোবিন্দ দাস দূরে পড়ে রইলেন। কবি গোবিন্দ দাস চৈতন্য – তিরোধানের পর আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের এই ভক্তমনোবাঞ্ছাপূরণকারী রূপ দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করেননি। সেজন্য তিনি নিজেকে 'দীনহীন' বলে উল্লেখ করেছেন।

সরলার্থ ঃ এখানে রাধাভাবে ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জলপূর্ণ মেঘের মত নয়নদ্বয় থেকে ভাবাবেশে অনবরত অশ্রু ঝরে পড়ছে এবং গৌরাঙ্গরূপী পুষ্পতরুতে আনন্দমুকুল উদ্ঘাত হচ্ছে। সেই মুকুল থেকে ক্ষরিত হচ্ছে ঘর্মরূপ বিন্দু বিন্দু মকরন্দ এবং বিকশিত হচ্ছে ভাবরূপ কদম্বফুল। কবি শ্রীকৃষ্ণরূপী কিশোর গৌরাঙ্গকে কি অপরূপ রূপে দর্শন করলেন। গৌরাঙ্গদেব স্বর্ণগঠিত কল্পতরু, তিনি (নবদ্বীপের) গঙ্গাতীর উজ্জ্বল করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর তাঁর চরণকমলে ভ্রমররূপী লুব্ধ ভক্তগণ তাঁর গুণগানে বাঙ্ময়। গৌরাঙ্গদেবের চরণপদ্মে সুর এবং অসুর পরিমল – লুব্ধ হয়ে দিবানিশি যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে অবস্থান করছেন আর শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রেমরত্নফল বিতরণ করে সমগ্র জগৎবাসীর অভিলাষ পূরণ করে চলেছেন। সেই করুণাময় ও প্রেম বিতরণকারী মহাপ্রভুর চরণ থেকে 'দীনহীন' কবি গোবিন্দ দাস দূরবর্তী থেকে গিয়েছেন।

তাৎপর্য বিশ্লেষণ ঃ

গোবিন্দ দাস রচিত এই পদটিকে সাধারণভাবে গৌরচন্দ্রিকা শ্রেণীর পদ হিসেবে ধরা হয়।

টিপ্পনী

শ্রীরাধার পূর্বরাগ পর্যায়ের অবস্থার সঙ্গে এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের আচরণ তুলিত হয়েছে। কৃষ্ণভাবাবেশে বিভোর অন্তরঙ্গে রাধাভাবান্বিত শ্রীগৌরাঙ্গের মেঘমালার ন্যায় জলপূর্ণ নয়ন থেকে প্রেম-বারি ঝরে পড়ছে, তাঁর সর্বদেহের যে আনন্দ-রোমাঞ্চ লক্ষণ, তাকে কবি তুলনা করেছেন পুলক-মুকুলের সঙ্গে। গৌরাঙ্গদেবের দেহে তখন প্রকাশমান স্বেদ, অশ্রু - পুলক ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব। জাগ্রত পুলক-মুকুল থেকে ক্ষরিত বিন্দু বিন্দু মকরন্দ সেই সাত্ত্বিক ভাবেরই প্রকাশক এবং এর ফলশ্রুতি ভাব-কদম্বের প্রস্ফুটন। 'কদম্ব' শব্দটি প্রতীকীও বটে। কারণ নিত্য বৃন্দাবনে কদম্ববৃক্ষতলেই মহাভাবময়ী শ্রীরাধার আবির্ভাব। এখানে 'কদম্ব' অনুষঙ্গে কবি হয়তো শ্রীরাধার প্রসঙ্গটিকেই ভক্তের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বৈষ্ণবভক্তের কাছে চৈতন্যদেব কৃষ্ণাবতার বলেই পরিগণিত। সেই কৃষ্ণরূপী গৌরাঙ্গদেবের রাধাভাববিমণ্ডিতা মূর্তি কবির কাছে স্বভাবতঃই বিস্ময়কর।

টিপ্পনী

পরের পঙ্‌ক্তিতেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজস্ব ঐশীরূপটিকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। সেখানে স্বর্ণকান্তি গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং স্বর্ণ-কল্পতরু। কল্পতরু যেমন প্রার্থীর যে কোন মনোবাসনা পূর্ণ করে, গৌরাঙ্গদেব তাবৎ ভক্তকুলের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। গৌরাঙ্গরূপ কল্পতরু বৃক্ষের মত স্থবির নয়, তিনি গতিবান, চলমান - তিনি নবদ্বীপের গঙ্গাতীর তাঁর দিব্যজ্যোতি-প্রভাবে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। গৌরাঙ্গের এই আলোকসামান্য 'প্রকাশ' ভক্ত - কবির ব্যাখ্যায় তাই 'অভিনব'। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম-ভক্তির দেবতা। তিনি অকাতরে প্রেম-ধন বিতরণ করেন। তাঁর চরণদ্বয় কমলতুল্য - পরিমল লোভে ভ্রমর যেমন পদ্মকোরকে সমাগত হয়ে 'মধু-মাতাল' হয়ে পড়ে, ভক্তগণও শ্রীগৌরাঙ্গের চরণকমল আশ্রয়লোভে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ছেন। কোন পার্থিব সম্পদ নয়, যশ-খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা নয়, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ নয়, বৈষ্ণবের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধনই তাঁদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। মহাপ্রভু তাঁর চরণে সমাগত পাপী-তাপী, সজ্জন-দুর্জন সকলকেই অকাতরে প্রেমধন বিতরণ করে চলেছেন।

প্রেমের দেবতা, কল্পতরুস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি কবি গোবিন্দ দাসের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অপরিসীম। মহাপ্রভুর 'রাধাভাববিমন্ডিতা প্রেম-কাঙালিনী' স্বরূপ এবং ভক্তমনোবাঞ্ছাপূরণকারী ঐশীরূপ - উভয়ের প্রতিই কবির অন্তরের টান আলোচ্য পদে ভক্তের নিষ্ঠায় ও কবি-ধর্মের সৌন্দর্যানুরাগে ভাবে, ভাষায়, ছন্দোস্পন্দনে ও অলঙ্কার প্রয়োগে সার্থকভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

তবে গোবিন্দ দাসের এই পদটিকে বিশুদ্ধ গৌরচন্দ্রিকার পদ বলে চিহ্নিত করা খুব একটা সমীচীন হবে না। পদটির প্রথম অংশে শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাভাব ও পূর্বরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হলেও 'অভিনব হেমকল্পতরু' গৌরাঙ্গের রূপনির্দেশ - মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের ভক্তবাঞ্ছাপূরণকারী ব্যক্তিস্বভাবের কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যক্তিগত জীবনে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির প্রতি আসক্তি, সর্বজনে প্রেমবিতরণের অদম্য প্রয়াস, 'চন্ডালোঽপিদ্বিজোশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' ইত্যাদি মতবাদের উদ্‌গাতা, জগাই - মাধাই উদ্ধার ইত্যাদির কথা বিবেচনা করলে পদের শেষাংশটি ব্যক্তিচৈতন্যের জীবন কেন্দ্রিক বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন বলেই মনে হয়। সেই অর্থে পদটির মধ্যে 'গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী'র লক্ষণ রয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করতে হয়।

(২)

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব।।

পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে[১] ফুলবনে চলই একান্ত।।
ছল ছল নয়ন-কমল - সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ।।
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কিছু না পাওল[২] থেহ।।

টিপ্পনী

পাঠান্তর - ১. ক্ষণে খেলে ২. পায়ল

শব্দার্থ ঃ আজু - আজ; হাম - আমি; পেখলুঁ - দেখলাম;

নবদ্বীপচন্দ্র ঃ নবদ্বীপের চন্দ্র; বয়ন - বদন; পুন পুন - বারবার; গতাগতি - যাতায়াত; করু - করেন; পন্থ - পথ;

কবি নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গকে দেখেছেন করতলে মুখাবয়ব ন্যস্ত করে ভাবুকচিত্তে বসে আছেন, আবার পরক্ষণেই তিনি ঘর-বার করছেন, ক্ষণে ক্ষণে একাকী ফুলবনে গমন করছেন।

নয়ন-কমল - নয়নরূপ পদ্ম; গৌরাঙ্গের সুন্দর আয়ত চক্ষুকে কমলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

সুবিলাস - রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গদেবের মনে পূর্বরাগজনিত রতিকামনার প্রকাশক সুবিলাস শব্দটি।

পরকাশ - প্রকাশ (স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষজনিত ধ্বনি পরিবর্তন)।

ছলছল .... পরকাশ - শ্রীগৌরচন্দ্রের ছলছল আঁখি সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশক। পূর্বরাগের নায়িকা শ্রীরাধার মত কৃষ্ণদর্শন বা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার একান্ত ইচ্ছায় অস্থিরচিত্ত বা ব্যগ্র হয়ে পড়ছেন এবং তাঁর চোখের দৃষ্টিতে পূর্বরাগের নায়িকার দশটি দশার মধ্যে 'লালসা'জনিত দীপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে - যাকে সুবিলাস বলা হয়েছে।এছাড়াও তাঁর মধ্যে 'অঙ্গজ', 'স্বভাবজ', 'অযত্নজ' ইত্যাদি নব নব ভাবের প্রকাশ ঘটছে।

'পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ / রাধামোহন কিছু না পাওল থেহ'

পুলক-মুকুল - পুলক বা আনন্দরূপ মুকুল; মুকুলবর - মুকুলশ্রেষ্ঠ; বর শব্দের একটি অর্থ শ্রেষ্ঠ বা উত্তম। ভরু - ভরে উঠছে; রাধামোহন - কবি রাধামোহন ঠাকুর; পাওল - পেল; থেহ - থৈ; শ্রীগৌরাঙ্গের সমস্ত শরীর পুলক-রোমাঞ্চে ভরে গেল। তাঁর এই যে ভাবান্তর, কবি তার থৈ বা উৎস খুঁজে পেলেন না।

সরলার্থ ঃ এটি একটি গৌরচন্দ্রিকার পদ। শ্রীরাধার পূর্বরাগের লক্ষণ এখানে পরিস্ফুটিত হয়েছে। কৃষ্ণ অনুরাগে শ্রীগৌরাঙ্গদেব করতলে মুখাবয়ব স্থাপন করে চিন্তামগ্ন হয়ে আছেন। পরক্ষণেই চঞ্চলচিত্ত হয়ে ঘর ও পথ বারবার যাতায়াত করছেন, আবার ক্ষণে ক্ষণে একাকী পুষ্পোদ্যানে গমন করছেন। 'কৃষ্ণরতি আশে' তাঁর দৃষ্টি ছলছল করে উঠছে এবং তাঁর দেহে ও মনে নানান নতুন ভাবের প্রকাশ ঘটছে। কৃষ্ণচিন্তায় গৌরাঙ্গের মনে কখনও জাগ্রত হচ্ছে অপার্থিব আনন্দ - সেই আনন্দ - বোমাঞ্চে তাঁর সর্বদেহ ভরে যাচ্ছে।কবি রাধামোহন গৌরচন্দ্রের এই নব নব ভাবান্তরের কোন স্থির কারণ বা থৈ খুঁজে পাচ্ছেন না।

তাৎপর্য বিশ্লেষণ ঃ

রাধামোহন ঠাকুর রচিত এই পদটি বিশুদ্ধ গৌরচন্দ্রিকার পদ। এখানে শ্রীরাধার মনে জাগ্রত পূর্বরাগের বিভিন্ন মানসিক ও কায়িক লক্ষণ ফুটে উঠেছে। পূর্বরাগজনিত লালসা, উদ্বেগ, বৈয়গ্র্য, জড়িমা ইত্যাদি দশা এখানে লক্ষিত হবে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন করতলে 'বদন' প্রতিস্থাপন করে বসে আছেন তখন তাঁর নিশ্চেষ্টতা বা জড়িমা লক্ষণ প্রকট। তাঁর উদ্বেগ, ব্যগ্রতা বা অস্থিরতার অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে ঘর ও পথ এবং পুষ্পোদ্যানে বারবার যাতায়াতের ঘটনায়। 'ছল ছল' নয়নের মধ্যে সাত্ত্বিকভাব এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণরতি জাগরণের মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রীতিভাব বা মধুর রসের উৎসার লক্ষ্য করা যায়।

টিপ্পনী

পূর্বরাগ পর্যায়ে চন্ডীদাসের একটি বিখ্যাত পদ –

ঘরের বাহিরে দন্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়।।
রাই কেন বা এমন হৈল। –ইত্যাদির সঙ্গে রাধামোহন ঠাকুর রচিত গৌরচন্দ্রিকা পদটির ভাবগত সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট। সুতরাং আসরে শ্রীরাধার পূর্বরাগ পর্যায়ের কীর্তনগান পরিবেশনের মুখবন্ধ বা ভূমিকা হিসেবে রাধামোহনের এই গৌরচন্দ্রিকা শ্রেণীর পদটি অত্যন্ত সুপ্রযোজ্য।

পূর্বরাগ
(১)

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল[১] গো
আকুল করিল[২] মোর প্রাণ।।
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন[৩] ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে[৪]।।
নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের[৫] পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া[৬] গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়।।
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চন্ডীদাসে কুল নাশে[৯]
আপনার যৌবন যাচায়।।

পাঠান্তর – ১. হানিলে ২. করিলে ৩. বদনে ৪. কেমনে পাসরিব তারে ৫. তনুর ৬. নয়ানে

দেখিয়ে ৭. চন্ডীদাস কহে কুলবতী কুল নাশে গো ৮. আপনারে

শব্দার্থ ঃ 'সই ... প্রাণ'

সখি - আমাকে কে শ্যাম-নাম শোনাল? সেই নাম কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে প্রাণকে আকুল করে তুলেছে।

পশিল - প্রবেশ করল।

টিপ্পনী

'না জানি ... সই তারে।।'

আমার শ্যাম-নামে কত মধু বা মিষ্টতা আছে। আমি শ্যাম-নাম মুখ থেকে পরিত্যাগ করতে পারি না। ঐ নাম জপ করতে করতে আমার দেহ-মন অবশ হয়ে এল, সখি! আমি জানি না, তাঁকে কি উপায়ে আমি পাব।

'নাম পরতাপে ... কৈছে রয়।।' পরতাপে - প্রতাপে, ঐছন - ঐরূপ, কৈছে - কেমন করে; নামোচ্চারণের প্রতাপে বা প্রভাবে যদি আমার এমন দশা হয়, তবে তাঁর অঙ্গের স্পর্শে আমার কি অবস্থা হবে। আর যেখানে তিনি বাস করেন সেখানে তাঁকে যদি চাক্ষুষ করি তবে আমার যুবতী-ধর্ম কিভাবে রক্ষা পাবে?

'পাসরিতে করি মনে ... যৌবন যাচায়।।'

পাসরিতে - ভুলতে; পাসরা - ভোলা; যাচায় - দান করে;

(শ্রীরাধা বলছেন), আমি তাঁকে ভুলবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ভুলতে পারা যাচ্ছে না - এর কি উপায় হবে জানি না। দ্বিজ চন্ডীদাস জানাচ্ছেন - শ্যাম কুলবতীর কুল নাশ করেন (অথবা, শ্যামের অমোঘ আকর্ষণে কুলবতী রমণী নিজেই নিজের কুল নাশ করে) এবং যুবতী উপযাচক হয়ে যৌবন দান করে।

তাৎপর্য বিশ্লেষণ ঃ

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে পূর্বরাগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যে কথা বলেছেন, তার বাংলা অনুবাদে বলা যায় - "যে রতি মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া নায়ক-নায়িকা উভয়ের হৃদয়কে উন্মীলিত করে, তাহারই নাম পূর্বরাগ।" এই পূর্বরাগ নায়িকা শ্রীরাধা ও নায়ক শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যেই জাগ্রত হতে পারে। 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' - চন্ডীদাসের এই পূর্বরাগ পর্যায়ের পদটিতে কবি অত্যন্ত মরমী হৃদয়ে শ্রীরাধার মনে তাঁর ঈপ্সিত প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণহেতু যে প্রেমভাব তার এক পরিচ্ছন্ন ও অন্তর্লোকসঞ্চারী চিত্র অঙ্কন করেছেন। এখানে শুধু শ্রীকৃষ্ণ- নামশ্রবণজনিত কারণে রাধার মনে জেগে উঠেছে দুরপনেয় কৃষ্ণপ্রীতি। কৃষ্ণ নাম এমনই অন্তর্ভেদী যে, সেই নাম তাঁর বাহ্য শ্রুতিপথ দিয়ে অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছে রাধার চৈতন্যলোককে আকুলিত করে তুলেছে। রাধার কাছে এই নামপ্রীতি এতই প্রবল আকার ধারণ করেছে যে, নামই তাঁর কাছে পূর্ণ দয়িতমূর্তি ধারণ করেছে। রাধা নিরূপণ করতে পারেন না শ্যাম নামে নিহিত মাধুর্যের গভীরতা — শ্যাম নাম যেন তাঁর অস্তিত্বেরই পরিচায়ক, তাঁর বাগ্‌যন্ত্র ঐ নাম উচ্চারণেই সদা বাঙ্ময়। শ্যামনামের এমনি অমোঘ শক্তি, এমন ঐন্দ্রজালিক সম্মোহন যে, ঐ নাম জপ করতে করতেই তার সর্ব অঙ্গ

বিবশ হয়ে যায়। নাম শ্রবণ ও উচ্চারণেই যদি প্রেম-মাহাত্ম্যের এত গভীর প্রকাশ, তবে তাঁর স্পর্শে রাধার প্রেম-উপলব্ধি কোন্ পর্যায়ে উন্মীত হবে, বিহ্বলা শ্রীরাধা তা অনুমানও করতে পারেন না।

চন্ডীদাস অন্তর্লোকের কবি; স্থূল ভাবাবেগ, অলংকার সমাসের বাহুল্য, ইন্দ্রিয়চেতনার রসাবেশ, মিলন-রভসের উতরোল উল্লাস তাঁর রচনায় বিরলতম বিষয়। নিরাভরণ কিন্তু অন্তর্গভীর ভাষা বিন্যাসে তাঁর কবিতার আত্মা সমৃদ্ধ হয় অনির্দেশ্য অর্থব্যঞ্জনায়। কিন্তু সেই চন্ডীদাসও কখনো কখনো ইন্দ্রিয়তন্ত্রের কথা বলেন, দেহস্পর্শের আবেশ রচনা করেন, কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গী, ভাষার যাদুকরীশক্তি, কখনোই পাঠককে রিপু তাড়নায় উদ্ব্যস্ত করে না। আলোচ্য পদটিতে 'অঙ্গের পরশে কিবা হয়' কিংবা 'যুবতী ধর্ম কৈছে রয়' অথবা 'আপনার যৌবন যাচায়' ইত্যাদির উল্লেখ রাধার শ্যাম-অনুরাগের প্রাবল্যকে বোঝাবার জন্যই করা হয়েছে, কোন 'বিলাসকলাকুতূহল'বশতঃ নয়।

টিপ্পনী

(২)

ভূপালী[১]

হাথক[২] দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক[৩] সরবস গেহক সার।।
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে[৪] জানি।।
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয়[৫]।।

পাঠান্তর - ১. ধানশ্রী ২. হাথকি, হাতক ৩. দেহকি ৪. হম তুহুঁ ৫. পঙ্‌ক্তিটি লুপ্ত

শব্দার্থ ঃ হাথক - হাতের; দরপণ - দর্পণ, আয়না; মাথক ফুল - মাথার ফুল; নয়নক অঞ্জন - চোখের কাজল; মুখক তাম্বুল - মুখের পান; হৃদয়ক মৃগমদ - হৃদয়ে লিপ্ত কস্তুরী; গীমকহার - গলার হার; দেহক সরবস - দেহের সর্বস্ব; গেহক সার - গৃহের সার; পাখীক পাখ - পাখীর পাখা; মীনক পানি - মাছের জল; জীবক জীবন - জীবের জীবন; হাম - আমি; ঐছে জানি - এরূপই জানি; তুহুঁ কৈছে - তুমি কেমন; মোয় - আমাকে; দুহুঁ - দুজন; দোহাঁ - দু'জন।

সরল অর্থ ঃ রাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন - তুমি আমার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বুল বা পান। তুমি হৃদয়ে লিপ্ত কস্তুরী, গলার হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার। (তুমি) পাখীর পাখা, মাছের (কাছে) জল, জীবের জীবন - আমি এরকমই জানি। তুমি কেমন, মাধব, আমাকে বল। বিদ্যাপতি বলেন - তোমরা দুজনেই দুজনের জন্য।

তাৎপর্য আলোচনা ঃ বিদ্যাপতির এই পদটি অনুরাগ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ অনুসারে - "যতবার প্রিয়কে দেখে, ততবার যেন মনে হয় নতুন, যতবার অনুভব করে, ততবারই মনে জাগে অনাস্বাদিত অনুভূতি। এই অবস্থার নাম অনুরাগ। নায়কের মাধুর্য বা মধুরিমা মুহূর্মুহূ

অনুভূত হলেও সেই মধুরিমাকে আবার অনুভূত করবার অতিশয় তৃষ্ণাকেও অনুরাগ বলে।"

আবার পূর্বরাগ ও অনুরাগের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে নন্দকিশোর দাস লিখেছেন –

সঙ্গ নহে রূপ জন্মে কহি পূর্বরাগ।
সঙ্গ পরে রূপ যেই সেই অনুরাগ।

টিপ্পনী

অর্থাৎ মিলনপূর্ব রাগ বা প্রেম হল পূর্বরাগ, আর মিলন – পরবর্তী প্রেম হল অনুরাগ। বিদ্যাপতির আলোচ্য পদটিতে রাধা কৃষ্ণের প্রতি প্রেমে মগ্ন। কৃষ্ণ যে তাঁর অস্তিত্বেরই পরিপূরক একথা বলতে গিয়ে রাধা কৃষ্ণকে হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের কাজল ও মুখের তাম্বুল বলে বর্ণনা করেছেন। দর্পণে যেমন নিজ প্রতিরূপ প্রতিবিম্বিত হয় এবং নিজের অঙ্গশোভা তুলে ধরে, রাধা মনে করেছেন কৃষ্ণ তাঁর জীবনে সেই দর্পণ, যে দর্পণে রাধার রূপসৌন্দর্য প্রতিবিম্বিত হয়ে ধন্য হবে। এছাড়াও কৃষ্ণ তাঁর কাছে রূপবর্ধক ভূষণস্বরূপ – মাথার ফুল, গলার হার ইত্যাদি।

কিন্তু এরপরই কৃষ্ণের বহিরঙ্গ মূল্যকে গৌণ করে কবি বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণকে রাধার জীবনের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার জীবনের সর্বস্ব হয়ে উঠেছেন, কৃষ্ণ ব্যতীত তাঁর অস্তিত্বই বিপন্ন বলে কবি মনে করেছেন। কৃষ্ণসর্বস্ব রাধার জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন, পাখীর যেমন পাখা, মাছের কাছে যেমন জল, এবং জীবের প্রাণশক্তি যেমন তার বেঁচে থাকার লক্ষণ, কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তেমনি অবিনাসম্পর্কে আবদ্ধ। বিদ্যাপতি মর্ত্যরসের কবি – তিনি লৌকিক নায়ক–নায়িকার দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে প্রত্যক্ষ করেছেন — তাই রাধা বিদ্যাপতির কাছে মহাভাবঠাকুরাণী নয়, মর্ত্যের প্রেমলুব্ধ এক চিরন্তন নারী, যাঁর মধ্যে দয়িতের প্রতি নির্ভরতা আছে, তাঁর বিরাটত্ব ও যোগ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা আছে – সেই নির্ভরতা, শ্রদ্ধা ও প্রেম থেকেই বিস্ময়াবিষ্ট রাধা প্রশ্ন করেন – 'মাধব, তুমি কে?' ভণিতায় বিদ্যাপতি ব্যাকুলিত রাধার প্রশ্নের উত্তর দেন এবং আশ্বস্ত করে বলেন যে তাঁরা 'দুহুঁ দোহাঁ হোয়' – অর্থাৎ তাঁরা যেন 'Made for each other.'

অভিসার

(১)

কেদার[১]

কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর[২] চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি–বারি ঢারি করি পীছল[৩]
চলতহি অঙ্গুলি চাপি[৪]।।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।।
কর–যুগে[৫] নয়ন মুদি চলু ভামিনী[৬]
তিমির পয়ানক[৭] আশে।
কর–কঙ্কণ–পণ[৮] ফণিমুখ–বন্ধন

শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে।।

গুরুজন-বচন বধির সম মানই[৯]

আন শুনই কহ[১০] আন।

পরিজন বচনে[১১] মুগধী সম হাসই[১২]

গোবিন্দদাস পরমাণ।।

পাঠান্তর - ১. শ্রীরাগ ২. নূপুর ৩. পীছল ৪. ঝাঁপি ৫. করতলে ৬. ভামিনি ৭. পয়ানগতি ৮. পণে ৯. ভাষয় ১০. শুনতে কহে, শুনত কহ ১১. বচন ১২. পরিজন-হাসে মুগধি জনু হাসয়ে (সমগ্র পঙ্‌ক্তি)।

টিপ্পনী

শব্দার্থ ঃ কন্টক গাড়ি ... ঝাঁপি।

কন্টক গাড়ি - কাঁটা প্রোথিত করে বা পুঁতে;

কমলসম পদতল - পদ্মফুলের মত কোমল পদতল;

মঞ্জীর - নূপুর; চীরহি - ছিন্ন বস্ত্রখন্ড, ঝাঁপি - বেঁধে;

'গাগরি ... চাপি।।'

গাগরি-বারি - কলসীর জল; ঢারি - ঢেলে

অঙ্গুলি চাপি - আঙুল চেপে চেপে;

'মাধব তুয়া ... যামিনী জাগি।।'

তুয়া - তোমার; অভিসারক - অভিসারের জন্য; দূতর পন্থ - দূরতর পথ, অথবা দুস্তর পথ; মন্দিরে - গৃহে;

'কর যুগে ..... গুরু - পাশে।।'

করযুগে - দু'হাতে; মুদি - বন্ধ করে; ভামিনী - রমনী; তিমির-পয়ানক আশে - অন্ধকারে পথচলার আশায়।

সরলার্থ ঃ এটি বর্ষাভিসারের প্রস্তুতির পদ। রাধা বর্ষার দুর্গম পথে অন্ধকার রাত্রিতে পথ চলায় অনভ্যস্থ। সেজন্যই তাঁর নিজগৃহে অনুশীলন।

ঘরের আঙিনায় কন্টক প্রোথিত করে কলসীভর্তি জল ঢেলে রাধা পায়ের নূপুর ছিন্ন বস্ত্রখন্ড দ্বারা আবৃত করেছেন এবং আঙুল চেপে চেপে পিছল আঙিনায় পথ চলা অভ্যাস করছেন। হে মাধব, তোমার উদ্দেশে অভিসারের জন্য রাধা গৃহে রাত্রি জেগে দুস্তর পথ অতিক্রমের সাধনা করছেন। রাধা দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে অন্ধকারে পথ-চলার অভ্যাসে রত। পথে সাপের ভয় সেজন্য ভুজগ-গুরু অর্থাৎ সাপের ওঝার কাছে 'ফণিমুখবন্ধন' বিদ্যা শিক্ষার জন্য নিজের হাতের কঙ্কণ পণ হিসাবে প্রদান করেছেন। গুরুজনের কথায় তিনি বধিরের মত আচরণ করেন; এক শুনতে আর এক শোনেন। আর পরিজনদের কথায় মুগ্ধা রমণীর মত তিনি শুধু হাসেন - এর প্রমাণ হিসেবে রয়েছেন গোবিন্দদাস।

তাৎপর্য আলোচনা ঃ

আলোচ্য পদটি অভিসার পর্যায়ের। অভিসার পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস এটির রচয়িতা। তবে পদটি হল অভিসার প্রস্তুতির পদ। পরিবেশ বর্ণনায় এখানে বর্ষাভিসারের কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অভিসার-যাত্রার পথের দুর্গমতা ও সেই পথ অতিক্রমণের কৃচ্ছ্রসাধন এখানে নেই। রাধার যাবতীয় কৃচ্ছ্রসাধন এখানে ঘরের আঙিনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

টিপ্পনী

শ্রীরাধা কুলবধূ। কুলবধূ শ্রীরাধার পরপুরুষগমন সমাজ বিগর্হিত ও ন্যায়-নীতি অননুমোদিত বিষয়। কিন্তু পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর দুনির্বার আকর্ষণকে রাধা দমন করতে পারেন না। সমাজ, গুরুজন, পরিজন, নারীধর্ম সব কিছু প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তিনি এক অসাধ্য সাধনে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। বর্ষার ঘন অন্ধকার রাত্রিতে প্রিয় মিলনের যাত্রাকে সফল করার জন্য সকলের অজ্ঞাতে তিনি কঠিন অনুশীলন ব্রতে ব্রতিনী হয়েছেন। আঙিনায় কাঁটা পুঁতে, কলসী থেকে জল ঢেলে আঙিনা পিছল করে রাধা বস্ত্রখন্ড দ্বারা নূপুরকে আবৃত করেছেন - পাছে নূপুরধ্বনিতে অভিসারের গোপনীয়তা বিনষ্ট হয়। রাধা নিজ করযুগ দ্বারা চোখ ঢেকেছেন - উদ্দেশ্য, অন্ধকার রাত্রে দৃষ্টি যখন অন্ধ হয়ে যাবে, তখন অন্ধকার পথেও যাতে পথ চলা অব্যাহত থাকে। পিছল আঙিনায় এইভাবে তিনি আঙুল চেপে চেপে চলতে থাকেন। পথ দুস্তর, দূরতর ও বটে - সেই দুস্তর পথ অতিক্রমণের জন্যই রাধার রাত্রিজাগরণ ও পথ - চলার অনুশীলন। বর্ষার রাত্রে পথে সর্পভয় স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্যই রাধা নিজের কঙ্কণ পণ হিসেবে সর্পগুরুকে দান করে 'ফণিমুখবন্ধন' শিক্ষা করেন। প্রিয় মিলনের কুলবধূ রাধার এই কঠোর অধ্যবসায় ও কৃচ্ছ্রসাধন রাধাকে শুধু অভিসারিকা নয়, সনিষ্ঠ তপশ্চর্যাপরায়ণা সাধিকাতেও রূপান্তরিত করেছে। প্রকৃত সাধক বা সাধিকার লক্ষ্য একমুখী। অভিসারের যে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তা হল মায়াময় জগতের যাবতীয় বাধা বা প্রতিকূলতা, সমস্ত দুর্গমতা, সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট সব কিছুকে তুচ্ছ করে পরম প্রিয়ের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। সুতরাং লৌকিক জগতের শাসন-অনুশাসন, সংস্কার, ভয়-ভীতি, লজ্জা-সংকোচ সব কিছু বিসর্জন দিয়ে পরমপুরুষ বা প্রেমিক দেবতার প্রতি গভীর প্রেমে ভাবাবিষ্ট হতে হবে - জাগতিক বন্ধন তখন শূন্যপরিমাণ। রাধাও পরম ভাবাবিষ্ট হয়ে আলোচ্যপদে গুরুজন - পরিজন বচনে উদাসীন, বাহ্যবিচারজ্ঞান তাঁর লুপ্ত।

জয়জয়ন্তী

(২)

গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই[১]।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই।।
সজনি, আজু দুরদিন ভেল[২]।
হামারি কান্ত[৩] নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল।।
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।

শ্যাম নাগর[৪] একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর।।
সঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরই ঝাঁপ[৫]।।
তুরিত চল অব কিয়ে বিচারহ[৬]
জীবন মঝু আগুসার।।
রায়শেখর[৭] – বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার।।

টিপ্পনী

পাঠান্তর – ১. ঝলকই ২. 'সজনি ... ঘন ঘোর' – এই পাঠটি সব পুঁথিতে নেই। এর পরিবর্তে কোথাও 'সজনি আজু দুরদিন ভেল' পঙ্‌ক্তিটি পাওয়া যায়। ৩. কান্ত হামারি ৪. মোহন ৫. ঝাঁপু ৬. বিচারব ৭. কবিশেখর।

শব্দার্থ ঃ অব – এখন; মেহ – মেঘ, দামিনী – বিদ্যুৎ, চমকই – চমকাচ্ছে; কুলিশ-পাতন – বজ্রপাত; শবদ – শব্দ; খরতর – ভীষণবেগে; বলগই – বল প্রদর্শন করছে; সজনি – সখী; দুরুদিন – দুর্দিন; ভেল – হল; হামারি – আমার; কান্ত – প্রিয়, প্রভু; আগুসরি – অগ্রসর হয়েছেন; সঙ্কেত-কুঞ্জহি – সংকেত কুঞ্জে; বরিখে – বর্ষণ করছে; নাগর – প্রিয়; একলি – একলা; কৈছনে – কেমন করে; পন্থ – পথ; হেরই – দেখছেন; সঙরি – স্মরণ করে; মঝু – আমার; অথির – অস্থির; তুরিত – তাড়াতাড়ি; তিমিরহি – অন্ধকার; বিঘিনি – বিঘ্ন; বিথার – বিস্তার;

সরলার্থ ঃ

রাধা অভিসারে চলেছেন। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। সঘনে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝন্‌ঝন্ শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে এবং তীব্রগতিতে বাতাস বইছে। হে সখি! আজ আমার দুর্দিন। আমার প্রিয় (কান্ত) সঙ্কেত-কুঞ্জের পথে এগিয়ে গিয়েছেন। মেঘ তরলিত হয়ে অর্থাৎ বৃষ্টি হয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে, আর মেঘ ঘন ঘন গর্জন করছে। নাগর শ্যাম আমার জন্য একাকী কেমন করে পথ-চেয়ে থাকবেন। একথা মনে করে আমার শরীর যেন অবশ হয়ে এল, থর থর করে কাঁপতে লাগল। আমার গুরুজনদের ভীষণ দৃষ্টি এখন ঘন তমসায় আচ্ছন্ন। এখন শীঘ্র চল – কোন কিছুর বিচারে এখন লাভ নেই, কারণ আমার জীবনস্বরূপ যিনি তিনি আগেই চলে গিয়েছেন। রায় শেখর (রাধাকে) বলছেন, তুমি অভিসার কর – বিঘ্নের যাবতীয় বিস্তার তোমার কি করবে?

তাৎপর্য ঃ

এটি একটি ভীষণ দুর্যোগতাড়িত বর্ষাভিসারের পদ। ঘনঘোর বর্ষণ, প্রবল ঝটিকা, ঘন ঘন বজ্রপতন এ সমস্ত মিলে মিশে রাধার দুর্দিনকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। রাধা অনুভব করেছেন তাঁর এই অভিসার প্রকৃতির অজস্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। কবি রায়শেখর পদটির সূচনা – অংশেই প্রকৃতির সেই রুদ্ররূপ অঙ্কনে যথেষ্ট যত্নবান হয়েছেন।

টিপ্পনী

অভিসারিকা রাধা তাঁর প্রিয়তম কৃষ্ণকে পূর্বনির্দিষ্ট সংকেত-কুঞ্জে আহ্বান করেছেন, শুধু তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণ অনুগত প্রেমিকের মত রাধার সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতোপূর্বেই সংকেত-কুঞ্জে অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু রাধা নিজেই এখন পথ অতিক্রম করতে পারেন নি। এজন্য রাধা কৃষ্ণের কথা ভেবে সঙ্কুচিত-চিত্ত হচ্ছেন - কৃষ্ণের একাকীত্ব নিয়েও ভাবনা করছেন। রাধার এই মনোভাবনার দ্বারা যথার্থ প্রেমিকার শুদ্ধ ভালোবাসার স্বরূপটি ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। শুধু মনোভাবনা নয় - শারীরিক প্রতিক্রিয়ার দিকটিও এখানে বিবেচ্য - কৃষ্ণচিন্তায় তাঁর সারা শরীর অবশ হয়ে এসেছে, থর থর করে কাঁপছে সর্বদেহ। পদটির মধ্যে রাধার কৃষ্ণ-অনুরাগ সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে যেখানে রাধা নিজেকেই ত্বরিতে পথ-অতিক্রমণের জন্য উৎসাহিত করেছেন, বলেছেন, যে কৃষ্ণ তাঁর জীবন-স্বরূপ, তিনিই এগিয়ে গিয়েছেন - এখন অন্য কিছু বিচারের অবকাশ তাঁর নেই। ভণিতায় রায়শেখর রাধাকে শুনিয়েছেন মাভৈঃ বাণী। -

পদটির মধ্যে অভিসারিকার লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি অভিসারের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বক্তব্যের মধ্যে অন্তর্লীন।

(৩)

।। কামোদ ।।

মন্দিরে বাহির[১] কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তহিঁ অতি দূরতর[২] বাদর দোল[৩]।
বারি কি বারই[৪] নীল নিচোল।।
সুন্দরি[৫] কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী-পার।।
ঘন ঘন ঝনঝন বজর - নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম[৬] জরি যাত।।
দশ দিশ দামিনী দহন[৭] বিথার।
হেরইতে উচকই[৮] লোচন তার।।
ইথে যদি সুন্দরি[৯] তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।।
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে[১০] নিবার।।

পাঠান্তর - ১. বাহিরে ২. দরদর ৩. সমগ্র পঙ্‌ক্তি - তাহে অতি বাদর দরদর বোল; তাহে অতি বাদর দুরদুর বোল ৪. বারি কি বারবি; বারিক বারণ ৫. এ সখি ৬. মরমে ৭. দহই ৮. চমকই ৯. ইথে জনি অব তুহুঁ ১০. যতন।

মন্দির - গৃহ; কপাট - দরজা; চলইতে - চলতে গেলে; শঙ্কিল - শঙ্কাযুক্ত; পঙ্কিল - পঙ্কময়; বাট - পথ; তঁহি - তার উপরে; দূরতর - প্রবল; বাদর - বৃষ্টি; বারই - নিবারণ করে; নীল নিচোল - নীল শাড়ী; কৈছে - কেমন করে; মানস সুরধুনী - মানস-গঙ্গা; বজর নিপাত - বজ্রপাত বা বজ্রপতন; শ্রবণ - কান; জরি যাত - জ্বলে যায়; দিশ - দিক, দামিনী - বিদ্যুৎ; দহন - বিথার-দহন বিস্তার লাভ করছে; হেরইতে - দেখতে; উচকই - চমকে ওঠে; ইথে - এই

সময়ে এখন; তেজবি গেহ – গৃহত্যাগ করবে; উপেখবি – উপেক্ষা করবে; ছুটল – নিক্ষিপ্ত; বাণ – শর; নিবার – নিবারণ করা। (বাণ একবার নিক্ষিপ্ত হলে যত্ন বা প্রয়াস করলেও নিবারণ করা যায় না।)

সরলার্থ ঃ রাধার শুভাকাঙ্ক্ষিনী এক সখীর বক্তব্য এই যে –

মন্দির অর্থাৎ গৃহের বাইরে কঠিন কপাট, পঙ্কিল রাস্তা চলতে শঙ্কা হয়। তার উপর প্রবল বর্ষণের দোলা – নীল শাড়িতে কি সেই বারিধারা আটকাবে? সুন্দরি! তুমি কেমন করে অভিসার করবে? শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন মানস-গঙ্গার ওপারে। ঘন ঘন ঝন্‌ঝন্ শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে, সেই শব্দ কানে শুনে মর্ম পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছে। দশদিক বিস্তার করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তা দেখে দৃষ্টি চমকে উঠছে। এ সময় 'সুন্দরি' যদি গৃহ ত্যাগ করে তবে প্রেমের জন্য কি দেহের কষ্ট বা গুরুত্বকেও উপেক্ষা করবে –এটা সখীর প্রশ্ন। গোবিন্দদাস বলছেন – এতে এখন আর বিচার করার কি আছে; নিক্ষিপ্ত বাণ তো আর যত্ন বা প্রয়াস করে নিবারণ করা যায় না। (রাধা যখন অভিসারে যাওয়া মনস্থই করেছেন, তখন তাঁকে নিবারণ করা সম্ভব নয়)।

তাৎপর্য ঃ এটি বর্ষাভিসারে গমনোদ্যতা রাধাকে নিবারণ করার জন্য রাধার হিতাকাঙ্ক্ষিণী এক সখী ঘনঘোর বর্ষা, দুরন্ত বারিপাত, ত্রাসসৃষ্টিকারী বিদ্যুৎঝলক, কর্ণ ও মর্ম বিদারী বজ্রপাত ও সর্বোপরি শঙ্কাজাগানো দুর্গম পঙ্কিল পথের কথা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছে। রাধার 'নীল নিচোল' সেই বারিপাতকে রোধ করতে পারবে না, তাছাড়া প্রাণপ্রিয় যে হরি তিনি থাকেন বহুদূরে – মানস-গঙ্গার অপর পারে – দুর্যোগের ভয়াবহ ভ্রূকুটি জয় করে সেখানে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। এই সময় প্রেমের জন্য দৈহিক কষ্ট এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত উপেক্ষা করেই রাধাকে অভিসারে যেতে হবে – সখী রাধার কানে এই চরমবার্তা পৌঁছে দিয়ে অভিসার থেকে নিবৃত্ত করার জন্য যেন শেষ চেষ্টা করেছে। কবি গোবিন্দদাস যেন দক্ষ মনস্তাত্ত্বিকের মত রাধার মনের লিখন পাঠ করতে সক্ষম হয়েছেন; তাঁর মনে হয়েছে ধনু থেকে বাণ বা শর একবার নিক্ষিপ্ত হলে শত প্রয়াসেও যেমন তাকে ফেরানো বা নিবারণ করা যায় না, তেমনি রাধা অভিসারে যাওয়ার জন্য একবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, মনে মনে ঘরের বাইরে পা রেখেছেন, তখন তাঁকে নিবারণ করা দুসাধ্য।

পদটির ভাব ও ব্যঞ্জনা কবিত্বপূর্ণ। ছন্দোমাধুর্য অপূর্ব। 'বারি কি বারই নীল-নিচোল' 'ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির মধ্যে চিরকালীন কবিত্বের বাণী ধ্বনিত হয়েছে। সখী চরিত্রটি অত্যন্ত আন্তরিক; রাধার প্রতি তার ভালোবাসা নিঃস্বার্থ।

মাথুর

জয়জয়ন্তি[১]

(১)

এ[২] সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা[৩] বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ঝম্পি[৪] ঘন গর - জন্তি সন্ততি
ভুবন[৫] ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া[৬]।।
কুলিশ শত[৭] শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত[৮] ছাতিয়া।।
তিমির দিগ[৯]ভরি ঘোর[১০] যামিনী
অথির[১১] বিজুরিক পাঁতিয়া[১২]।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া[১৩]।।

পাঠান্তর - ১. মল্লার ২. হে ৩. ভর ৪. ঝঞ্ঝা ৫. গগনে ৬. বরসন্তিয়া ৭. কত ৮. যাওত ৯. ভরি ১০. জোর ১১. নথির ১২. পঙ্‌ক্তিটির স্থলে দরকে দামিনী পাতিয়া ১৩. সমগ্র চরণটি - ভণয়ে শেখর, কৈছে নিরবহ / সো হরি বাণু ইহ রাতিয়া।

শব্দার্থ ঃ হামারি - আমার; ওর - সীমা; বাদর - বাদল, বৃষ্টি; মাহ - মাস; ভাদর - ভাদ্র; মন্দির - গৃহ; ঝম্পি - ঝেঁপে, ঘন - মেঘ; গরজন্তি - গর্জন করছে; সন্ততি - মর্বদা, অনবরত, সতত; বরিখন্তিয়া - বর্ষণ করছে; পাহুন - প্রবাসী; হন্তিয়া - হানছে; কুলিশ - বজ্র, মোদিত - আনন্দ; দাদুরী - ব্যাঙ, ডাহুকী - পক্ষী বিশেষ; ছাতিয়া - বুক; তিমির - অন্ধকার; দিগভরি - সমস্তদিক; অযির - অস্থির, চঞ্চল; বিজুরিক - বিজলির, বিদ্যুতের; পাঁতিয়া - পঙ্‌ক্তি; গোঙায়বি - কাটাবে; সরলার্থ ঃ হে সখি, আমার দুঃখ সীমাহীন। ভাদ্রমাসের এই ভরা বাদলে আমার গৃহ শূন্য। ভুবনব্যাপী ঝেঁপে বৃষ্টি হচ্ছে, কান্ত রয়েছে প্রবাসে, কামদেব তীক্ষ্ণ শর হেনে চলেছেন। শত শত বজ্রপাত হচ্ছে, ময়ূর আনন্দে নৃত্য করছে, দাদুরী আনন্দোন্মত্ত, ডাহুকী ডেকে চলেছে, আর আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। চতুর্দিক ব্যাপ্ত অন্ধকার রজনীর বুকে চঞ্চল বিদ্যুৎ-রেখা অঙ্কিত হচ্ছে। বিদ্যাপতি (রাধাকে) বলছেন - হরি বিনা দিন-রাত কেমন করে কাটাবে?

তাৎপর্য ঃ 'রসকল্পবল্লী', 'পদরসসার', এবং 'পদরত্নাকর' গ্রন্থে আলোচ্যপদটি রায়শেখরের ভণিতায় পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু রচনাশৈলী, কাব্যমন্ডনকলা ও ভাবধর্মের দিক থেকে পদটি যে বিদ্যাপতির রচিত - অনেকেই সেই মত ব্যক্ত করেছেন।

বিদ্যাপতি প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি। তিনি সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে উল্লিখিত নায়িকার পর্যায় বিভাগ অনুযায়ী 'বিরহ' পর্যায়ের নায়িকার মনোভাবটি এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব - অলংকার শাস্ত্রে 'বিরহ' কে মাথুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৃন্দাবনলীলা সাঙ্গ করে শ্রীকৃষ্ণ কংস-বধের কারণে মথুরা গমন করেন, এবং তিনি আর কখনোই মথুরায় প্রত্যাগমন করেন নি। কৃষ্ণ-অদর্শনে রাধার মনের যে অতলান্ত বিরহ ও দুঃখবোধ, মথুরা গমনের সাদৃশ্যে সেই বিরহকে 'মাথুর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত এই পদটির মধ্যে ভাদ্রমাসের ঘনঘোর বরিষণের মাঝে রাধা

নিজের দুঃখভোগকে সীমাহীন বলে বর্ণনা করেছেন। বাদলের অবিশ্রান্ত ধারাপাত রাধার মনে ও গৃহে সৃষ্টি করেছে অপার শূন্যতা। এই শূন্যতার কারণ তাঁর পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ প্রবাসে রয়েছেন - স্থানিক দূরত্ব এখানে রাধার মনে বিরহের শক্তিশেল হেনেছে। বিরহ তাঁর আরও তীব্রতর হয়েছে প্রেমের দেবতা কামদেব তাঁর হৃদয়ে অনুক্ষণ কামনার তীক্ষ্ণশর নিক্ষেপ করার কারণে। রাধা লক্ষ্য করছেন প্রকৃতির বুকে ভরা বর্ষার অনুষঙ্গে প্রেম-মিলনের আদর্শ পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। মত্ত দাদুরীর উল্লাস, মিলন-পিয়াসী ডাহুকীর আহ্বান, আনন্দোচ্ছ্বসিত ময়ূরের নৃত্য - সব কিছুর মধ্যে রয়েছে মিলনের সম্ভাব্য প্রয়াস - কিন্তু কান্ত বিনা রাধা অসহায়, তাঁদের প্রেমমিলনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত; এই দুঃখে তাঁর বুক যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার রাত্রির বুকে চঞ্চল বিদ্যুৎরেখা যেন সব কিছুকে মুহূর্তের জন্য আলোকিত করে পরক্ষণেই দ্বিগুণ আঁধারে রাধার জীবনকে মসীলিপ্ত করে। কবি নিজেও উদ্বিগ্নচিত্তে প্রশ্ন করেন 'হরি বিনে' শ্রীমতী কেমন করে দিবস-রজনী অতিবাহিত করবেন।

টিপ্পনী

বিদ্যাপতির এই পদটি অপূর্ব কাব্যসুষমামণ্ডিত। ব্রজবুলির শ্রুতিসুখকর ধ্বনিস্পন্দনে, ছন্দের দোলায়, প্রকৃতির নিখুঁত রূপচিত্রণে, ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্রকল্প নির্মাণে এবং প্রকাশশৈলী ও কবিত্বের ঐশ্বর্যে রাধার বিরহবোধ রাজকীয় মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে হয় পদটির মধ্যে বিরহ-উপকরণের যে বৈভব আছে, সেই পরিমাণে দুঃখবোধের সূক্ষ্ম অনুভূতি নেই। রাধার বিরহ এখানে তাঁর 'পাঁজর-ভাঙা' যন্ত্রণার তীব্রতাকে যতখানি না প্রকাশ করেছে, তার চেয়েও বেশী প্রকাশ করেছে রাধার বিরহ-দশার গৌরবকে। রাধা যেন এখানে অতিসচেতনভাবে তাঁর বিরহ-ব্যথার প্রকাশক উপাদানগুলিকে নির্বাচন করেছেন এবং ততোধিক সচেতনতার সেগুলির কাব্যিক মূর্তি নির্মাণ করেছেন। কৃতী অধ্যাপক ও যশস্বী সমালোচক শঙ্করী- প্রসাদ বসুও এই পদটির মধ্যে শ্রীরাধার বিরহ-গৌরবকেই লক্ষ্য করেছিলেন।

(২)

যাঁহা পহু অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।।
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ।।
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল-চন্দ।।
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ।।
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত।।
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর - শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম।।
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি।
সো মরকত - তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি।।

শব্দার্থঃ যাঁহা - যেখানে; অরুণ-চরণে - রক্তিম পদে; মঝু - আমার; গাত -গাত্র, দেহ; দরপণে

- দর্পণে, আয়নায়; পহুঁ - প্রভু; তথি মাহ - তার মাঝে; নিরদন্দ - নির্দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বহীন; ঐছনে মিলই - এইভাবে মিলিত হব; গোকুল-চন্দ - বৃন্দাবনের চন্দ্র; নিতি নিতি নাহ - রোজ রোজ স্নান করেন; যো বীজনে - যে বাতাসে; বীজই - বাতাস করেন; মৃদু বাত - মৃদু বাতাস; ভরমই - ভ্রমণ বা বিচরণ করেন; জলধর-শ্যাম - শ্যামবর্ণ মেঘ অথবা জলধররূপী শ্যাম; তছু ঠাম - তাঁর নিকট; কাঞ্চন-গোরি - কাঞ্চন অর্থাৎ সোনার মত গৌরবর্ণা; মরকত-তনু - মরকত অর্থাৎ পান্নাতুল্য দেহ;

টিপ্পনী

সরলার্থ ঃ

বিরহ অথবা মৃত্যু - কোন্‌টি অধিকতর কাম্য, এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হয়ে রাধা সিদ্ধান্ত করলেন মৃত্যুই শ্রেয়তর। কেন শ্রেয়তর, তার ব্যাখ্যা এই পদে রাধা নিজেই দিয়েছেন -

রাধার যদি মৃত্যু হয় তাহলে -

রক্তিম চরণপাতে প্রভু যেখানে যেখানে যাবেন সেখানেই আমার শরীর মৃত্তিকা হয়ে বিরাজ করবে। যে দর্পণে প্রভু নিজের মুখ দেখবেন, আমার দেহ আলো হয়ে তার মধ্যে বিকিরিত হবে। হে সখি! বিরহ ও মরণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ঘনিয়েছিল, তা নির্দ্বন্দ্ব হয়ে গেল - মৃত্যুর মাধ্যমেই আমি গোকুলচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হব। যে সরোবরে প্রভু নিত্য স্নান করেন, আমার দেহ সেখানে জলরূপে উপস্থিত হবে। যে বাতাসে প্রভু আপন শরীরে বাতাস লাগান, আমার শরীর সেখানে মৃদু-মন্দ বাতাসে পরিণত হবে। যেখানে প্রভু জলধর - শ্যামমূর্তি ধরে ভ্রমণ বা বিচরণ করেন সেখানে আমার দেহ হবে আকাশ।

কাঞ্চনতুল্য গৌরবর্ণা রাধাকে গোবিন্দ দাস বলছেন - সেই মরকত বা পান্নাতুল্য দেহধারী শ্যাম তোমাকে কেমন করে ছেড়ে দেবেন!

তাৎপর্য ঃ পূর্বরাগের মতো বিরহের দশটি দশা বা অবস্থা -

চিন্তাশ্চজাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহর্মৃত্যুর্দশা দশঃ।।

অর্থাৎ, চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ তানব (কৃশতা), মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু এই দশটি দশা।

গোবিন্দদাসের রচিত বিরহ বা মাথুর পর্যায়ের এই পদটিতে নায়িকা রাধা বিরহের তীব্র যন্ত্রণায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়ে বিরহযন্ত্রণা-ভোগ, নাকি মৃত্যুবরণের মাধ্যমে জীবন-যন্ত্রণা অতিক্রম করা - কোন্‌টি অধিকতর কাম্য, সেই দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বদীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন। অর্থাৎ রাধার মনে মৃত্যু-চেতনা এই পদটির মুখ্য বক্তব্য বিষয়। শেষতঃ রাধা স্থির করেছিলেন, একমাত্র মৃত্যুই তাঁকে চিরকাল কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভে সহায়তা করবে। এই ভাবনাই রাধাকে দ্বন্দ্বমুক্ত করেছে। রাধা মনে করেছেন মৃত্যু-উত্তর জীবনে তাঁর প্রভু যেখানে যেখানে রক্তিম চরণে বিচরণ করবেন, সেখানে তিনি মাটি হয়ে অবস্থান করবেন, যে দর্পণে কৃষ্ণ মুখ দেখেন, সেখানে তিনি হবেন জ্যোতিস্বরূপিনী, যেখানে প্রিয় কৃষ্ণ নিত্য স্নান করেন, সেখানে তাঁর দেহ পরিণত হবে জলে, বাতাস হয়ে তিনি কৃষ্ণগাত্রে মৃদুমন্দ হাওয়া বইয়ে দেবেন, নীল আকাশ হয়ে তিনি জলধর -

শ্যামের স্পর্শ লাভ করবেন।

বিরহের যন্ত্রণা অসহনীয় – এই আশঙ্কাতেই রাধা মৃত্যুকে অভিপ্রেত বলে মনে করেছেন। নিঃসন্দেহে রাধার এই মনোভাবনা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসাকেই প্রমাণিত করে। কিন্তু বিরহ অপেক্ষা মৃত্যুই বরণীয় – এই উপলব্ধি যে দিন রাধাকে 'নিরদন্দ' অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্ব করেছে, সেদিন বিরহের মর্মবিদারী বেদনা নয়, কিংবা মৃত্যুর বিষণ্ণতাও নয়, মৃত্যু-উত্তীর্ণ অবস্থায় তিনি প্রিয়-সান্নিধ্য লাভ করবেন, সেজন্য মনে মনে আশ্বস্তই হয়েছেন। এই আশ্বস্ত হওয়ার ভাব, পদটির বিরহ-পরিমন্ডলের গাম্ভীর্যকে বিনষ্ট করেছে কিনা সেদিকটিও আমাদের ভেবে দেখা উচিত।

টিপ্পনী

তৃতীয় এককে বৈষ্ণব পদাবলীর তাত্ত্বিক বিষয়, প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর বৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাতত্ত্ব, স্বকীয়া – পরকীয়া প্রেম, রাগানুগা, রাগাত্মিকা ভক্তি, নায়িকা প্রকরণ, নায়িকার অষ্টবিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই এককের 'পূর্বকথা' দ্রষ্টব্য। এছাড়া নির্বাচিত পদগুলির শব্দার্থটীকা, সরলার্থ এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা মূলপদের উল্লেখসহ নির্দিষ্ট স্থানে প্রদত্ত হয়েছে। এখানে পৃথক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী ও গৌরচন্দ্রিকার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন। আপনার পঠিত একটি গৌরচন্দ্রিকা শ্রেণীর পদের কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করুন।

২. পূর্বরাগের সংজ্ঞা লিখুন। পূর্বরাগের পদ রচনায় চন্ডীদাসের কৃতিত্ব বিচার করুন।

৩. অভিসার বলতে কি বোঝেন? বৈষ্ণব পদাবলীতে অভিসারের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যটি কি? এই পর্যায়ের যিনি শ্রেষ্ঠ কবি তাঁর একটি পদের কাব্যসৌন্দর্য বিচার করুন।

৪. বিরহ ও মাথুর সমার্থক কিনা ব্যাখ্যা করুন। বিরহ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি কে? আপনার পঠিত তাঁর একটি পদের শিল্পরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৫. বৈষ্ণব পদাবলী সম্প্রদায়বিশেষের সাধন-সঙ্গীত হলেও এর মধ্যে মানবিক দিকটি উপেক্ষিত হয়নি – আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১. গৌরচন্দ্রিকা মাত্রই গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ, কিন্তু গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদমাত্রই গৌরচন্দ্রিকা নয় – সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২. পূর্বরাগের নায়িকার দশটি দশার উল্লেখ করুন। আপনার পঠিত একটি পূর্বরাগের পদে নায়িকা রাধার যে যে দশা বা অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে সেগুলি উল্লেখ করুন।

৩. অভিসারের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৪. 'মাথুর' কথাটির উৎস কি? বৈষ্ণব কবিগণ মাথুরের পর আর কোন পর্যায় কল্পনা করেছেন কিনা বলুন।

৫. বৈষ্ণব পদাবলীতে 'পঞ্চরস' বলতে কি বোঝানো হয়েছে? এদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ এবং কেন?

টিপ্পনী

চতুর্থ একক
মেঘনাদবধ কাব্য - মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(চতুর্থ সর্গ)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের যুগ ও কবি-প্রতিভার বিকাশ

টিপ্পনী

উনিশ শতক হল বিরোধ - প্রতিবিরোধের যুগ। এ-যুগে স্ববিরোধিতাও অল্পমাত্রিক নয়। এই বিরোধসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় আধুনিকতা ও অনাধুনিকতাকে কেন্দ্র করে। রক্ষণশীল সমাজ চেয়েছিলেন প্রচলিত নিয়মকানুন, সংস্কার, শাস্ত্রীয় অনুশাসন এবং যুগ যুগ ধরে চলে-আসা ঐতিহ্যের সযত্ন সংরক্ষণ, আর আধুনিকপন্থীরা চেয়েছিলেন ব্যক্তিসত্তার শর্তহীন মুক্তি, উদার জীবন-ভাবনা, আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষা, যা জীবনবিবিক্ত, তাকে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় বর্জনের সৎসাহস, চেয়েছিলেন নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা। শাস্ত্রের অনুশাসনের নামে অমানবিক অত্যাচারকে তাঁরা মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলেই মনে করেছিলেন। বিদেশী শাসনের নাগপাশের যন্ত্রণাও তাঁদের মনোপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল। এই দ্বন্দ্বসঙ্কুল আবর্তের মধ্যেই উনিশ শতকীয় রেনেশাঁসের আবির্ভাব, বিকাশ এবং একটি স্থির লক্ষ্যে পৌঁছানোর অঙ্গীকার।

রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মত মনীষীগণ সমাজসংস্কারের যে পুণ্যব্রত গ্রহণ করেছিলেন তার সুফল এদেশের সমাজ বহুল পরিমাণে ভোগ করেছে। রক্ষণশীল সমাজ ধীরে ধীরে পিছু হটেছে, কিন্তু এও লক্ষণীয় শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে অনেক পিছুটানও ছিল ক্রিয়াশীল।

পাশ্চাত্যশিক্ষা, বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষা বাঙালীর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলনে সর্বাধিক সাহায্য করেছে। সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে জনজাগরণের যে আলো অনেক আগেই ইউরোপীয় জাতিকে আলোকিত করেছিল, সেই আলোকরশ্মিই আমাদের মনের অন্ধকার গহ্বরে সহসা প্রবেশ করে সুপ্ত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত মোহ অনেক সময় স্বদেশ, সমাজ, স্বধর্ম ও স্বদেশীয় সংস্কৃতিকে যুক্তিহীন আঘাত করেছে; চরম উচ্ছৃঙ্খলতায় দেশীয় ভাবকে কলঙ্কিত করেছে। ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের অন্ধ ইংরেজীপ্রীতি, আবেগোন্মত্ত পাশ্চাত্য-অনুকরণ তার অকাট্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। আবার এরই মধ্যে যাঁরা ছিলেন স্বদেশ ও স্বজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁরা চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্বদেশায়ন - নিজের দেশের, সমাজের উপযোগী করে সেগুলি গ্রহণের সদিচ্ছা ছিল তাঁদের। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিগণ ছিলেন সেই ধারার অন্তর্ভুক্ত। মাইকেল মধুসূদন দত্তও প্রাথমিক স্তরে ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছিলেন - পাশ্চাত্য ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান; ইংরেজী সাহিত্যে মহাকবি হয়ে ওঠার দুর্মর ইচ্ছা ছিল তাঁর অস্থি-মজ্জায়। কিন্তু ভবিতব্য তাঁকে পরিচালিত করেছিল ভিন্ন পথে; যে বাংলা ভাষাকে তিনি মনে করতেন অমার্জিত 'fishermen's language', সেই বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করে তিনি হয়ে উঠলেন 'মহাকবি', দীনা বঙ্গভাষার অনুরোধেই তাঁর বাংলা কাব্য-চর্চা, আর উপলব্ধি "মাতৃ ভাষা রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে।" বাংলাভাষা চর্চার আগে তিনি লিখেছিলেন অনেক ইংরেজী কবিতা ও 'Captive Lady'-র মত ইংরেজী কাব্য - সে-ইতিহাস 'কমলকানন' ভুলে শৈবাল-সরোবরে সাঁতার কাটার কাহিনী।

বাংলা সাহিত্যে কবিওয়ালাদের উত্তরসূরী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর অগভীর কবিত্ব সহায়তায়

সমসাময়িক জীবনের বহু বিষয় কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এবং সেগুলি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে মেয়েদের ইংরেজী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ, সিপাহী বিদ্রোহ, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরাঙ্গনা ভূমিকা ইত্যাদিকে তীব্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করলেন, আবার কখনো স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের কথা ফুটিয়ে তুললেন।বাঙালীর বিবিধ রসনাসুখকর খাদ্যদ্রব্য, প্রকৃতি এসবের চিত্রণে বস্তুধর্মিতার প্রাধান্য থাকলেও কবি ঈশ্বরগুপ্তের রসিক মনটি সেখানে গুপ্ত থাকেনি। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় যুগসন্ধির দ্বিধা তাঁকে প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যবর্তী স্তরে আবদ্ধ করে রেখেছে।

টিপ্পনী

অন্যদিকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও আধুনিক যুগের যোগ্য 'নকীব' হয়ে উঠতে পারেন নি। যুগ-চাহিদা ও যুগ-প্রয়োজনের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে মহাকবি হয়ে ওঠা যায় না - রঙ্গলাল সেই ব্যর্থতার দায় অস্বীকার করতে পারেন না। সেকারণেই তিনি বাংলা কাব্যের বিষয়বস্তুকে মধ্যযুগীয় দেবমাহাত্ম্যের অভিকর্ষ থেকে মুক্ত করলেন বটে, কিন্তু সেই বিষয়বস্তুকে যোগ্য পরিচর্যার সাহায্যে আধুনিক সজ্জা পরাতে পারলেন না - কাব্যরীতি ও কাব্যপ্রকাশনার দিক থেকে তিনি অনাধুনিকই থেকে গেলেন। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্মদেবী, শূরসুন্দরী, বীরবাহু কাব্য - মহাকাব্য হয়ে উঠল না, সেগুলি থেকে গেল আখ্যানকাব্যের স্তরে।পয়ার - ত্রিপদীর গতানুগতিক চালে পাঠকের কাব্য-পাঠেচ্ছা ক্লান্তির কোলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল।

বাংলা কাব্য-কবিতার এই ক্লান্তিকর পরিমন্ডলে হঠাৎ-আলোর ঝলকানি নিয়ে অদ্বিতীয় মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব—রাজমিক তাঁর ব্যক্তিত্ব, রাজসিক তাঁর কবি-স্বভাব। পান্ডিত্য, প্রতিভা আর কবিত্বের ত্রিবেণীসঙ্গম তাঁর মনোরাজ্য। সৃষ্টির মৌলিকতায় তিনি বিশ্বকর্মা — যুগ-নির্মাণের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় তিনি বিদ্যাভারতীর বরপুত্র।

নাট্যরচনা দিয়ে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব - কিন্তু তাঁর সব্যসাচী-প্রতিভা নাট্যরচনার সমান্তরালেই কাব্যরচনায় ব্যাপৃত ছিল।মধুসূদনের নাট্যালোচনা আমাদের প্রাসঙ্গিক বিষয় নয় - আমাদের লক্ষ্য তাঁর কাব্য, বিশেষ লক্ষ্য 'মেঘনাদবধ-কাব্য'।

মধুসূদন-রচিত কাব্যগুলি হল 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এবং শতাধিক সনেট সংকলন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'।

মেঘনাদবধ কাব্যের পরিকল্পনা ও কাব্য বৈশিষ্ট্য

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান পরিচয় মেঘনাদবধ কাব্যের কবি হিসেবেই। এই কাব্য রচনা করেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে তিনি মহাকবির সম্মানে ভূষিত হয়েছেন - কাব্যটি রচনার পেছনে রয়েছে কবির অনেক ভাবনা, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ইতিহাস।

মধুসূদনের অন্যতম সুহৃদ্ রাজনারায়ণ বসু মধুসূদনকে বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় নিয়ে একটি মহাকাব্য রচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বিজয় সিংহের জীবন ও কর্মকান্ড মহাকাব্যোচিত হলেও মধুসূদন দত্তের কাছে সেই কাহিনী উনিশ শতকের নবজাগ্রত জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ বলে মনে হয়নি, কিংবা বিজয় সিংহের মধ্যে তিনি আত্ম আবেগের উৎস খুঁজে পাননি - অনিসন্ধিৎসু মধুসূদন শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলেন আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যের মধ্যে তাঁর অন্বিষ্ট চরিত্র ও ঘটনা —'Grand fellow' রাবণ- 'favourite Indrajit' তাঁকে

সরবরাহ করল আধুনিক যুগের সাহিত্যিক মহাকাব্য (Literary Epic) রচনার সমৃদ্ধ 'রসদ'।

পাশ্চাত্য সমালোচকেরা মহাকাব্য বা এপিককে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন -

একটি Authentic Epic বা ধ্রুপদী মহাকাব্য', অন্যটি Literary Epic বা সাহিত্যিক মহাকাব্য।

প্রাচীনযুগে রচিত আদি মহাকাব্যকে Authentic Epic বলা হয়। ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে Authentic Epic-কে Classical Epic নামেও অভিহিত করা হয়। আর মহাকাব্যধারার প্রাচীনত্বের কথা স্মরণ করে এর আর একটি নামকরণ - Primitive Epic. একটি জাতির সামগ্রিক পরিচয় এই জাতীয় মহাকাব্যে প্রতিফলিত হয়।

টিপ্পনী

আর Literary Epic হল প্রাচীন মহাকাব্য থেকে গৃহীত কাহিনীর মধ্যে আধুনিক জীবনাদর্শের প্রতিফলন। প্রাচীন মহাকাব্যিক ঘটনার অনুকরণ এই জাতীয় মহাকাব্যে দৃষ্ট হয় বলে এর আর এক নাম Imitative Epic বা অনুকরণাত্মক মহাকাব্য।

সংস্কৃত 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ধ্রুপদী মহাকাব্যের কতকগুলি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। যেমন -

১) মহাকাব্য সর্গ দ্বারা বিভাজিত হবে। এখানে সর্বোচ্চ ৩০টি সর্গ এবং কমপক্ষে ৯টি সর্গ থাকবে।

২) প্রত্যেকটি সর্গের শেষে থাকবে পরবর্তী সর্গের সূচনা।

৩) বিভিন্ন সর্গ একই ছন্দে লিখিত হবে, তবে সর্গের শেষে অন্য ছন্দের ব্যবহার থাকবে।

৪) সত্য ঘটনা বা ঐতিহাসিক কাহিনী হবে মহাকাব্যের উপজীব্য।

৫) নায়ক চরিত্র হবেন কোন দেবতা বা সদ্বংশজাত ধীরোদাত্ত ক্ষত্রিয়। সদ্বংশজাত রাজাও নায়ক হতে পারেন।

৬) মহাকাব্যে সূর্য, চন্দ্র, সাগর, রজনী, প্রদোষ, প্রভাত, মৃগয়া, বন, পর্বত, জলক্রীড়া, বিপ্রলম্ভ, বিবাহ, সম্ভোগ, বিরহ, যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা থাকবে।

৭) রচনাটি অলংকারসমৃদ্ধ ও রসভাবযুক্ত হবে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের যে-কোন একটি রস মূল রস বলে বিবেচিত হবে, অন্যরসগুলি সঞ্চারী হিসেবে বর্তমান থাকবে।

অ্যারিস্টটলের মতে এপিক বা মহাকাব্যে অসাধারণ ঘটনার উল্লেখ থাকে এবং এর যিনি নায়ক তিনি হবেন 'জাতীয় বীর'। ট্র্যাজিডির যেমন নির্দিষ্ট একটি আয়তন কাম্য, মহাকাব্যে সে রকম আয়তনগত কোন বিধিনিষেধ নেই।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মূলত বাল্মীকি রামায়ণ থেকে তাঁর কাব্যের মূল বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন। অবশ্য কৃত্তিবাসের কাছেও তিনি অনেকটাই ঋণী। এছাড়া কাব্যের অষ্টম সর্গের বিষয়বস্তু বর্ণনায় দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র কাছে কবির ঋণী থাকার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। ঘটনাগত দিকগুলি বাদ দিলে কাব্য প্রসাধনে - যেমন বিভিন্ন উপমা, চিত্রকল্প, ঘটনা ও চরিত্রগত কিছু বিশেষত্ব সৃষ্টিতে মধুসূদন বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ, হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিল্টন

প্রমুখ কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন - সেই হিসেবে মেঘনাদবধ কাব্য দেশ-বিদেশের 'ফুলবন-মধু লয়ে' রচিত একটি অসাধারণ 'মধুচক্র'। এই 'মধুচক্র' রচনায় মধুসূদনের মৌলিক কারুকৃতি অবশ্যস্বীকার্য। 'Bengali Literature'-এ মেঘনাদবধ -কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মধুসূদনের কাব্যকৃতির মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বলেছিলেন-

"..... the poem is his own work from beginning to end. The scenes, characters, machinery and episodes, are in many respects of Mr. Dutta's own creation..... To Homer and Milton, as well as to Valmiki, he is largely indested in many ways, but he has assimilated and made his own most of the ideas which he has taken, and this poem is on the whole the most valuable work in modern Bengali Literature."

টিপ্পনী

যে - কোন কাব্য বা মহাকাব্যের অন্তর্মূলে থাকে কবি-কল্পনা ও কাব্যপরিকল্পনার মৌলিক পরিচয়। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সেই মৌলিকতার প্রথম আত্মপ্রকাশ বাল্মীকির কাব্যাদর্শের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে চরিত্রগুলিকে আর্য-মেরু থেকে বিচ্যুৎ করা এবং নিজের মত করে পুনর্বিন্যস্ত করার সাহসিকতা প্রদর্শনে। মধুসূদন জানতেন এর প্রতিক্রিয়া তাঁর বিরুদ্ধেও যেতে পারে; একটি পত্রে তিনি লিখছেন - "People here grumble and say the heart of the poet is with the Rakshasas. And that is the real truth. I despise Rama and his rabble; - ideas of Ravana elevates and kindles my imagination, he was a grand fellow." মধুসূদনের এই মন্তব্য চিরাচরিত ধারণা ও বিশ্বাসের মূলে সদম্ভ আঘাত ব্যতীত অন্য কিছু নয়; কিন্তু বিশ্বজনীন প্রতিভা যাঁদের তাঁরা যুগের বাণীকে যে-কোন মূল্যে উচ্চকণ্ঠ করবেনই। শ্রী অরবিন্দের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করে বলা যায় - 'Supreme imaginative originality is seldom bound by the rules of grammar.'

মেঘনাদবধ কাব্যের পরিকল্পনাকালে, এমনকি কাব্যটি যখন লিখিত হচ্ছে সেই সময়েও একাধিক পত্রে মধুসূদন ভারতীয় মহাকাব্যিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অনাস্থা বা বিরূপ মনোভাবের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন তাঁর কাব্যটি হবে 'three-fourth Greek.' অন্য একটি পত্রে লিখেছিলেন - 'I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write, as a Greek would have done.' তিনি স্পষ্টতঃই পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন - 'I will not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Biswanath of Sahitya Darpan.' আরও বলেছেন - 'I will not care a pin's head for Hinduism :

এতৎসত্ত্বেও 'মেধনাদবধ কাব্যের' চতুর্থ সর্গে মধুসূদন সবিনয় প্রণিপাত করে বাল্মীকির আশীর্বাদপ্রার্থী হয়ে বলেছেন -

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

তবে মধুসূদনের এই নমস্ক্রিয়ার মধ্যে কোন স্ব-বিরোধিতা নেই। তিনি বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করে রামায়ণ - ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাননি, তিনি আশীর্বাদস্বরূপ বাল্মীকির

কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য প্রার্থনা করেছিলেন নবযুগের নব মহাকাব্য রচনার জন্য। 'মেঘনাদবধ কাব্যের' রসপরিণাম সম্পর্কে মধুসূদনের মনে একটা দ্বিধা ছিল। 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' - বীররসের কাব্য রচনার এই অঙ্গীকার করলেও মেঘনাদবধের রসপরিণাম বীররসাত্মক নয়। প্রথমসর্গে রাবণের বীরপুত্র বীরবাহুর বীরোচিত মৃত্যুর কারুণ্য দিয়ে কাব্যের সূত্রপাত, আর শেষসর্গে 'লঙ্কার পঙ্কজ-রবি' ইন্দ্রজিতের সমুদ্রতীরে সৎকার ও প্রমীলার সহমরণের মর্মভেদী বেদনা দিয়ে কাব্যের সমাপ্তি, যার ফলশ্রুতি -

'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী - দিবসে,
সপ্ত দিবা-নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।'

টিপ্পনী

সুতরাং 'মেঘনাদবধ কাব্য' করুণরসাত্মক কাব্য। এখানে পাশ্চাত্যসুলভ বীররসের রুদ্ররূপকে মধুসূদন হয়তো সচেতনভাবেই এড়িয়ে গিয়েছেন, রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতেও তিনি বীররস ও করুণরসের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে লিখেছিলেন -

you must not, my dear fellow, judge of the work as a regular 'Heroic Poem'; I never meant as suel. It is a story, a tale, rather heroically told. Do not frightened, my dear fellow, Iwon't trouble my reader with viraras. বরং কাব্যে করুণরসের আধিক্য দেখে কবির নিজেরই মনে হয়েছিল - "I never thought I was such a fellow for the pathetic."

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে মেঘনাদবধ কাব্যের ভাব-পরিকল্পনায়, বহিঃপ্রসাধনে, চরিত্রের আধুনিকীকরণে, ভাষার ঐশ্বর্যবিধানে, চরিত্রের ব্যক্তিমহিমা সৃজনে, সর্বোপরি এর উপস্থাপনভঙ্গীতে রয়েছে পাশ্চাত্যমহাকাব্যের প্রভাব, কিন্তু অন্তরের সূক্ষ্মতম প্রদেশে, যেখানে মধুসূদন সম্পূর্ণতঃ ভারতীয়, সেখানে এই কাব্যটি স্বদেশীয় রীতির অনুসারী।

"হায় শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হেম গেহে?"

প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে সীতাহরণের ঘটনার ইঙ্গিত, এবং সেইসূত্রে আপন আত্মজ বীরবাহুর মৃত্যুর জন্য রাবণকে দায়ী করা ইত্যাদি টুকরো টুকরো ঘটনা বাদ দিলে স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের কারণ - হিসেবে সীতাহরণের মত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দেওয়ার একটা দায় মধুসূদনের ছিল, অন্যথায় একটি বিরাট ধ্বংস, একটি মর্মবিদারী ট্র্যাজিডির পিছনে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যেতনা।

কিন্তু এহো বাহ্য। রামচন্দ্র এবং তাঁর অনুচরদের প্রতি ঘৃণাবর্ষণ করে যে রাজকীয় শংসা-পত্র কবি মধুসূদন রাক্ষসরাজ রাবণকে প্রদান করেছেন (Grand fellow), তার মধ্যে অবশ্যই মধুসূদনের কবিধর্মের আধুনিক মনোবৃত্তি আছে, কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসেবে রাবণ চরিত্রের ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে গিয়ে তিনি কখনোই রাবণকে নির্দোষ ভাবতে পারেননি। একদিকে

রাবণের বিরাটত্ব, অন্যদিকে তার অহংপ্রমত্ত অনাচার – এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ঠিক 'vice' বা পাপকার্য হিসেবে নয়, বিচার-ভ্রান্তি বা 'error of judgementment'-জাত সীতাহরণের মত ঘটনার রামায়ণ অনুসারী বিবরণ কবি প্রদান করেছেন। প্রথম সর্গে 'কি কুক্ষণে.... পাবক শিখারূপিণী জানকীরে আমি/আনিনু এ হেম গৃহে' ইত্যাদি উক্তির মধ্যে বিচার-বিভ্রান্তির দিকটিই লুকিয়ে আছে।

টিপ্পনী

চতুর্থ সর্গটির কাব্য-প্রয়োজনীয়তা অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার্য। কালগত বিচারে মেঘনাদবধ কাব্যের ঘটনাবলী তিনদিন দু'রাত্রির মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এই অত্যল্পকালের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার মহাকাব্যিক বিস্তার দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। সেক্ষেত্রে কবি মধুসূদন সীতা চরিত্রের অবতারণা করে রামায়ণী ঘটনার সংক্ষিপ্ত কিন্তু অনুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করেছেন যা কাব্য ঘটনার ব্যাপ্তি ঘটাতে সহায়তা করেছে।

চতুর্থ সর্গটি কাব্যকাহিনী ও কাব্যরসের বৈচিত্র্য ঘটাতেও যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা –

'মেঘনাদবধ কাব্যের' চতুর্থ সর্গটির নাম 'অশোকবনং'। স্বর্ণলঙ্কার অশোকবনে ভীষণদর্শনা চেড়ীদল পরিবেষ্টিতা বন্দিনী সীতা এই সর্গের কেন্দ্রীয় চরিত্র। আপাতদৃষ্টিতে মূলকাব্যকাহিনীর সঙ্গে এই সর্গের ঘটনার সম্পর্ক দূরান্বিত, কোন অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। অনেক সমালোচক মূল কাব্যঘটনার সঙ্গে সম্পর্করহিত এই সর্গটির সংযোজনকে অপ্রাসঙ্গিক ও বাহুল্য বলে উল্লেখ করেছেন। কবি নিজেও এ ব্যাপারটি সম্পর্কে যে সচেতন ছিলেন না তা নয়। ঘটনাগত অপ্রাসঙ্গিকতার চিন্তা তাঁর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি কিন্তু সর্গটির প্রতি মধুসূদনের দুর্বলতার বিষয়টিও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি আমাদের বোধগম্য হবে – "Perhaps the episode of Sita's abduction (4th Book) should not have been admitted since it is scarecly connected with the progress of the fable. But would you willingly part with it?" রসজ্ঞ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার নানান কারণে মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গটির কাব্যোপযোগিতা ও কাব্য-প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন।

মোহিতলাল মজুমদারের মতে – "কবি এই শাখা কাহিনীর সুযোগে মূল পূর্ব-পর বৃত্তান্ত সংক্ষেপে পাঠকের গোচর করিয়াছেন – সীতার হরণ কাহিনী ও তাহার উদ্ধারের কাহিনী সুকৌশলে ইহার মধ্যে বলিয়া লইয়াছেন।"

বীরপুত্র বীরবাহুর নিধন, শূলীশম্ভুনিভ বীর কুম্ভকর্ণের অকালমৃত্যু, সদ্য সৈন্যাপত্যে অভিষিক্ত রাবণের অন্য এক বীরপুত্র ইন্দ্রজিতের অসহায় জীবনাবসান, লঙ্কার বীরশূন্য অবস্থা, 'উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম' স্বর্ণলঙ্কায় একে একে দীপ নিভে যাওয়া – এ সমস্ত বিপর্যয়ের কারণ কী? 'মরে পুত্র জনকের পাপে' – জনকের কোন্ পাপ? চিত্রাঙ্গদা রাবণের নিয়তি – তাড়িত অবস্থার পরিচয় দিয়ে যখন বলেন (১ম সর্গ) –

'হায় নাথ, নিজকর্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে মজিলা আপনি'

তখন প্রশ্ন, সেই 'নিজ কর্মফলের' গুরুত্বই বা কি? দ্বিতীয় সর্গে ইন্দ্র-শচী যখন দেবী দুর্গার নিকট রাবণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বলেন – 'পরধন, পরদার লোভে লোভী সদা পামর।' তখনও রাবণের পামরবৃত্তির পরিচয় জানার জন্য পাঠক-হৃদয়ে কৌতূহল জাগ্রত হয়।

সেই সমস্ত প্রশ্ন ও কৌতূহলের নিরসন ঘটানোর জন্য মধুসূদনকে একটি উপায় স্থির করতে হয়েছিল – যার ফলশ্রুতি চতুর্থ সর্গের পরিকল্পনা। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' ভারতবর্ষীয় কর্মফলবাদের উল্লেখ বারংবার আছে। সুকৃতির ফল পুণ্যার্জন, আর অপকৃতির ফল পতন – এই বিশ্বাস ভারতবাসীর অস্থি-মজ্জায় চিরগ্রথিত। কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণমহীষী চিত্রাঙ্গদা সর্বপ্রথম এই কর্মফলবাদের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে বলেছিলেন –

'হায় নাথ, নিজ কর্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।'

টিপ্পনী

দ্বিতীয় সর্গে লক্ষ্মীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে – 'নিজ কর্মদোষে মজিছে সবংশে পাপী', দ্বিতীয় সর্গেই শিবও বলেছেন '... নিজ কর্মদোষে মজে দুষ্টমতি'; ষষ্ঠ সর্গে বিভীষণ বলেছেন – 'নিজ কর্মদোষে হায় মজাইলা / এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা, আপনি।' সপ্তম সর্গে ইন্দ্রের কণ্ঠেও একই কথা ধ্বনিত হতে শোনা যায় – 'নিজ কর্মদোষে মজে রক্ষ-কুলনিধি ....।' ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মীর উক্তিতে 'প্রাক্তন' – এর প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায় – 'প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে' – এই প্রাক্তনও পূর্বজন্মে কৃত কর্মফলেরই সঞ্চিত অংশ।

অতএব চতুর্থ সর্গে মধুসূদন লঙ্কার সমূহ বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে রাবণের কর্মফলকে দায়ী করলেও মেঘনাদবধ কাব্যের ক্ষিপ্রগতিপ্রবাহের মধ্যে কবি রাবণকৃত কর্মবিপাকের পরিচয় দেওয়ার অবকাশ পান নি – কাব্যের চতুর্থ সর্গে অশোকবনের নির্জন পরিবেশে বিভীষণ-পত্নী সরমাসকাশে সরমার অনুরোধে সীতা পঞ্চবটীবন থেকে অশোকবনে আগমন পর্যন্ত ঘটনাবলীর স্মৃতি-রোমন্থন করেছেন। রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণ, রাবণের শঠতা, জটায়ুবধ, অশোকবনে বন্দী জীবন-যাপন করতে বাধ্য করা, সমস্ত ঘটনাই সীতার জবানীতে এই অংশে মধুসূদন বর্ণনা করিয়ে নিয়েছেন। এমনকি জটায়ুর সঙ্গে প্রবলযুদ্ধ চলাকালীন সীতা অচেতন হয়ে পড়লে স্বপ্নমধ্যে মাতা বসুন্ধরার প্রত্যক্ষ প্রণোদনায় লঙ্কা ও রাবণের যে ভবিষ্যৎ-চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন, সেখানে রাবণ তথা স্বর্ণলঙ্কার সামূহিক পতনের দৃশ্যটিও চিত্রায়িত হয়েছে। এককথায় রাম-রাবণের প্রবল সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কারণ এবং রাবণকৃত দুষ্কর্মই যে স্বর্ণলঙ্কার দুরপনেয় ট্র্যাজিডির উৎস — কৌশলে কবি এই সর্গে তা উত্থাপিত করেছেন।

গ্রীক ট্র্যাজিডির একটি অন্যতম কারণ হল বিশ্বনীতি-লঙ্ঘন। জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ বিশ্বনীতি লঙ্ঘিত হলে এক দুর্জ্ঞেয় নিয়তি শক্তি সেখানে নায়ক চরিত্রকে পতনের ভয়াল আবর্তে টেনে নিয়ে যায়। লঙ্কারাজ রাবণ পরস্ত্রী সীতাকে অপহরণ করে এক অর্থে বিশ্বনীতিকেই লঙ্ঘন করেছিলেন – সুতরাং তাঁরও পরিণতি সর্বাত্মক পতন। এই পতনের কারণ যে সীতা, প্রথম সর্গে রাবণের আক্ষেপোক্তিতে তা স্পষ্ট তৃতীয় সর্গে প্রমীলা চরিত্রে পাশ্চাত্য নারীসুলভ বীরাঙ্গনাবৈশিষ্ট্য মধ্যাহ্ন-সূর্যের দীপ্তি নিয়ে সার্থকভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে আর চতুর্থ সর্গে সীতা-চরিত্র যেন প্রমীলার বিপ্রতীপে শান্ত-স্নিগ্ধ-কোমল চন্দ্রমার মত কাব্যাঙ্গনকে আলোকিত করেছে। সীতা পাশ্চাত্যের নায়িকা নয়, ভারতীয় চিরন্তন কল্যাণী বধূর প্রতীক। নারীর সেই কল্যাণী রূপের প্রতি মধুসূদনের আন্তরিক দুর্বলতা ছিল।

মধুসূদন ক্লাসিকরীতির কাব্য রচনা করলেও তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে ফল্গুধারার মত লিরিক বা গীতিরস প্রবাহিত হত—সেই গীতিপ্রাণতার স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক প্রকাশ চতুর্থ সর্গে লক্ষ্য করা যাবে। মেঘনাদবধ কাব্যের অন্যত্রও মধুসূদনের গীতি-প্রাণতার অনুররণ শ্রুত হয়। সেদিকে

লক্ষ্য রেখেই সমালোচক মন্তব্য করেছেন - 'Michael began with an epic but ended in a lyric; or it may be said of him what Prof. Saintsbury says of Milton he was the greatest in the lyric in the epic.' মধুসূদনের সেই লিরিক-আত্মার মঞ্জরিত প্রকাশ ঘটানোর অবকাশ অন্য কোন সর্গে সম্ভব হয়নি বলেই, কবি চতুর্থ সর্গটিকে তার উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। সীতা-সরমার যুগলবন্দীতে এই গীতিরসের মূর্চ্ছনা মূল কাব্য-অভিপ্রায়কে পরিপুষ্টই করেছে, কোনো 'রসাভাস' ঘটায়নি।

টিপ্পনী

'মেঘনাদবধ কাব্যের' প্রথম সর্গে বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদার রাবণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা আর তৃতীয় সর্গে ইন্দ্রজিতের বীরজায়া প্রমীলার ক্ষাত্রতেজদৃপ্তা বীরাঙ্গনা মূর্তিধারণ এবং ঠিক তারপরেই চতুর্থ সর্গে কোমলপ্রাণা, শান্তস্বভাবা সর্বংসহা সীতা চরিত্রের অবতারণা - মধুসূদনের কবি-প্রাণের এক অভূতপূর্ব সৃষ্টিবৈচিত্র্যের স্মারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজসিক মধুসূদনের এ যেন ঘটনার রুদ্র নির্ঘোষ থেকে সাময়িক বিরাম নিয়ে কোলাহলহীন শান্ত স্নিগ্ধ পরিমন্ডলে উত্তেজিত প্রাণের অবসরযাপন। এই অবসরযাপনে তিনি 'আপন মনের মাধুরী নিশায়ে' সযত্নে গড়ে তুলেছেন সীতার অমল মূর্তি। অনেকে মনে করেন মাতা জাহ্নবী দেবী এবং স্ত্রী রেবেকার প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে সীতা চরিত্রটির মধ্যে।

শাক্তপদাবলীর দুখিনী জননী মেনকা সখেদে বলেছিলেন 'নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে' -রামায়ণের সীতা এমনই এক নারী চরিত্র যিনি জনমদুখিনী। চতুর্থ সর্গে সীতা চরিত্রের উপস্থাপনার সূচনাতেই তাঁকে বিষাদময়ী মূর্তি রূপে কবি তুলে ধরেছেন - তাঁর দুঃখে প্রকৃতি স্তব্ধ, বিশ্ব শোকার্ত। ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্যে অভিষেককে কেন্দ্র করে সমস্ত লঙ্কাপুরী যখন উৎসবসাজে মত্ত তখনই সেই আনন্দমত্ততার বৈপরীত্যসূচক চিত্র হিসেবে কবি সীতার বিষাদিনী মূর্তি অঙ্কন করেছেন।

সীতা মধুসূদনের হাতে কল্যাণকামী গৃহবধূ, পতিব্রতা জায়া, সকলের হিতাকাঙ্ক্ষিনী - এমনকি দুর্মতি রাবণের প্রতিও প্রয়োজনে সহানুভূতিশীল। সরমা যখন নিরাভরণা সীতাকে দেখে রাবণকে তাঁর অলংকার-অপহারক বলে মনে করেছেন বিড়ম্বিতা সীতা তৎক্ষণাৎ বলেছেন -

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি, -
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ," .....

দ্বিতীয়ত ঃ, সংসারী নারীর কোন জটিলতা সীতা চরিত্রে নেই। তিনি উদারমনা। স্বামী, দেবর, অরণ্যের পশুপক্ষী, স্রোতোস্বিনীর জলধারা, প্রকৃতির লতা-পুষ্প সব নিয়েই তাঁর বৃহত্তর সংসার। তাঁর আনন্দ অনাবিল - পক্ষপাতহীন তাঁর আচরণ। সকলের আনন্দবিধানই তাঁর জীবনের পরম ব্রত।

তৃতীয়তঃ, কোন স্বার্থজনিত জটিলতা যেমন তাঁর মধ্যে নেই, তেমনি নেই রাজবধূর আভিজাত্যবোধ। বরং অরণ্যজীবনে প্রকৃতির সাহচর্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন রাজ-ঐশ্বর্য অপেক্ষাও অনেক বেশী সুখ-উপকরণ।

চতুর্থতঃ, স্বামীর প্রতি প্রেমে একনিষ্ঠ এই নারীচরিত্রটি স্বামী-সেবা ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছুর প্রতিই উদাসীন। অশোকবনে বন্দিনী অবস্থায় সরমার প্রতি তাঁর বক্তব্যের সিংহভাগ

জুড়ে আছে তাঁর স্বামী-আনুগত্যের কথা।

পঞ্চমতঃ, যুদ্ধ, রাষ্ট্রকোলাহল, অধর্মাচরণ এসবের প্রতি সীতার বিরাগ যেন তাঁর স্বভাবগত ব্যাপার। নিষ্ঠুরতা, প্রাণহানি, বীরত্বের নামে অকারণ বলপ্রয়োগ এ সমস্ত ঘটনা তাই তাঁকে বারংবার সংজ্ঞাহীন করে।

ষষ্ঠতঃ, সুভাষিণী সীতার আলাপচারিতা অত্যন্ত আন্তরিক। সরমার প্রতি তাঁর সখ্যতা, সৌজন্য ও শিষ্টাচার, অকৃত্রিম স্নেহভাব এবং মিষ্টভাষণ চরিত্রটির মাধুর্যকেই প্রতিপন্ন করে। সীতার মধুরভাষণে
পরিতৃপ্ত সরমা বলেছেন -

"..... শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!"

সীতার দুঃখময় জীবনের জন্য লঙ্কাধিপতি দায়ী - সরমা অত্যন্ত খেদের সঙ্গে একথা জানিয়ে যখন তিনি ও তাঁর স্বামী বিভীষণ সীতার দুঃখে সমব্যথী হয়ে অশ্রু বিসর্জন করার কথা জানান, তখন সীতা তাঁর স্বভাবগত সৌজন্যে সরমা ও বিভীষণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেন না-

"জানি আমি, বিভীষণ উপকারী মম
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি!
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়াগুণে!"

চতুর্থ সর্গের প্রান্তিকে এসে সরমার বিদায়গ্রহণের প্রাক্কালে সীতা সরমাকে যা বলেছেন, তার মধ্যে চরিত্রটির নির্মুখোশ সখ্যতা আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে -

"তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে।"

সপ্তমতঃ, মধুসূদনের সীতা যেন প্রকৃতির দুহিতা - প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ওতপ্রোত সম্পর্ক। চরিত্রটির সারল্য, নিষ্পাপ মনোবৃত্তি এবং ঔদার্য যেন প্রকৃতিরই সমগোত্রীয়। প্রকৃতির সাহচর্যেই চরিত্রটি অধিকতর স্বতঃস্ফূর্ত।

পরিশেষে বলা যায়, সীতা প্রতারণাজালে বদ্ধ এক অসহায়া হরিণী। তিনি প্রতারকের প্রতারণায় অনিশ্চিত জীবন-সংকটে উপনীত হয়েছেন, এজন্য তাঁর মর্মব্যথা আছে, ক্ষোভ-ক্রোধও আছে, কিন্তু বীরাঙ্গনাসুলভ প্রতিবাদ নেই, তাঁর প্রতিবাদ শুধু অনুযোগের স্তরেই সীমাবদ্ধ। মধুসূদন সীতাকে আদ্যন্ত একটি সুর-মাত্রাতেই ধরে রাখতে চেয়েছেন বলে কখনো উচ্চকিত করে তোলেননি। চরিত্রটির স্বাভাবিকতা ধরে রাখার জন্য এটুকুর প্রয়োজনও ছিল।

টিপ্পনী

মেঘনাদবধ কাব্য – (৪র্থ সর্গ) ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

চতুর্থ সর্গের বিষয়বস্তু (মূলের প্রায় আনুপূর্বিক গদ্যান্তর)

টিপ্পনী

'মেঘনাদবধ কাব্যের' চতুর্থ সর্গের সূচনা হয়েছে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের আদি আর্য মহাকবি বাল্মীকির 'পদাম্বুজে' প্রণামপ্রদানের মাধ্যমে। বাল্মীকিকে কবি মধুসূদন ভারতের কবি-সমাজের 'শিরঃচূড়ামণি' বলে সম্বোধন করেছেন এবং দীন ব্যক্তি যেমন রাজানুগ্রহ লাভ করে দূর তীর্থ দর্শনে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে কবি মধুসূদনও সেইরকম আদি কবির অনুগামী হতে চান। আদি কবির পদানুসরণ ও ধ্যান করে কত কবি যশোমন্দিরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন – এবং সব বাধা বিপত্তি দূর করে অমরত্ব লাভ করেছেন। ভারতীর বরপুত্র শ্রীভর্ত্তৃহরি, পন্ডিত ভবভূতি শ্রীকণ্ঠ, সুমধুর ভাষী মহাকবি কালিদাস, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির ন্যায় অতি সমধুর নাট্যরচয়িতা মুরারি, কীর্তির সঙ্গে বসবাসকারী বঙ্গের অলংকার কবি কৃত্তিবাস –এঁরা হলেন সেই অমর কবি। কবি মধুসূদন অত্যন্ত বিনয়-বচন সহকারে নিজের কবিত্বের দীনতার কথা উল্লেখ করে কবি বাল্মীকির নিকট কবিত্ব-বিদ্যা শিক্ষা করতে চেয়েছেন; উদ্দেশ্য – কবিতার সরোবরে যে-কবি-রাজহংসগণ বিচরণ করেন তাঁদের সঙ্গে সসম্মানে জল-কেলি করা। এব্যাপারে নিজের দীনতা স্বীকার করে আধুনিক কবি আদি কবির সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

এর পরবর্তী অংশে মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বর্ণলঙ্কার এক আনন্দমুখর উৎসবসাজমন্ডিত সৌন্দর্যচিত্র উপস্থাপিত করেছেন। সেই সৌন্দর্য-চিত্রের মধ্যে আছে – ঘরে ঘরে ধ্বনিত বাদ্যধ্বনি, নর্তকীর নৃত্য, সুগায়কের সুতান-বিশিষ্ট সঙ্গীত, নর-নারীর প্রেম-রভসের প্রসঙ্গ, ফুল-মালা-সজ্জিত প্রত্যেক গৃহদ্বারের বর্ণনা, ভবনচূড়ায় উড্ডীন পতাকা এবং আনন্দমুখর পুরবাসীর কলকল্লোলসহ রাজপথে সমবেত হওয়া। এই মহোৎসবের কারণ বীরপুত্র বীরবাহুর অকাল মৃত্যুর পর লঙ্কার পঙ্কজ-রবি ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্য গ্রহণ – লঙ্কাবাসীর প্রত্যাশা, আগামীকাল ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে বধ করবেন – রামচন্দ্রের সেনাবাহিনীকে শৃগালের মত বিতাড়িত করা হবে আর বিভীষণকে রাজসমীপে বন্দী করে আনা হবে। লঙ্কাবাসী তাই আনন্দে মাতোয়ারা – তাঁরা আশাবাদী লঙ্কার বুকে ঘনায়মান দুর্যোগ এইবার অবসিত হবে।

নগরের ঘরে ঘরে পথে-পথে যখন আনন্দ-উৎসব, তখন অশোকবনে বন্দিনী সীতা তাঁর অন্ধকার কুটীরে অশ্রুমুখী হয়ে বিরাজ করছেন। দুরন্ত চেড়ীগণও সেই মুহূর্তে কিছু দূরে আনন্দ-উৎসবে মত্ত। সীতা 'মলিন-বদনা'। খনির তিমির গর্ভে যেখানে সূর্যকর প্রবেশ করেনা বলে সূর্যকান্তমণিও নিষ্প্রভ প্রতিভাত হয় কিংবা সমুদ্রগর্ভে অবস্থানরতা লক্ষ্মীকে মনে হয় শ্রীহীনা – সীতাও সেই রকম মলিনবেশিনী। সীতার মনোদুঃখে প্রকৃতি, পশু-পাখী সকলেই শোকাকুল।

ঠিক সেই সময় অশোক বনে উপস্থিত হলেন রক্ষোবধূ – বিভীষণপত্নী সরমা। সীতার পদতলে উপবেশন করে তিনিও ক্রন্দনে ভেঙে পড়লেন। চেড়ীদের অনুপস্থিতির সুযোগে সতী সরমা সীতার চরণকমল পূজার অভিপ্রায় জানালেন। চরণ-বন্দনার পর সরমা সীতার প্রশস্ত ললাটে এঁকে দিলেন সন্ধ্যাতারার মত উজ্জ্বল টিপ। তারপর চরণে প্রণাম নিবেদন করে সীতার পদতলে উপবেশন করলেন, যেন মনে হল তুলসীর মূলে স্বর্ণপ্রদীপ জ্বলে উঠল।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

রক্ষোবধূ সরমা সীতার দুর্ভাগ্যের জন্য রাবণের প্রতি বিরূপ হয়েছেন, কিন্তু সীতা সরমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন লঙ্কাপতি রাবণ নির্দোষ। কারণ যে বহুমূল্য অলংকারের প্রতি রাবণের

লোভহেতু সীতাকে রাবণ অপহরণ করেছিলেন বলে সরমা মনে করেছেন, সীতা জানিয়েছেন, সেই অলংকারসমূহ রাবণ কুক্ষীগত করেননি, সীতা নিজের হাতে সেই সমস্ত অলংকার তাঁর অপহরণের নিশানাস্বরূপ পথে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন - এবং সেই নিশানা ধরেই রামচন্দ্রের লঙ্কায় আগমন।

এরপর সরমা সীতার নিকট রাবণ কর্তৃক তাঁর অপহরণের বৃত্তান্ত অবগত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সীতা সরমার স্নেহশীলা ও উদার মানসিকতার যথোচিত প্রশংসা করে পঞ্চবটীবন থেকে তাঁর অপহরণের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করা শুরু করলেন।

টিপ্পনী

সীতা পঞ্চবটীবনের সুখস্মৃতি স্মরণ করে সেখানকার আনন্দসুখময় জীবনযাপনের কথা রসময়ী কাব্যিক ভাষায় ব্যক্ত করলেন। সীতার মতে পঞ্চবটীবন ছিল তাঁর কাছে স্বর্গীয় উদ্যানের সমান, সেখানে গোদাবরীতীরে কুটীর রচনা করে সুখী কপোত-কপোতীর মত দিন কাটত তাঁদের। রামচন্দ্রের প্রেম, দেবর লক্ষ্মণের নিঃস্বার্থ সেবা সব কিছু মিলে পঞ্চবটীবনের জীবনযাত্রা ছিল সুখময়।

রাজবধূ হওয়া সত্ত্বেও অরণ্য-জীবন তাঁর কাছে সত্যিই বরণীয়। কুটীরের চতুঃপার্শ্বে কত প্রজাতির ফুল ফুটত, কোকিলের মিষ্ট কুহুরবে প্রত্যূষে ঘুম ভাঙত, দুয়ারে নৃত্য করত ময়ূর-ময়ূরী। কুটীরে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হত হস্তী-হস্তিনী, মৃগশিশু, বিচিত্রবর্ণ পক্ষীকুল। সীতা পরমানন্দে ও পরমযত্নে তাদের সেবা করতেন।

নিজের সাজসজ্জার কথাও সীতা জানাতে ভোলেন নি -নির্মল সরসী ছিল তাঁর কছে দর্পণ-স্বরূপ, পদ্মফুল ছিল কেশসজ্জার উপকরণ - সীতার সাজসজ্জা দেখে মুগ্ধ রামচন্দ্র তাঁকে 'বনদেবী' বলে কৌতুক করতেন। সীতা এরপর পরিতাপ করেছেন আর কখনো তিনি রামচন্দ্রের পদসেবা করার সুযোগ পাবেন কিনা এই কথা বলে। এই নিদারুণ দুঃখ-কথায় সীতা ও সরমা উভয়েই অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। সরমা জানালেন পূর্বস্মৃতিকথা স্মরণে যদি সীতা মনোবেদনা অনুভব করেন, তবে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনে আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু সীতা অতি কোমল ভাষায় সরমাকে জানালেন প্রবল বর্ষণে নদীর দুই কূল ছাপিয়ে যেমন জলধারা সবকিছু প্লাবিত করে, তেমনি দুঃখে উদ্বেলিত তাঁর চিত্তও নিজ দুঃখকাহিনী অন্যের নিকট প্রকাশ করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে - সরমা ব্যতীত এই রাক্ষসপুরীতে আর কাকে তিনি মনোদুঃখ শোনাবেন! সীতা পুনরায় পূর্বকথা শুরু করলেন।

পঞ্চবটীবনে গোদাবরীতটে সুখবাসের কথা উল্লেখ করে সীতা স্বপনকালে বনদেবীর বীণাবাদন শ্রবণের কথা উল্লেখ করলেন, বললেন সুরবালা-সদৃশ রবিকরের সৌন্দর্যের কথা। ঋষিপত্নীদের দিব্যপ্রভাসম কুটীরে আগমন, বৃক্ষচ্ছায়াতলে তাঁদের সঙ্গে মধুর বাক্যালাপ আবার কখনো বন্য হরিণীদের সঙ্গে নৃত্যকলা, কোকিলের কুহুতান শ্রবণ করে গীতিমুখর হয়ে ওঠা, নবলতিকার সঙ্গে তরুর বিবাহপ্রদান ইত্যাদি নানান ঘটনার উল্লেখে একদিকে যেমন দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতম ঘটনাকেও মহৎরূপ দান করেছেন, তেমনি অলির গুঞ্জন, নদীজলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র-তারকাশোভিত আকাশের অপূর্ব চিত্রাবলী ইত্যাদি নিসর্গ-চিত্রের রূপ অঙ্কন করেছেন। শিব যেমন কৈলাসপুরে অনুক্ষণ পার্বতীকে বেদ-আগম-পুরাণ ও নানা শাস্ত্রকথা শোনান তেমনি প্রভু রামচন্দ্র তাঁকে সতত শোনাতেন কত মধুর প্রেমবচন। এই সুখস্মৃতি বর্ণনা করতে করতে নিজের দুর্ভাগ্য ও বিধির নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করে সীতা পুনরায় অশ্রুমুখী হয়ে উঠলেন।

সীতার দুর্ভাগ্য তথা বনবাসকালে অসীম সুখভোগের বিবরণ শুনে সরমারও ইচ্ছা হয় রাজসুখ ত্যাগ করে বনবাসে যেতে, কিন্তু সরমা নিজে সীতার মত গুণবতী নন – এই আশংকাও তার মধ্যে আছে – তাই বনবাসগমনের ইচ্ছা থেকে নিজেকে বিরত করেন তিনি। এরপর সরমা সীতার অপূর্ব বর্ণনাকৌশল ও মধুর কণ্ঠধ্বনিকে বীণাধ্বনি ও সুমিষ্টকণ্ঠ কোকিল অপেক্ষাও মনোহারিণী বলে উল্লেখ করে পঞ্চবটীবন থেকে রাবণ কেমন করে তাঁকে অপহরণ করেছিলেন, সেই বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন। সরমার কথায় শুধু তিনি নিজে নয় – অশোকবনের পক্ষীকুলও সেই কাহিনী শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

টিপ্পনী

সীতা এরপর রাবণ-ভগিনী শূর্পণখার নির্লজ্জ কাহিনী বর্ণনা করলেন। শূর্পণখা সীতাকে বধ করে রঘুবর রামচন্দ্রকে পতিরূপে কামনা করলে দেবর লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে সরোষে কুটীর থেকে বিতাড়িত করেন, পরে রাক্ষসকুলের সঙ্গে লক্ষ্মণের ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের তান্ডবতায় সীতা হতচেতন হন – রামচন্দ্রের প্রেমস্পর্শে তিনি ফিরে পান চেতনা। সরমাকে এই কাহিনী বিবৃত করতে গিয়েও সীতা সংজ্ঞা হারালেন – অনেকক্ষণ পর চেতনা ফিরে পেয়ে সীতা নিজের মনোদুর্বলতার জন্য সরমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। তারপর সরমা নিষেধ সত্ত্বেও পূর্বকথা বিবৃত করতে গিয়ে মারীচ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। মায়াবী-মারীচের স্বর্ণমৃগরূপধারণ, সীতাকে প্রলুব্ধ করা, প্রলুব্ধা সীতার স্বর্ণমৃগ পাওয়ার বাসনা, লক্ষ্মণকে কুটীরে রেখে রামচন্দ্রের যাত্রা, কিছুক্ষণ পর ছলনাকারী হরিণরূপী মারীচের "কোথারে লক্ষণ ভাই" "কোথায় জানকি" ইত্যাদি সম্বোধনে আর্ত আহ্বান এবং রামচন্দ্রের বিপদ-আশংকায় সীতার উদ্বেগ এবং রামচন্দ্রের উদ্ধার-কার্যে লক্ষ্মণকে যাওয়ার অনুরোধ, প্রত্যয়ী লক্ষণের এই ঘটনাকে মায়াবী রাক্ষস বা অন্যকারও ছলনা বলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করা এবং লক্ষ্মণের এই নির্বিকার মনোভাবের মূলে তাঁর কাপুরষতার কথা উল্লেখ করলে 'মাতৃসমা' জানকীকে যথোচিত সাবধানে থাকার নির্দেশ দিয়ে লক্ষণ কুটীর ত্যাগ করলেন। সেই অবসরে আশ্রমে প্রবেশ করলেন 'বৈশ্বানরসম' বিভাযুক্ত 'তেজস্বী, বিভূতি সঙ্গে, কমন্ডলু করে, শিরে জটা' এক যোগীবর। তিনি ক্ষুধার্ত অতিথি হিসেবে নিজ পরিচয় দিয়ে বললেন – "ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ"।

বিনম্র বচনে সীতা যোগীবরকে রাম-লক্ষ্মণ কুটীরে না-আসা পর্যন্ত বৃক্ষতলে মৃগচর্মাসনে অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু রুষ্ট যোগী ক্ষুধার্ত অতিথিকে এমনভাবে অবহেলা করার জন্য সীতাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন এবং সীতা যে রঘুকুলে কালিমা লেপন করছেন সে অপবাদও দিলেন। শুধু তাই নয়, সীতার এই অবহেলায় যোগীবর অভিশাপ প্রদানের কথাও উচ্চারণ করলেন। সীতা দুষ্ট রাক্ষসের এই কাপট্য ও প্রতারণা বুঝতে পারলেন না, এবং ক্রুদ্ধ অতিথিকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুটীরের বাইরে এসে অতিথির সেবা-উপকরণ প্রদান করতে যাওয়ামাত্র যোগীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করে লঙ্কাপতি রাবণ 'রাজরথী' রূপে আত্মপ্রকাশ করে সীতাকে রথারূঢ় করলেন এবং নানাভাবে বাক্যবাণে বিদ্ধ করলেন – সরমাসকাশে সে লজ্জার কথা বিবৃত করতে সীতা সঙ্কোচবোধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে সীতা রামচন্দ্রের সঙ্গে বনমধ্যে ভ্রমণের একটি দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। একদিন রামচন্দ্রের সঙ্গে বনমধ্যে অবস্থানকালে সীতা অদূরে গুল্মশাখার অন্তরালে এক ব্যাঘ্র কর্তৃক একটি মৃগী আক্রান্ত হওয়ার করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলে সকাতরে রামচন্দ্রকে এর প্রতিবিধান করার অনুরোধ করেছিলেন। রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ শরনিক্ষেপে ঐ শার্দূলকে ভস্ম করে হরিণীর প্রাণ রক্ষা করেন। সীতা পরম সেবা-যত্নে আহত হরিণীটির পুনর্জীবন দান করেছিলেন। কিন্তু দস্যু রাবণ যখন সীতাকে শার্দূলসদৃশ ক্ষিপ্রতায় মৃগীরূপিনী সীতাকে বধ

করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন তাঁর শত চীৎকারেও তাঁকে উদ্ধার করার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি - শুধু বনদেবী হয়তো নীরবে অসহায়ভাবে অশ্রুমোচন করেছিলেন। কিন্তু কঠিন লৌহকে দ্রব করতে হলে যেমন তীব্র অগ্নি-উত্তাপের প্রয়োজন, জলপ্রয়োগ পন্ডশ্রম মাত্র; সেই রকম রাবণের দুষ্কর্ম প্রতিবিধানে অশ্রুপাত নিতান্ত অর্থহীন।

কালসর্পমুখে ব্যাঙ যেমন অসহায় আর্তনাদ করে, সীতার আর্তনাদও সেই অসহায়তারই নামান্তর। ঘোরতর রথচক্রনির্ঘোষে সীতার আর্তনাদ যেন চাপা পড়ে গেল, ঠিক যেমন প্রচন্ড ঝটিকা - তাড়নায় বৃক্ষ 'মড়মড়' ধ্বনি তুললে অসহায় পক্ষীকুলের ক্রন্দন ঢাকা পড়ে যায়। নিরুপায় সীতা তখন অঙ্গের সমস্ত ভূষণ - কঙ্কন, বলয়, হার, কণ্ঠমালা, কুন্ডল, নূপুর, কাঞ্চী - চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন - তাঁর অপহরণ পথ নির্ণয়ের চিহ্নস্বরূপ।

টিপ্পনী

সরমা সীতার এই দুঃখ-কাহিনীর পরিণাম শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সীতা পূর্ব ঘটনার সূত্র ধরে জানালেন নিষ্ঠুর ব্যাধ যেমন কোন পক্ষীকে ফাঁদে বন্দী করে আনন্দিত চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আর নিরুপায় পক্ষী বৃথাই লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করার চেষ্টা করে, সীতার অবস্থাও হয়েছিল অনুরূপ। রাবণের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া দুষ্কর জেনে সীতা তখন শব্দবহ আকাশ, গন্ধবহ বাতাস, 'ভীমনাদী' মেঘ, গুঞ্জনরত ভ্রমর এবং মধুরকণ্ঠ কোকিলকে যে যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রামচন্দ্রের কাছে অভাগিনী সীতার অপহরণ-বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাতর প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু সবকিছুই বিফলে গেল।

এরপর তীব্রগতিসম্পন্ন স্বর্ণনির্মিত পুষ্পক রথ নানা দেশ-নদ-নদী-গিরি অতিক্রম করে এগিয়ে চলল। অকস্মাৎ গিরি-পৃষ্ঠে ভৈরব-মূরতি এক বীর প্রবল হুঙ্কারে রাবণকে চোর, দুর্মতি, নারীঅপহরণকারী, মূঢ়মতি, নির্লজ্জ পামর ইত্যাদি সম্বোধনে তিরস্কৃত করে তাঁকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রলয় সমরে লিপ্ত হলেন। যুদ্ধের প্রবল হঙ্কার-ধ্বনি ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি সীতাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলল; দেবতাদের উদ্দেশ্যে তিনি কাতর প্রার্থনা জানালেন পামর রাক্ষসকে বধ করার জন্য। শেষ পর্যন্ত সীতা এই প্রলংকর সংগ্রামের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে জননী বসুধাকে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে তাঁকে নিরাপদ আশ্রয় দানের প্রার্থনা জানালেন। এরপরেই সীতা অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। অচৈতন্য অবস্থায় সীতা স্বপ্নে জননী বসুন্ধরাকে অবলোকন করলেন। বসুন্ধরা সীতাকে জানালেন লঙ্কারাজ রাবণের সমূলে বিনষ্টির কারণেই সীতার পৃথিবীতে জন্ম, রাবণ সীতাকে অপহরণ করে তাঁর ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করলেন - জননী বসুন্ধরা এজন্য সীতাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

অতঃপর সীতাকে বসুন্ধরা দিব্যপরিমন্ডলে স্বর্ণলঙ্কা ও রাবণের ভবিষ্যৎ পরিণামের দৃশ্য প্রদর্শন করালেন। এই দৃশ্য মধ্যেই প্রতিফলিত হল রামায়ণে বর্ণিত রাবণের করুণ-পরিণাম কাহিনী।

সীতা দেখলেন এক অভ্রভেদী গিরিতে হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণ প্রমুখ 'পঞ্চজন বীর' বিষণ্ণবদেন বসে আছেন - সেই স্থলে লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র উপস্থিত হলেন। বীরপঞ্চজন রাঘবকে পূজা করলেন - এই দৃশ্য দেখে সীতা রামচন্দ্রের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। হঠাৎ বীরপদভারে সেই স্থান কম্পিত হতে থাকলে জানকী ভীতা হলেন। বসুন্ধরা জানালেন রামচন্দ্র বালীকে বধ করে কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবকে রাজাসনে অধিষ্ঠিত করার পর সুগ্রীব সসৈন্যে সীতাকে উদ্ধার করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করছেন — আসন্ন মহাসংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব এটি। অতঃপর সৈন্যদল

টিপ্পনী

সমুদ্রতীরে উপনীত হয়ে পর্বত উৎপাটন ক'রে সমুদ্রে নির্মাণ করল 'অপূর্ব সেতু'। স্বর্ণলঙ্কা তখন রামচন্দ্রের সেনাবাহিনীর পদভারে টলমল করে উঠল - 'জয় রঘুপতি; জয়!' ধ্বনিতে স্বর্ণলঙ্কা পরিপূরিত হল। রাবণ তাঁর সভাগৃহে তখন রাজসিংহাসনে সমাসীন। এক বীর দশানন রাবণকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে জানালেন - 'পূজ রঘুবরে, / বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে / সবংশে!' লঙ্কারাজ রাবণ পদাঘাত করে সেই বীরকে বিতাড়ন করলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে বিষণ্ণবদনা সরমা জানালেন তিনি এবং তাঁর স্বামী বিভীষণ সীতার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত - তাঁর দুঃখ তাঁদের অশ্রুসজল করে তোলে। সীতা স্নেহপূর্ণবচনে সরমা ও বিভীষণের উদারচিত্ততার প্রশংসা করলেন এবং পুনরায় সেই 'ভবিতব্য'-চিত্রের বিষয়বস্তু বর্ণনায় মনোযোগী হলেন। রাম-রাবণের প্রবল সংগ্রামে আকাশ-বাতাস মথিত হল। ভীষণ অস্ত্রাঘাতে শোণিতের নদী প্রবাহিত হল - অজস্র শবদেহে ভূমিতল আচ্ছাদিত। কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, শকুন, শৃগাল প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীতে যুদ্ধক্ষেত্র ভরে গেল।

রাজসভায় সমাসীন বিষণ্ণচিত্ত রাবণ প্রমাদ গণলেন। তিনি নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করে সৈনাপত্য গ্রহণের নির্দেশ দিলেন, কিন্তু 'মরিল অকালে জাগি সে দুরন্ত শূর।' বীর কুম্ভকর্ণের অকালমৃত্যুতে রাবণসহ স্বর্ণলঙ্কা হাহাকার করে উঠল। সেই হাহাকার ধ্বনি শুনে সীতা কাতর হয়ে উঠলেন। বসুন্ধরার আশ্বাসে অতঃপর সীতা দেখলেন সুরবালাদল মন্দারমালা, নানা আভরণ, পট্টবস্ত্রে সীতাকে সজ্জিত করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা বললেন দেবেন্দ্রাণী শচী সীতাকে নিজ হস্তে রামচন্দ্রকে দান করবেন। সীতা বেশভূষায় আপত্তি জানালে সুরবালাগণ সেই আপত্তিতে কর্ণপাত করলেন না। নবসাজে সজ্জিতা সীতা অদূরে রামচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করে যেমনি তাঁর পদযুগ ধারণ করতে গেলেন তখনই সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হল। আঁখি মেলে সীতা দেখলেন বজ্রাঘাতে চূর্ণ শৈলশৃঙ্গের মত সেই বীরকেশরী (জটায়ু) ভূপতিত হয়েছেন। রাবণ সীতাকে তাঁর বীরবিক্রমের কথা সগর্বে জানিয়ে বললেন — 'নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন।' ভূপতিত জটায়ু রাবণকে সীতা-অপহরণের জন্য করুণ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ক্রন্দনরতা সীতা জটায়ুকে আত্মপরিচয় দান করে যদি রাঘবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তবে তাঁকে রাবণকর্তৃক তাঁর অপহরণের সংবাদ আনুপূর্বিক দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। এরপর রাবণ আকাশপথে আবার রথ চালনা করলেন। সমুদ্রের নীল জলরাশির উপর দিয়ে রথ চলাকালে সীতা সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার উদ্যোগ করলে রাবণ তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। তারপর শুরু হল অশোকবনে তাঁর বন্দীত্বের দুঃখময় জীবন।

এই কাহিনী বিবৃত করে সীতা ক্রন্দনরতা হলেন। সরমা জানালেন রাবণের পতন সুনিশ্চিত। লঙ্কাপুরী একে একে বীরশূন্য। খুব শীঘ্রই সীতার দুঃখরাত্রি অবসিত হবে - সীতার স্বপ্নকাহিনী হবে বাস্তবায়িত।

সরমা এরপর আন্তরিকভাবে সীতার গুণকীর্তন করেছেন, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন এবং বলেছেন, 'ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি!'

সীতা অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ভাষায় সরমাকে এই শত্রুপুরীতে তাঁর পরম হিতৈষিণী বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন সরমা হলেন পঙ্কমধ্যে প্রস্ফুটিতা পদ্মফুল। আর বলেছেন কাল সর্পরূপিণী লঙ্কার শিরোদেশে মণিতুল্য সম্পদ হলেন সরমা।

এরপর চেরীদলের আগমন আসন্ন জ্ঞান করে সরমা সীতার পদতলে নমস্কার জানিয়ে বিদায়

গ্রহণ করেছেন। আর সীতা অশোকবনে একাকিনী রইলেন – ''একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।''

চতুর্থ সর্গের সারাংশ

'অশোকবনং' শীর্ষক 'মেঘনাদবধ কাব্যের' চতুর্থ সর্গটিকে অনেকে কাব্যের মূলঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কশূন্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। সীতা ও সরমার নিভৃত আলাপচারিতার সূত্রে কবি মধুসূদন আসলে এখানে স্বর্ণলঙ্কার ধ্বংসের মূল কারণ যে সীতা-অপহরণের মত জঘন্য কু-কর্মের নায়ক লঙ্কাধিপতি রাবণ – সে-সত্যই এখানে সুকৌশলে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কবির দৃষ্টিতে রাবণ 'Grand fellow' হলেও চরিত্রটির মধ্যে যে 'পাপ-বীজ' উপ্ত হয়েছিল, মধুসূদন তা অস্বীকার করতে পারেন নি। এছাড়াও এই সর্গটির মাধ্যমে কবি মধুসূদনের মধ্যে যে লিরিক কবিসত্তাটি প্রচ্ছন্ন ছিল, সেটি এই সর্গে সীতার আবেগাত্মক মনোভাব ও প্রকৃতির সৌন্দর্যমন্ডিত অনুষঙ্গে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, মেঘনাদপত্নী প্রমীলার বীরাঙ্গনাসুলভ নারীচরিত্রের বিপরীতে ভারতীয় নারীর ত্যাগ, সেবাব্রত, পাতিব্রত্য এবং সহজ-সরলজীবনচর্যার প্রতীক হিসেবে সীতা চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করার একটা গোপন ইচ্ছাও কবির মধ্যে ছিল।

মেঘনাদবধ কাব্যের বৃহত্তর ঘটনা তাৎপর্যের কথাটিকে গুরুত্ব দিলে চতুর্থসর্গটিকে অপ্রাসঙ্গিক ভাবার কোন অবকাশ থাকে না।

চতুর্থ একক

১. 'মেঘনাদবধ কাব্যের' চতুর্থ সর্গটির কাব্যগত প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২. মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গটিতে ক্লাসিক গাম্ভীর্য অপেক্ষা রোম্যান্টিক গীতিধার্মিতা প্রাধান্য পেয়েছে – মন্তব্যটির যাথার্য্য বিচার করুন।

৩. মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে সীতা চরিত্রটি যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে তাতে চরিত্রটিকে ভারতীয় নারীর আদর্শস্থানীয়া বলা যায় – ব্যাখ্যা করুন।

৪. চতুর্থ সর্গে সরমা চরিত্রটির কাব্যগত উপযোগিতা উল্লেখ করে চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করুন।

৫. মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে বসুন্ধরা সীতাকে রাবণ ও স্বর্ণলঙ্কার যে 'ভবিতব্য'-চিত্র দেখিয়েছেন – তার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কাব্যগত উপযোগিতার দিকটিও উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১. 'নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে', কবিগুরু কে? তাঁকে নমস্কার নিবেদন করার কারণ কি?

২. 'ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে' – কনক-লঙ্কা 'আনন্দের নীরে' ভাসছে কেন?

৩. সীতা সরমার কাছে পঞ্চবটী বনে গোদাবরী তীরের কি বর্ণনা দিয়েছেন?

টিপ্পনী

৪. গিরি-পৃষ্ঠে কোন্ বীর রাবণকে বাধা দান করেছিলেন? তিনি রাবণকে কি কি বলে তিরস্কার করেছিলেন? তাঁর পরিণাম কি হয়েছিল?

৫. সীতা সরমার প্রতি কেমন মনোভাব পোষণ করতেন দু'একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

টিপ্পনী